

ভবানীপ্রসাদ
সাহু

শরীর ঘিরে সংস্কার

শরীর ঘিরে সংস্কার

ভবানী প্রসাদ সাহু

মণ্ডল এণ্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

Shareer Ghire Samskar

By Bhabani Prasad Sahoo

প্রকাশক :
শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল
মণ্ডল এণ্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৮৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—মে, ১৯৮৫
তৃতীয় সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৮৮

মূল্য—কুড়ি টাকা

মুদ্রক :
শীতল চন্দ্র সামুই
কমলা প্রেস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

আমার প্রয়াত পিতা
শ্রীপতি চরণ সাহুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে
যিনি
সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে থেকেও ছিলেন
মুক্তমনা ও গোঁড়ামিমুক্ত

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

খাদ্য সংক্রান্ত অজস্র সংস্কারের অল্প কয়েকটি আলোচনা করে সম্পূর্ণ নতুন একটি পরিচ্ছেদ যোগ করা হল। এছাড়া অন্যান্য কিছু ছোট খাটো সংযোজন ও পরিমার্জনও করা হয়েছে।

সম্প্রতি কুসংস্কার ও মিথ্যা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু সচেতনতা ও আন্দোলন দানা বাঁধতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখনো বিপুল সংখ্যক মানুষই যে তিমিরে ঐ তিমিরেই রয়েছেন। শিক্ষার বিস্তার ও আর্থসামাজিক অবস্থার বিকাশ ছাড়া এ অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আমাদের সচেতনতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। গড্ডলিকা প্রবাহে না ভেসে সচেতনভাবে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে সমাজকে মুক্ত আলোয় বের করে আনার জন্য ক্রমশঃ বেশি সংখ্যায় অনেকেই এগিয়ে আসছেন। প্রয়োজন আরো শক্তিশালী, গোঁড়ামিমুক্ত আরো ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, যা সমাজবিকাশের পক্ষেও সহায়ক। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সংকীর্ণ মানসিকতা দিয়ে সুস্থ সমাজ গড়া বা তার জন্য সফল আন্দোলন করাও সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে এ ধরনের বই যৎসামান্য ভূমিকা রাখতে পারছে, এ আশা করেই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল।

অক্টোবর, ১৯৮৮ — **ভবানীপ্রসাদ সাহু**

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বেশ কিছু সংযোজন ও পরিমার্জন করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল! বেশ কয়েকজন বন্ধু এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন—তাঁদের ধন্যবাদ। দরকার আরো পরামর্শ ও প্রস্তাব। কিন্তু আরো বেশী করে দরকার যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাভাবনাকে সামনে রেখে সংগঠিত ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা। শাসন ও শোষণের স্বার্থে, ভাববাদী মানসিকতা সুকৌশলে সূক্ষ্ম জাল ছড়িয়ে চলেছে। এ থেকে মনের মুক্তি না ঘটলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক মুক্তিও বাধা পাবে। এ ক্ষেত্রে বইটি সামান্য কিছু ভূমিকা রাখতে পারলেও তার সার্থকতা।

ভবানীপ্রসাদ সাহু

১লা মে, ১৯৮৫

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার অতি ঘনিষ্ঠ, অতি প্রিয় এক বন্ধু বিয়ের বেশ কয়েক বছর পরেও কোন সন্তানের মুখ দেখে নি। এর জন্য ওকে যতটা না, ওর স্ত্রীকে—বিশেষতঃ প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে—অনেক বেশি বক্রোক্তি, অপমান সহ্য করতে হয়। এমন কি, আচার-ব্যবহারে অতি সুন্দর এই মহিলাকে 'অপয়া' হিসেবে গণ্য করতেও বাধে না অনেকের।

বেরুনর মুখে 'হাঁচি পড়লে' যাওয়া স্থগিত রাখতে হয়; মনটাও অনেকের খুঁত-খুঁত করতে থাকে। নবজাত শিশু তড়কায় (টিটেনাস হয়ে) মারা গেলে তাকে পেঁচোয় পেয়েছিল বলে ভাবার ব্যাপারটা এখনো অনেক জায়গাতেই চালু। চড়কের মেলায় অনেক সন্ন্যাসী মাটিতে মাথা ঢুকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকে; ব্যাপারটি যে শিবঠাকুরের দুর্লভ দয়ায় সম্ভব বা সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা—তাতে অনেকেরই কোন সন্দেহ থাকে না।

এইভাবে আমাদের শরীরের নানা ক্ষমতা ও ঘটনা, নানা রোগ, ইত্যাদিকে ঘিরে অজস্র সংস্কার ও মিথ্যে ধারণা চালু রয়েছে। অন্যান্য প্রাণীর মত আমাদের কাছেও আমাদের এই শরীরটা অত্যন্ত প্রিয়। একে সুস্থ ও সুন্দর রাখার জন্য, জগতের আনন্দময় অভিজ্ঞতাগুলিকে এই শরীরের মাধ্যমে উপভোগ করার জন্য আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই। এ চেষ্টা শুরু হয়েছে, বিবর্তনের যে পর্যায়ে মানুষ নামের প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে, তখন থেকেই। বহু সহস্র বছর ধরে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও প্রয়োগের মাধ্যমে এর ফলে যেসব সংস্কারের ও ধারণার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলির অনেকগুলিরই রয়েছে বাস্তব কার্যকারিতা এবং অনেক-গুলিই আবার অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও কল্পনার জন্য কার্যকরী নয়। কোন

কোনটি আবার বিশেষ গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছে। বন্ধ্যা রমণীকে অপয়া ভাবাটা যেমন মিথ্যে, তেমনি পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী মানুষের জীবন নির্ধারিত হয়—এধরনের প্রচার শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করে। অন্যদিকে, লোকচিকিৎসার অঙ্গীভূত অজস্র বিশ্বাসের রয়েছে বাস্তব ভিত্তি ও কার্যকারিতা—যদিও এদের অনেকগুলিই বিজ্ঞানসম্মতচর্চার অভাবে ক্রমশঃ বিকৃত হয়ে পড়েছে।

শরীরকে ঘিরে রয়েছে এই ধরনের অজস্র সংস্কার। সারা পৃথিবীতে তো বটেই, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যেই যত সংস্কার বা বিশ্বাস চালু রয়েছে তার তালিকাও অতি বৃহৎ। এখানে এ ধরনের সংস্কার বা বিশ্বাসের অতি সামান্য সংখ্যক কয়েকটিকে তথ্যাদি দিয়ে আলোচনা করা হল। অন্যান্য যে কোন বিশ্বাসের মত শরীরকে ঘিরে এই ধরনের সংস্কার-গুলিকেও যে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে, যাচাই করা দরকার, জানা দরকার প্রকৃত সত্য—সে দিকটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের এই শরীরও প্রকৃতিজগতের সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন, বাস্তব ভিত্তি ছাড়া এর নেই কোন অবাস্তব-অলৌকিক-অতিপ্রাকৃতিক দিক।

পাঠকরা বুঝতে পারবেন, বইটি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়, এর অনেক ঘাটতিও রয়েছে। কিন্তু শরীরকে ঘিরে যে নানা মিথ্যে ধারণা রয়েছে তা একদিকে যেমন প্রত্যক্ষভাবে শারীরিক ক্ষতি করে, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক অসুস্থতাগুলিকে টিকিয়ে রাখার পরিমণ্ডলও সৃষ্টি করে। প্রাথমিক ভাবে এই বইটি যদি এ দিকটিকে নাড়া দিতে পারে এবং মিথ্য ধারণা ভেঙ্গে শরীরকে সুস্থ ও সুন্দর রাখার ক্ষেত্রে বাস্তব সাহায্য করে তবেই বইটির সার্থকতা। কিন্তু একাজ একটি বই বা একজন ব্যক্তির কাজ নয়। সচেতন বহু ব্যক্তি ও সংগঠনের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। প্রয়োজন এই ধরনের অজস্র বিশ্বাসগুলি সংগ্রহ করে তাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা ও ব্যাপক মানুষকে প্রকৃত সত্যটি জানান—এবং সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী অনুসন্ধিৎসা নিয়ে সব কিছুকে বিচার করার মানসিকতা গড়ে তোলা।

বইটির প্রকাশক, মণ্ডল এণ্ড সন্স-এর শ্রী শংকর মণ্ডল দায়িত্ব উপলব্ধি করে বইটির ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন এবং প্রকাশ করতে এগিয়ে এসেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। আমার স্ত্রী ডাঃ আরতি চট্টোপাধ্যায় (সাহু) বইটি শেষ করার ব্যাপারে নানা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতা করেছেন। তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া রয়েছে আরো অনেকেরই সহযোগিতা। যাঁরা বইটির নানা ত্রুটি দেখিয়ে দেবেন এবং একে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার জন্য পরামর্শ দেবেন আগে থেকেই তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখছি।

সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ ভবানীপ্রসাদ সাহু

সূচীপত্র

১

খাদ্য-অখাদ্য

শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং দৈনন্দিন কাজকর্মের উদ্দেশ্যে প্রতি মানুষেরই খাদ্য প্রয়োজন। পৃথিবীর নানা অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন। প্রাচীনকালে এ অভ্যাস গড়ে উঠেছিল, স্থানীয় বিশেষ বিশেষ খাদ্যের সহজলভ্যতা এবং বিশেষ পরিবেশে বিশেষ ধরনের খাদ্যের উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ধর্মবিশ্বাস গড়ে ওঠার পর জীবনের আরো নানা কিছুর মত খাদ্যাভ্যাসকেও ধর্মীয় সংস্কাকারাদির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ ধরনের কোন প্রাণী বা উদ্ভিদকে বাঁচানোর জন্য তাকে ধর্মের আবরণ পরিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। যেমন হিন্দুদের মধ্যে গরুর মাংস—পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এখনো যেমন লুপ্তপ্রায় নানা প্রাণীকে হত্যা করা আইন করে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। আগে আধুনিক আইনের স্থান নিয়েছিল ধর্মীয় বিধি-নিষেধ। কখনো বা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর লোকেরা কোন বিশেষ জীবজন্তু বা গাছকে নিজেদের গোষ্ঠীর উৎস বলে কল্পনা করেছে, সৃষ্টি হয়েছে টোটেম-এর ধারণা এবং ঐ গোষ্ঠীর কাছে ঐ জীবজন্তু বা গাছ পবিত্র বলে গণ্য হয়েছে। অন্যদিকে কিছু সত্যিমিথ্যে ধারণার উপর ভিত্তি করেও খাদ্য-অখাদ্য নিয়ে নানা সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে। সারা পৃথিবীতে এ ধরনের অসংখ্য সংস্কার ছড়িয়ে আছে। এখানে এ ধরনের দু' একটি শুধু আলোচনা করা হল।

গোমাংস

পৃথিবীতে হিন্দুধর্মাবলম্বী নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীর কাছে গরু অতিপবিত্র একটি প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত। এমনকি তাঁরা একে

গোমাতা বলেও উল্লেখ করেন। একারণে গোহত্যা, গোমাংস ভক্ষণ বা গরুর উপর কোন ধরনের নির্যাতন ইত্যাদি অত্যন্ত পাপকাজ বলে বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ভারতভূখণ্ডে বহিরাগত আর্যদের থেকেই এই তথাকথিত হিন্দুদের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শুরুর দিকে এই আর্যদের কাছে গোমাংস যে অতি প্রিয় একটি খাদ্য ছিল তা সুপরিচিত। অতিথি এলে তাকে আপ্যায়নের জন্য গোরু মেরে তার মাংস রান্না করে খাওয়ানোর প্রচলন ছিল। তাই সংস্কৃতে অতিথির আরেক নামই হয়েছে 'গোঘ্ন'। এছাড়া কচি বাছুরের নরম মাংস বা ষাঁড়ের মাংস ইত্যাদিও যে মুনি-ঋষি-দেবদেবীর প্রিয় ছিল তার উল্লেখ প্রাচীন আর্যসাহিত্যে বেশ ভালভাবেই ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

কিন্তু পরবর্তীকালে মূলত অর্থনৈতিক কারণেই গো-সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়—গরুর দুধ ও দুগ্ধজাত সুস্বাদু খাবারের যোগান যাতে ঠিক থাকে এবং চাষাবাদের জন্য গোরুর অভাব যাতে না ঘটে। যাযাবর ও পরবর্তীকালে চাষাবাদে লিপ্ত আর্যদের কাছে গরু তাই হয়ে উঠেছিল অতি মূল্যবান সম্পদ—গোধন। ব্যাপক মানুষের সময়োপযোগী ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই গোসংরক্ষণের ব্যাপারকেও ধর্মীয় রূপ দেওয়া হল। "নমস্তে জায়মানায়ৈ জাতায়া উত তে নমঃ। বালেভ্য শফেভ্যো রূপায়াঘ্ন্যে তে নমঃ॥" অথর্ববেদের এই ধরনের নানা সূক্তে দেবীরূপা গাভীর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। তবে ইন্দ্রাদি দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করা হত গোধনের জন্য। "যে ইন্দ্র শম্বর নামক অসুরের নিরানব্বইটি মায়ানির্মিত পুরী ধ্বংস করে,···আমাদের মঙ্গল প্রদ, মিত্রতুল্য সে ইন্দ্র, বহুক্ষীরা গাভী যেমন প্রভূত দুগ্ধ দেয়, সেরূপ বহু অশ্ব, গাভী ও ধান্যযুক্ত ধন প্রদান করুক।" (শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী সম্পাদিত, অথর্ববেদ সংহিতা, হরফ প্রকাশনী) আসলে ঘোড়া বা ধানের মত আর্যদের কাছে গরুও ছিল এক বিশেষ ধরনের সম্পদই। সুত্ত-নিপাত-এ গৌতম বুদ্ধ মন্তব্য করেছেন,

"গরু আমাদের বন্ধু, বাবা-মা-আত্মীয়দের মত, কারণ চাষবাস ওদেরই উপর নির্ভর করে। তারা খাদ্য, শক্তি, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ ও সুখ প্রদান করে। এসব জেনেই ব্রাহ্মণরা গোহত্যা করতেন না।" (The Calture & Civilisation in Ancient India in Historical Outline, D. D. Kosambi—থেকে সংগৃহীত) ব্যাপারটি শুধু হিন্দুদের মধ্যেই নয়, যেখানেই গরুর এই অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে সেখানেই ব্যাপারটি ঘটেছে। যেমন চীনে। হুনানে কৃষক-আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট, ১৯২৭-এ মাওসেতুং জানিয়েছিলেন, "বলদ কৃষকদের একটি মূল্যবান সম্পদ। 'এ জীবনে বলদ হত্যা করলে পরের জীবনে তুমি বলদ হবে'—কথাটি প্রায় ধর্মীয় অনুশাসনে পরিণত হয়েছে।…ক্ষমতা অর্জন করবার আগে কৃষকরা বলদ হত্যার বিরোধিতা করতে কেবল ধর্মীয় অনুশাসনের দোহাই দিতে পারত।…কৃষক সমিতি গড়ে উঠবার পর তাদের ক্ষমতা এমনকি বলদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং শহরে তারা বলদ হত্যা নিষিদ্ধ করেছে"…। (মাওসেতুং রচনাবলী, ১ম খণ্ড, নবজাতক প্রকাশন)

তাই ধর্মীয় কারণে নয়, নিছকই অর্থনৈতিক কারণে গোহত্যা প্রয়োজন-অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যে কারণে এরাজ্যে বাছুর হত্যা ও খাওয়ার জন্য বাছুরের মাংস বিক্রি করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বহুযুগ ধরে তথাকথিত হিন্দুধর্মাবলম্বীরা গরু নামক চতুষ্পদটিকে ধর্মের নামে রক্ষা করার মানসিকতা অবলম্বন করতে করতে গোমাংস ভক্ষণকে ধর্মবিরুদ্ধ একটি কাজ বলে বিশ্বাস করে ফেলেছেন। এবং এর জন্য ধর্ম ছাড়া নানা মনগড়া যুক্তিও হাজির করা হয়—যেমন, গরুর মাংস গরম ও ভারতের মত উষ্ণ অঞ্চলে সে মাংস খাওয়া উচিত নয়, গরুর মাংস খেলে একধরনের কৃমি হয়, গোমাংস খেলে কুষ্ঠ হয়, গরুর মাংস খেলে মনে হিংসার ভাব জাগে ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবের কোনটির পেছনেই যুক্তি নেই।

ঠাণ্ডা বা গরম মাংস বলে কিছু নেই। অহিন্দু বহু ভারতীয়ই

গোমাংস খান। তাঁরা বহাল তবিয়তেই আছেন। আছেন ভারতের বাইরে গরম বা ঠাণ্ডা দেশের গোমাংসভুক লক্ষ লক্ষ মানুষ।

গরুর মাংস শুধু নয়, মাছ বা অন্যান্য নানা মাংসেও নানা ধরনের কৃমির ডিম থাকতে পারে। সুসিদ্ধ হলে এধরনের সব ডিমই মারা পড়ে। কাঁচা অবস্থায় গোমাংসই খাওয়া হোক বা মাছই খাওয়া হোক তার থেকে পেটে কৃমি হতে পারে। অর্ধসিদ্ধ মাছ থেকে হতে পারে ডাইফাইলোবথরিয়াম লেটাম নামের ফিতেকৃমি ও ক্লোনোরকিস সাইনেনসিস নামের কৃমি, কাঁকড়া থেকে প্যারাগনিমাস, শুয়োরের মাংস থেকে টিনিয়া সোলিয়াম নামের ফিতেকৃমি ও ট্রাইচিনেলা স্পাইরেলিস, গরুর মাংস থেকে টিনিয়া স্যাজিনেটা নামের ফিতেকৃমি ইত্যাদি। এ ছাড়া গৃহপালিত পশুর যদি অ্যানথ্রাক্সরোগ হয় তবে তার মাংস থেকে এ রোগটিও মানুষের হতে পারে। সুতরাং ভাল করে রান্না না করলে সবগুলোর বিপদই সমান, আলাদাভাবে গোমাংসের বিশেষ অন্য কোন বিপদ নেই। কুষ্ঠ হয় এক জীবাণু দিয়ে, গরুর থেকে কুষ্ঠরোগের জীবাণু মোটেই আসেনা। গরুর মাংসের সঙ্গে হিংসারও কোন সম্পর্ক নেই।

যে সব হিন্দুরা ডিম, মাছ, পাঁঠা-মুরগী-কচ্ছপ-হরিণের মাংস খান তাঁদের গোমাংস সম্পর্কে সংস্কার নিছকই আরোপিত ধারণার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। চাষাবাদের প্রয়োজনে বা দুধের যোগানের জন্য গো সংরক্ষণের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু গোমাংস খাওয়া পাপের, নিন্দার বা ঘৃণার ব্যাপার আদৌ নয়। ধর্মের কারণে গোহত্যা সম্পূর্ণ বন্ধের জন্য সচেষ্ট হওয়াটাও নিছক ধর্মীয় সংকীর্ণতা।

একইভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে শুয়োরের মাংস নিষিদ্ধ। হজরত মহম্মদ সংকলিত আল্লার নির্দেশাবলী অর্থাৎ পবিত্র কোরআন শরিফে এই নিষেধের কথা একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। আরবের মরু অঞ্চলে জলের অপ্রতুলতার হেতু চাষাবাদের ব্যাপকতা না থাকায় হয়তো গরু, উট ইত্যাদির মাংস

সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করার প্রয়োজন হয়নি। অন্যদিকে শূয়োরের শরীরে ও মাংসে চর্বির পরিমাণ বেশি থাকায় এবং তার সুষ্ঠু বিপাক ক্রিয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ পাণীয় জলের আবশ্যকতা থাকায় হয়তো শূয়োরের মাংসকে মরুবাসীদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে স্পষ্টতঃ ভারত বা অন্যান্য যে সব জায়গায় জল পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে সেখানে এ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই।

তবে পুষ্টির দিক থেকে সব মাংসই কমবেশি সমান। গরুর মাংসের প্রোটিন থেকে শূয়োরের বা ছাগলের মাংসের প্রোটিন গুণগতভাবে আলাদা কিছু নয়। হিন্দু মুসলিম খ্রীস্টান বৌদ্ধ—সব মানুষের হজমের প্রক্রিয়াও সুস্থ অবস্থায় একই রকম। তাই হিন্দুরা গোমাংস খেলে বা মুসলিমরা শূয়োরের মাংস খেলে শুধু একারণে বদহজম হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এসব মাংসের মধ্যে সামান্য কিছু তফাৎ যা আছে তা প্রোটিন ইত্যাদির পরিমাণে। যেমন (১০০ গ্রাম পরিমাণে)* থাকে

	প্রোটিন	ফ্যাট	ক্যালরি	ক্যালসিয়াম
ছাগলের মাংস	২১ ৪	৩˙৬	১১৮	০˙০১২
গরুর মাংস	২২˙৬	২˙৬	১১৪	০˙০১০
মহিষের মাংস	১৯˙৪	০˙৯	৮৬	০.০০৩
শূয়োরের মাংস	১৮˙৭	৪˙৪	১১৪	০˙০৩
মুরগীর মাংস	২৫˙৯	০˙৬	১০৯	০˙০২৫
মেঠো ইঁদুরের মাংস	২৩ ৬	১	১০৪	০˙০৩

স্পষ্টতঃ প্রাণীর মাংস খেতে হলে, ধর্মের নামে বাছবিচার করার পেছনে যুক্তি নেই। আরো অযৌক্তিক হল একটি চতুষ্পদের নাম করে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা বাঁধানো। মন্দিরে গোমাংস বা মসজিদে শূয়োরের মাংস ফেলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধানোর ঘৃণ্য নজির

*Nutritive Value of Indian Foods, C. Gopalan et. al, National Institute of Nutrition, Hyderabad.

আমাদের সামনে আছে। **যুক্তিবোধহীনতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা এবং সর্বোপরি অজ্ঞতা এইভাবেই একটি চতুষ্পদকে কেন্দ্র করে মানুষকেই হিংস্র চতুষ্পদে পরিণত করে—নষ্ট হয় মানুষে মানুষে সম্প্রীতি।**

গ্রহণে খাদ্য গ্রহণ

সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের সময় কোন খাবার না খাওয়ার সংস্কার রয়েছে—যার পেছনেও কোন যুক্তি নেই। বিশেষত হিন্দু এবং পৃথিবীর নানা অঞ্চলের অশিক্ষিত আদিবাসীদের মধ্যে গ্রহণের সময় কিছু খাওয়া বিপজ্জনক বলে বিশ্বাস করা হয়। হিন্দুরা মনে করে রাহু-কেতু নামে দুই দৈত্য সূর্য-চন্দ্রকে গিলে ফেলার জন্য গ্রহণ ঘটে। এই সময় সূর্য বা চন্দ্র এঁটো হয়ে যায়; তাছাড়া দৈত্যের কোপ পড়ার ভয়ও নাকি রয়েছে। অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীরা বিশ্বাস করে কোন অশুভ শক্তির কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয়।

কিন্তু এখন স্কুলের ছাত্রও জানে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ ঘটে মহাকাশে সূর্য-চন্দ্র পৃথিবীর বিশেষ অবস্থানের কারণে। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে চাঁদের বিশেষ অবস্থানে সূর্য আড়াল হলে ঘটে সূর্যগ্রহণ; অন্যদিকে চাঁদ ও সূর্যের মাঝে পৃথিবীর বিশেষ অবস্থানে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে হয় চন্দ্রগ্রহণ। রাহু কেতু বা অশুভ শক্তির কোন ব্যাপার নেই। গ্রহণের সময় সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবী—কারোরই আলাদা কোন পরিবর্তন ঘটে না।

নিজেদের মিথ্যা বিশ্বাসকে যুক্তিগ্রাহ্য করার হাস্যকর প্রচেষ্টায় অনেক তথাকথিত আধুনিক ব্যক্তি এমন যুক্তিও দেন যে, গ্রহণের সময় সূর্যের আলো কম আসে বলে জীবাণুর সংখ্যা বাড়ে বা তারা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তাই ঐ সময় কোন খাবার না খাওয়া উচিত। কিন্তু মেঘলা দিনে তো সূর্যের আলো একেবারেই আসে না, অমাবস্যার রাতে আসে না কোন জ্যোৎস্নাও। তখন তো খাবার খাওয়া-না-খাওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না, জীবাণুর বংশ-

বৃদ্ধির প্রশ্নও তোলা হয় না। আসলে এইভাবে জীবাণুর সংখ্যা বাড়ে না। কোন জায়গায় দীর্ঘ সময় ধরে সূর্যালোক না পড়লে আলাদা কথা, কিন্তু সূর্য গ্রহণের সময় সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন একটি এলাকায় সূর্যালোকের পরিমাণ কিছু কমে শুধু। এর জন্য জীবাণুর বাড়া-কমার কোন হেরফের ঘটে না। সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ চলাকালে অহিন্দু ভারতীয় বা বিদেশীরা খাবার খান। তাঁরা বহাল তবিয়তেই থাকেন।

সূর্য গ্রহণের সময় **খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকাতে নেই, তাকালে মানুষ অন্ধ হয়ে যাবে**—এ ধরনের একটি বিশ্বাসও রয়েছে। এ বিশ্বাসের পেছনে কিছু যুক্তি রয়েছে, তবে ব্যাপারটি গ্রহণের সময় সূর্য থেকে অশুভ কিছু এসে চোখ অন্ধ করে দেবে তা নয়। নেহাৎ সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের সময় ছাড়া আমরা সূর্যের দিকে তাকাতে পারি না—তার আলোর তীব্রতার দরুণ। কিন্তু কেউ জোর করে দীর্ঘ সময় ধরে বারবার তাকালে সূর্যালোকের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি চোখের লেন্সের ক্ষতি করতে পারে—সম্ভবত এ থেকে ছানিও পড়তে পারে। এছাড়া চোখের নানা অংশের প্রদাহও ঘটতে পারে। গ্রহণের সময় সূর্য থেকে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি ঠিকই আসে কিন্তু সূর্যালোকের জোর অনেক কমে যায়, তাই অল্প আয়াসে সূর্যের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকা সম্ভব হয়। একারণে চোখের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা বাড়ে। তবে দু'এক সেকেণ্ড তাকালে এই ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

"ঘ ৮।২৭।৪৫ মধ্যে কুষ্মাণ্ড, পরে বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ ও দিনদগ্ধা":

এখন এসব কেউ মানেন কিনা জানা নেই, তবে এখনো বাংলা পঞ্জিকায় (যেমন পি এম বাগচির) এসব বিধি নিষেধের উল্লেখ রয়েছে। বছরের প্রতিদিন একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ খাদ্য খাওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়। হয়তো বৃদ্ধা হিন্দুবিধবা বা ধর্ম পরায়ণ দু'একজন এখনো এসব মানেন। যেমন এখানে সকাল

৮টা ২৭ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ডের মধ্যে কুমড়ো ও তারপর লাউ খেতে বারণ করা হচ্ছে। (এছাড়া আছে দিনদগ্ধা, মহাদগ্ধার মত ব্যাপার। বিশেষ বারের বিশেষ তিথিকে দিনদগ্ধা বলে, যেমন সোমবারে একাদশী বা মঙ্গলবারে দশমী পড়লে ইত্যাদি। তেমনি বিশেষ মাসের বিশেষ তিথিকে মাসদগ্ধা বলে, যেমন সৌর বৈশাখ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী বা জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্থী ইত্যাদি। অবশ্য এদের সাথে খাওয়াদাওয়ার কোন সম্পর্কে নেই। দিনদগ্ধা বা মাসদগ্ধার দিন যাত্রা নিষিদ্ধ বলে কুসংস্কার রয়েছে।)

বিভিন্ন তিথিতে বিশেষ কোন খাবার খেলে কি ক্ষতি হয় তার উল্লেখ এখনো পঞ্জিকায় দেওয়া রয়েছে। যেমন—

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে অর্থহানি,
দ্বিতীয়াতে বৃহতী ভক্ষণে হরিস্মরণের অযোগ্য,
তৃতীয়াতে পটোল ভক্ষণে শত্রুবৃদ্ধি,
চতুর্থীতে মূলক ভক্ষণে ধনহানি,
পঞ্চমীতে বিল্বভক্ষণে কলঙ্ক,
ষষ্ঠীতে নিম্বভক্ষণে পক্ষি যোনিপ্রাপ্তি,
সপ্তমীতে ডাল ভক্ষণে শরীর বিনাশ,
অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণে মূর্খতা প্রাপ্তি
নবমীতে অলাবু গোমাংসতুল্য,
দশমীতে কলম্বী ভক্ষণে গোবধতুল্য পাপ,
একাদশীতে শিম ভক্ষণে পাপ,
দ্বাদশীতে পুঁই ভক্ষণে ব্রহ্মবধসদৃশ পাপ,
ত্রয়োদশীতে বার্তাকু ভক্ষণে সুতহানি,
চতুর্দশীতে মাষকলাই ভক্ষণে চিররোগ এবং পূর্ণিমা-অমাবস্যায় মাংস ভক্ষণে মহাপাপ। হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখিত এসব বিধি নিষেধ ও দোষ বর্ণনা সামাজিক গবেষণার বিষয় হতে পারে, কঠোর ব্রত পালনে বাধ্যকরা হিন্দুবিধবাদের সুশৃঙ্খল জীবন-যাপনের উপায় হয়তো ছিল এসব,—কিন্তু এসবের পেছনে বিজ্ঞান

কিছু নেই। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এয়োদশীতে বেগুন খাচ্ছেন এবং সবারই ছেলেমেয়ে যে তারজন্য মারা যাচ্ছে তা নয়। কয়েক সেকেণ্ডের এদিক-ওদিক করে লাউ বা বেগুন খেলে সর্বনাশ হওয়ার বা কোন বিশেষ দিনে নিম খেলে পাখি হয়ে জন্মানর মত হাস্যকর এসব সংস্কার স্বাভাবিক নিয়মেই দূর হয়েছে অনেকটাই। কিন্তু এখনো বাংলার গ্রামাঞ্চলে অনেকে পূর্ণিমা-অমাবস্যায় মাংস খাওয়া, প্রতিপদে কুমড়ো খাওয়ার মত ব্যাপারগুলি কিছু কিছু মনে রেখেছেন ও মেনে চলেন। নিষ্ঠাবান কিছু ব্রাহ্মণও তা করেন। কিন্তু এসবের ফলে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু হয় নি, হচ্ছেও না।

নানা এলাকায় আরো নানা সংস্কারও চালু আছে যার পেছনে কোন যুক্তি নেই, যেমন, রবিবার ও বৃহস্পতিবার মসুরডাল খেতে নেই, রবিবার নিমপাতা খেতে নেই, বুধবার বেগুন খেতে নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুরগীর ডিম, হাঁসের ডিম

সাধারণ একটি ধারণা রয়েছে যে হাঁসের ডিমের চেয়ে মুরগীর ডিমের পুষ্টি বেশি, হাঁসের ডিম থেকে বাত হয় বা বাড়ে ইত্যাদি। তাই অনেক পরিবারে হাঁসের ডিম কেনা হয় না। ব্যাপারটি এমনই সংস্কারে পরিণত হয়েছে যে, অনেকে হাঁসের ডিম সভয়ে এড়িয়ে চলেন বা নাক সিঁটকোন। এই ফাঁকে মুরগীর ডিমের দামও বেড়েছে।

এ ধরনের সংস্কারের উৎস মূলত ইংরেজরা। শীতপ্রধান দেশে হাঁস কিছু কম। ওসব দেশে মুরগীর মাংস ও তার ডিমের প্রচলনই বেশি। ওসব দেশের ডাক্তারি বইতেও সাধারণভাবে মুরগীর ডিমের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ইংরেজরা এদেশে এসে তাদের নিজস্ব অভ্যাস বজায় রেখেছে। আর আমরা তাদের দেখাদেখি মুরগীর ডিমের মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী হয়েছি।

প্রকৃতপক্ষে মুরগীর ডিম বা হাঁসের ডিমের মধ্যে পুষ্টিগত ব্যাপারে এমন কিছু তফাৎ নেই।

উপাদান (১০০ গ্রামে)	হাঁসের ডিম	মুরগীর ডিম
প্রোটিন	১৩.৫	১৩.৩ গ্রাম.
ফ্যাট	১৩.৭	১৩.৩ গ্রাম.
ক্যালরি	১৮১	১৭৩ গ্রাম.
ক্যালসিয়াম	৭০	৬০ মি. গ্রা.
ফসফরাস	২৬০	২২০ মি.গ্রা.
লোহা	৩	২.১ মি.গ্রা.
থায়ামিন	০.১২	০.১ মি.গ্রা.
রাইবোফ্লেবিন	০.২৬	০.৪ মিগ্রা
নায়াসিন	০.২	০.১ মি.গ্রা.

তাই প্রকৃতপক্ষে হাঁসের ডিমে পুষ্টি তুলনামূলকভাবে বেশিই থাকে, যদিও তফাৎটা বিশাল কিছু নয়। আর আকারে হাঁসের ডিম বড় হওয়ায়, এ পুষ্টি পাওয়া যায় আরেকটু বেশিই।

আর আলাদা ভাবে হাঁসের ডিম থেকে বাত হয় এ ধরনের ধারণাও ভুল। ডিমের সাথে বাতের সম্পর্ক এখনো জানা যায় নি। কোন ডিম খান না, এমন লোকেও বাতে ভোগেন। রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস নামের দুরারোগ্য বাত মেয়েদের হয় ছেলেদের চেয়ে তিনগুণ বেশি। অথচ এসব অনেক মহিলাই হাঁসের ডিম হয়তো ছোঁনইনি।

তবে হাঁসের ডিম থেকে একটা ঝামেলা হতে পারে। মুরগীর ডিমের ক্ষেত্রে বিরল হলেও, হাঁসের ডিম কখনো কখনো স্যামোনেলা (Salmonella) নামক জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। হাঁসের (অর্থাৎ হংসীর) ডিম্বাশয় ও জরায়ুর সংযোগকারী নালিকায় (Oviduct)-এ থাকে এই জীবাণু। ফলে ঘটে সংক্রমণ। কম করে ১০-১৫ মিনিট না ফোটালে এ জীবাণু মরে না। ফলে পুডিং, কাস্টার্ড ইত্যাদির মত সাহেবী যে সব খাবার অল্প তাপে তৈরী

করা হয় সেগুলি এই সংক্রামিত হাঁসের ডিম দিয়ে তৈরী করলে বিপদ হতে পারে। এর ফলে খাবার খাওয়ার ১২ ঘণ্টা থেকে ২ দিন পরেও শুরু হতে পারে স্যামোনেলা জীবাণু জনিত তীব্র দূষণ (acute bacterial food poisoning)—এর ফলে হয় ঘনঘন পাৎলা পায়খানা, বমি, পেটে ব্যথা ইত্যাদি (gastro enteritis)। প্রধানত এ কারণে সাহেবরা হাঁসের ডিমের ব্যবহার কম করেন। তবে স্পষ্টতঃই হাঁসের ডিমকে ভালকরে সেদ্ধ করলে এ ধরনের ভয় আর থাকে না।

পোলট্রির ডিমকেও অনেকে একটু অন্য চোখে দেখেন। পোলট্রির ডিমের কুসুম ফ্যাকাসে রঙের হয়, দেশী মুরগীর ডিমের কুসুম হয় গাঢ় হলুদ রঙের। মূলত এ কারণেই এধরনের ধারণার সৃষ্টি। আসলে দেশী মুরগী নিজে চরে চরে লতাপাতা খায়, এর ফলে এদের কুসুমে থাকে ভিটামিন-এ-র আগের অবস্থা ক্যারোটিন। এই ক্যারোটিন আমাদের যকৃতে অতি সহজেই ভিটামিন-এ-তে রূপান্তরিত হয়। এ ক্যারোটিনের জন্যই তার কুসুমের রঙ হয় ঘন হলুদ। অন্যদিকে পোলট্রির মুরগীকে বানানো খাবার (mash) খাওয়ানো হয়, এ কারণে তার কুসুমে সরাসরি থাকে প্রচুর ভিটামিন-এ, যার রঙ ফ্যাকাসে হলুদ। রহস্যটা এখানেই। স্পষ্টতঃ গুণাগুণ দুটি কুসুমেরই সমান—বরং পোলট্রির ডিম থেকে সরাসরিই ভিটামিন-এ পাওয়া যায়।

মেয়েদের জোড়া কলা ইত্যাদি

কুমারী বা বিবাহিত কোন মেয়েকে জোড়া কলা খেতে দেওয়া হয় না অনেক বাড়ীতে। বিশ্বাস—এর ফলে নাকি ঐ মেয়ের যমজ সন্তান হবে। সন্তান কাম্য হলেও সাধারণভাবে কোন মহিলাই যমজ চান না—গর্ভে ধারণ করা থেকে মানুষ করা, সবই ঝামেলার। কিন্তু তা বলে জোড়া কলার সাথে যমজ সন্তানের কোন সম্পর্ক নেই। বাবা ও মায়ের দুটি করে শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষ নিষিক্ত

হলে অথবা একটি করে শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষ নিষিক্ত হয়ে দ্বিধাবিভক্ত হলে যমজ সন্তান হয়।

জোড়া কলা থেকে এমন কোন পদার্থ বা হরমোন শরীরে যায় না যার প্রভাবে যমজ সন্তান হতে পারে। আর এ ধরনের প্রভাবের সম্ভাবনাও নেই—উদ্ভিদ ও প্রাণীর হরমোনও সম্পূর্ণ আলাদা। লোকমানসে এধরনের সংস্কার সৃষ্টির পেছনে সদৃশ বিধান (homeopathic law) কাজ করেছে—যার পেছনে বিজ্ঞানসম্মত কোন যুক্তি বা সমর্থন নেই।

মেয়েদের খাওয়া-না-খাওয়া নিয়ে আরো অজস্র সংস্কার রয়েছে। ছেলেদের তুলনায় তার সংখ্যা অনেক বেশি। মেয়েদের মাছের পটকা খেতে নেই, মেয়েদের নারকেল ফোঁপড়া খেতে নেই, ছেলের জন্মবারে নিমপাতা খেতে নেই—নানা এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়ানো এধরনের সংস্কারের কোন অর্থ নেই। মেয়েদের আস্তফল খেতে নেই—খেলে ছেলেমেয়ের ক্ষতি হয়, মেয়েদের ভাজা পিঠের প্রথমটি ও বাড়া ভাতের প্রথমটা খেতে নেই—খেলে সংসারে আয় হয় না,—এধরনের নানা সংস্কার আবার সংসারে মেয়েদের সেরা জিনিষটি না দেওয়ার জন্য কৌশল করে তৈরী। মেয়েদের স্থান ছেলেদের থেকে নীচুতে, কি খাওয়া-দাওয়া, লেখা-পড়া সব ক্ষেত্রেই—এ ধরনের নিন্দার্হ মানসিকতা থেকে এসব সৃষ্টি। আবার স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করার জন্যও কিছু সংস্কার সৃষ্টি হয়েছে, যা পরোক্ষে শিক্ষামূলক। যেমন 'খোলা চুলে বড় গ্রাস তুলে খায় যে নারী সে অলক্ষী' কিংবা 'বিবাহিতা মেয়ে এলোচুলে খেতে বসলে স্বামী পাগল হয়ে যায়'। এরকম দৃশ্যে যেন রাক্ষসীর ছবি মনে ভেসে ওঠে। তবে খোলা চুল থেকে চুল, ময়লা, উকুন থাকলে সেসবও তো খাবারে পড়তে পারে। 'আধ-খায়য়াতে ছাড়লে পিঁড়ি, অনেকদূরে শ্বশুর-বাড়ী, 'মেয়েদের পা ছড়িয়ে যেতে নেই, খেলেও শ্বশুরবাড়ী দূরে হয়', 'অন্ধকারে খেতে নেই', 'শুধু মাটিতে বসে খেতে নেই, আসন বা

পিঁড়ি নিয়ে বসতে হয়', 'এঁটো নুন খেতে নেই', 'ভাত খেতে বসে থালার ওপর বাটি তুলে খেলে মেয়েদের সতীন হয় (ছেলেদের ক্ষেত্রে দু'বার বিয়ে হয়)', 'বাসি পান খেতে নেই',—এসবও সাধারণ শোভনতা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। থালার ওপর বাটি তুললে, বাটির তলাকার নোংরা থালায় চলে আসে, তাই এভাবে না খাওয়াই উচিত। কিন্তু তার জন্য মেয়েদের সতীন হওয়ার ভয় দেখানোও উচিত নয়—যার কোন ভিত্তি নেই। শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসারে এধরনের অজস্র সংস্কার দূর হবে এবং হচ্ছেও।

মাগুর মাছের মাথা খেলে বৌ মরে ?

আমাদের দেশে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের আচার-আচরণ তথা দৈনন্দিন জীবনকে হাজারো সংস্কার আর বিধি নিষেধের বেড়াজালে আটকে ফেলা হয়েছে। তবু ছেলেদের জন্যও সংস্কারের অভাব নেই—যদিও এর অধিকাংশই মেয়েলি। অনেক সময় কমগুণসম্পন্ন জিনিষ ছেলেদের না খেতে দেওয়া, কখনো বা পৌরাণিক ঘটনার উদাহরণ, ইত্যাদি নানাভাবে এধরনের সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে—যে সবের পেছনেও কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া ভার।

'মাগুর মাছের মাথা খেলে বৌ মরে' বা 'ছেলেদের ল্যাটামাছ খেতে নেই', জাতীয় সংস্কার অর্থহীন। মাগুর মাছের মাথা নয়, আসল মাছটাই খাবে ছেলেরা—এধরনের পক্ষপাতিত্ব হয়তো কাজ করেছে এর পেছনে। 'বাবার বর্তমানে দক্ষিণদিকে মুখ করে ছেলের খাওয়া বা ছেলের বর্তমানে উত্তরদিকে মুখ কার বাবার খাওয়া উচিত নয়', 'মাটির সরাতে ছেলেদের খেতে নেই—খেলে কথা বন্ধ হয়ে যায়'—এধরনের সংস্কারগুলি কোন কোন গ্রামাঞ্চলে চালু আছে যাও নিছকই ভিত্তিহীন।

মাঘ মাসে মূলো, চৈত্র মাসে শিম

কিন্তু সব সংস্কারই ভিত্তিহীন নয়। কোন-কোনটির পেছনে রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও উপযোগিতা। যেমন মাঘ মাসে মূলো বা

চৈত্র মাসে শিম খাওয়া নিষেধ করার সংস্কারের পেছনে সাধারণ প্রাকৃতিক ব্যাপারই কাজ করে। মাঘ মাসে মূলো হয়ে যায় খুব শক্ত, গ্রামাঞ্চলে মূলোকে তখন গরুর শিঙের সঙ্গে তুলনা করা হয়। চৈত্র মাসে শিমও হয়ে যায় শক্ত, ছিঁবড়ে মত।

একইভাবে বিজয়া-দশমী থেকে সরস্বতী পূজো পর্যন্ত **ইলিশমাছ** খেতে নিষেধ করা হয়। যাঁরা নিষেধ করেন বা নিষেধ মানেন তাঁরাও হয়তো এর পেছনের প্রাকৃতিক কারণটি জানেন না। আসলে এসময়টিই ইলিশমাছের প্রজনন কাল। সমুদ্র থেকে এসময় ঝাঁকে ঝাঁকে ডিমভর্তি ইলিশমাছ উঠে আসে বাংলার নদীতে যা মিষ্টি জলে ভর্তি। তারা এই মিষ্টি জলে ডিম পাড়ে। এ সময় এই ডিমভর্তি ইলিশ মাছ শিকার করার অর্থ তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিকে বাধা দেওয়া। তাই এইভাবে সংস্কারের নিষেধ তুলে বিজ্ঞান-সম্মতভাবেই চেষ্টা করা হয়েছে ইলিশমাছের সুষ্ঠু সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য।

সরস্বতী পূজোর আগে টোপাকুল খাওয়ার জন্যও নিষেধ আছে। বিশেষ করে বাচ্চাদের ভয় দেখানো হয়, এতে নাকি সরস্বতীঠাকুর রাগ করবেন—পড়াশুনা আর হবে না। আসলে সরস্বতী পূজোর আগে অর্থাৎ জানুয়ারীর গোড়ার দিকে কুল পরিপুষ্ট হয় না। কাঁচা এই কুলে থাকে কিছু ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ যা গলায় (ফ্যারিংক্স এ) প্রদাহের সৃষ্টি করে। এর ফলে কাশি, গলাব্যথা, এমনকি জ্বরও হতে পারে। আর বাচ্চাদের কাছে টোপাকুল পেড়ে খাওয়া বেশ মজার ব্যাপার। তাই ওদের গলাকে বাঁচানোর জন্য সরস্বতীঠাকুরের দোহাই—যদিও সরস্বতীঠাকুরেরও যেমন অস্তিত্ব নেই, তেমনি তার অনুগ্রহ বা ক্রোধের সাথে লেখাপড়া হওয়া বা না হওয়ারও কোন সম্পর্ক নেই।

কাঁচকলায় আয়রন, বেগুন বে-গুণ

নিছক পুরনো কিছু সংস্কার নয়, আমরা আধুনিক কিছু সংস্কারের জালেও আটকে পড়েছি। শরীরে রক্তের তৈরী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন

করা তথা রক্তহীনতা দূর করতে লৌহঘটিত লবণ প্রয়োজন—এ তথ্যটি জানার পর লৌহযুক্ত খাদ্য সামগ্রী সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে। সাধারণ প্রচলিত ধারণা হল,—কাঁচকলা, ডুমুর—এসবে প্রচুর আয়রন রয়েছে। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল তা নয়, এসবে লৌহঘটিত লবণ সত্যিই কিছু আছে। কিন্তু এমন কিছু বেশি পরিমাণে নয়, সাধারণ আরো কিছু খাবারদাবারে এর চেয়েও বেশি পরিমাণে থাকে। যেমন এদের প্রতি ১০০ গ্রামে আয়রন থাকে—

কাঁচকলা—০ ৬ মি. গ্রা.
কাঁচাপেঁপে—০'৯ মি. গ্রা.
চ্যাঁড়শ—১'৫ মি. গ্রা.
কাঁচা আম—৫'৪ মি. গ্রা.
কাঁচা টম্যাটো—১'৮ মি. গ্রা.
বেগুন—০'৯ মি. গ্রা.
উচ্ছে—২'০ মি. গ্রা.
সজনে ডাঁটা—৫'৩ মি. গ্রা.
লাউ—০'৭ মি. গ্রা.
আলু—০'৭ মি. গ্রা.
চাল—৩'২ মি. গ্রা.
আটা—১১'৫ মি. গ্রা.
ময়দা—২'৫ মি. গ্রা.
মূলো শাক—৩'৬ মি. গ্রা.
কচি নিমপাতা—২৫'৩ মি. গ্রা.
ফুলকপির পাতা—৪০'০ মি. গ্রা.
মেথি শাক—১৬'৫ মি. গ্রা.
ছোলা শাক—২৩'৮ মি. গ্রা. ইত্যাদি ইত্যাদি

(ডুমুরে আয়রন আছে, কিন্তু তার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারিত করা যায় নি, তবে খুব বেশি পরিমাণে থাকে না।)

স্পষ্টতঃ কাঁচকলার চেয়ে এমনকি আলুতেও বেশি আয়রন থাকে। কাঁচকলা রান্না করলে তরকারির রঙ কালচে হয়ে যায় আর সাধারণভাবে মরচে ধরা লোহার রঙ-ও কালো—এ ধরনের সাদৃশ্য থেকে যথাসম্ভব কাঁচকলায় লৌহময়ত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বেগুনেও লোহার পরিমাণ আলু, কাঁচাকলার চেয়ে বেশি। বেগুনের নাম থেকে মনে হলেও আসলে এটি গুণহীন মোটেই নয়। এর দু'চারটি সম্পদ তালিকা থেকে ব্যাপারটি বোঝা যাবে। যেমন—

(১০০ গ্রামে)	প্রোটিন (গ্রাম)	ফ্যাট (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রা.)	ভিটামিন বি-১ (মি. গ্রা.)	ভিটামিন-সি (মি. গ্রা.)
বেগুন	১.৪	০.৩	১৮	০.০৪	১২
কাঁচা পেপে	০.৭	০.২	২৮	০.০১	১২
শশা	০.৪	০.১	১০	০.০৩	৭
গাজর	০.৯	০.২	৮০	০.০৪	৩
আলু	১.৬	০.১	১০	০.০৬	১৭

মোটামুটি এটি স্পষ্ট যে বেগুনের খাদ্যগুণ যথেষ্টই রয়েছে। আসলে প্রচলিত বিভিন্ন শাকসব্জি তরি তরকারিতে পুষ্টির বিভিন্ন অংশ নানা পরিমাণে থাকে। নানাধরনের শাকসব্জি পাঁচমিশেলি করে খাওয়াটাই স্বাস্থ্য সম্মত। আর এতে বেগুনেরও সমান গুরুত্ব রয়েছে।

পেপটিক আলসারে দুধ, ব্লাড প্রেসারে নুন

মূলত চিকিৎসকদের কাছ থেকে জেনে সাধারণ মানুষদের মধ্যে এধরনের ব্যাপক ধারণা সংক্রামিত হয়েছে এবং প্রায় সংস্কারেই পরিণত হয়েছে। আসলে বেশ দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসাবিজ্ঞানে চিকিৎসার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে এমন ব্যবস্থা চালু ছিল। পেপটিক

আলসার (গ্যাসট্রিক অর্থাৎ পাকস্থলীর আলসার ও ডুওডেনামের আলসার)-এর ক্ষেত্রে ঘনঘন ঠাণ্ডা দুধ খাওয়া যেমন উপকারী তেমনি ব্লাড প্রেসার বাড়লেই নুন বিষবৎ পরিত্যজ্য—এধরনের বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মধ্যে শুধু নয়, এখনো অনেক চিকিৎসকের মধ্যেও রয়েছে।

কিন্তু এখন জানা গেছে ঘন ঘন দুধ খাওয়ার ফলে আলসারের নিরাময় আদৌ দ্রুততর হয় না, অ্যাসিডক্ষরণও কমে না। বরং দুধের প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম অ্যাসিড ক্ষরণ বাড়িয়েই দেয়। তাছাড়া বারবার দুধ খাওয়ার ফলে milk alkali syndrome বলে ভিন্নতর একটি রোগের সৃষ্টি হয়; বেশি দুধের জন্য রক্তবহা নালিকার স্থায়ী দুরারোগ্য পরিবর্তন (atherosclerosis)-ও দ্রুততর হয়। তাই এতদিনের অভিজ্ঞতা ও গবেষণায় বর্তমানে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, এই ধরনের রোগীদের ঘন ঘন দুধ খাওয়ার ব্যাপারটা অত্যন্ত ক্ষতিকর,—এমনকি অল্প অল্প বারবার খাওয়া, হাল্কা মশলাহীন সেদ্ধ খাবার খাওয়াও। রুচি অনুযায়ী স্বাভাবিক খাবার স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী খাওয়া দরকার। অবশ্যই অতিরিক্ত লংকা (বিশেষতঃ শুকনো লংকা) ও মশলা বাদ দেওয়া উচিত এবং বাদ দেওয়া উচিত ধূমপান, মদ্যপান, যখন তখন (বিশেষত খালি পেটে) ব্যথা কমানোর ওষুধ খাওয়া ইত্যাদি।

একইভাবে উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়া মাত্র কঠোরভাবে খাওয়ার নুন (সোডিয়াম ক্লোরাইড) নিয়ন্ত্রণ করার কথাও দীর্ঘদিন ধরে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যসচেতন শিক্ষিত মানুষও নিজের উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়লে, নুন খাওয়া কমানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং না পারলে উদ্বেগে ভোগেন। কিন্তু বর্তমানে জানা গেছে, নুন খাওয়া কমানোর ব্যাপারটি উচ্চ রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরাসরি কোন ভূমিকা নেয় না—নিলে তা নগন্য। তবে এটি ঘটনা যে উচ্চরক্ত-চাপের জন্য প্রস্রাবকারী ওষুধ অর্থাৎ ডাইয়ুরেটিক খেলে খাওয়ার নুনের আংশিক নিয়ন্ত্রণ ঐ ওষুধের কার্যকারিতাকে বাড়িয়ে তোলার

ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে খাওয়ার নুনের কঠোর নিয়ন্ত্রণ করলে ঐ বিস্বাদ খাবার না খেতে পারার জন্য নানা ধরনের পুষ্টির অভাব, পেটের গণ্ডগোল, মানসিক উদ্বেগ ইত্যাদি দেখা দিয়ে ভিন্নতর বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। তাই বর্তমানে উচ্চরক্ত চাপের রোগীদের নুন আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয় (দিনে ৫-৬ গ্রাম নুন)। এছাড়া ক্যালরি কমান, ধূমপান বন্ধ করা, কলেস্টেরল যুক্ত খাবার নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদির কথা বলা হয়।

টনিক আর মহান শক্তিদাতারা

টনিক শব্দটি বিদেশী হলেও সুকৌশলী প্রচারের জোরে আমাদের দেশের অশিক্ষিত মানুষও এ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। টনিক খেলে যে শরীর ভাল হয় আর গায়ে জোর বাড়ে, দুর্বল শরীর চাঙ্গা হয়—এটি একটি দৃঢ়মূল বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। এমনি দৃঢ় যে সাধারণ মানুষ প্রায়শঃই ডাক্তারকেও প্রায় বাধ্য করেন ভিটামিন বা টনিকের প্রেসক্রিপশান করতে! টনিক ব্যবসায়ীদের প্রচারে বিভ্রান্ত বহু চিকিৎসকও এধরনের আধুনিক সংস্কারে আচ্ছন্ন। কোন রোগী শারীরিক দুর্বলতার কথা বল্লে, কোন রোগী কোমরে ব্যথা বা নার্ভের ব্যাথার কথা জানালে, বা কোন রোগীকে জীবাণুধ্বংসকারী এন্টিবায়োটিক দিলে তার সাথে বহু চিকিৎসকই টনিক বা ভিটামিনের প্রেসক্রিপশান করে দেন।

অথচ এসব তথাকথিত ওষুধ এধরনের প্রায় ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় তো বটেই, এমনকি রোগীর আর্থিক ক্ষতি ছাড়া শারীরিক ক্ষতিও করতে পারে। গোমাংস খেলে পাপ হওয়ার মত টনিক খেলে ভাল হয় জাতীয় ধারণার জন্য, নিছক মানসিক কারণেই অনেকের ক্ষেত্রে টনিক খেলে শরীর ভাল হয়। কোন চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইতেই টনিককে প্রকৃত কার্যকরী ওষুধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। যেমন টনিকের সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে, "এরা সেই সব পদার্থ যাদের সম্পর্কে আশা করা হয় যে,

তারা শরীরের জোর বাড়াবে,—কোন রোগ, দুঃখ, অতিরিক্ত কাজ বা খেলাধূলা, শারীরিক বা মানসিক ঘাটতি ইত্যাদির কারণে যে জোর কমে গেছে এবং যার ফলে কেউ প্রাত্যহিক জীবনের টানা পোড়েন সামাল দিতে পারছে না। এই ধরনের 'জোর কমে যাওয়ার' বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বিশেষ কোন ত্রুটির কারণে এটি ঘটছে না, যে ত্রুটির জন্য বিশেষ চিকিৎসা রয়েছে।···(টনিক থেকে এসব ক্ষেত্রে) উপকার পাওয়ার ব্যাপারটা ঘটে প্ল্যাসেবো ধরনে এবং আশ্বাস, মানসিক সাহস বা স্তোকবাক্যের বদলে ডাক্তার 'ওধুধের' বোতল ব্যবহার করছেন। বহু মানুষই কোন রোগভোগের পর (বা 'শরীর খারাপের' জন্য) ডাক্তারের কাছ থেকে টনিকের আশা করেন এবং তাঁদের যদি বলা হয় যে এ টনিক খেয়ে যে উপকার তাঁরা অনুভব করেন তা প্রকৃতপক্ষে এর কোন ওষধি কাজের জন্য আদৌ নয়, তবে তাঁরা এ ধরনের কথায় সন্দেহ প্রকাশ তো করবেনই, এমনকি মানসিক আঘাতও পাবেন"। (Laurence's Clinical Pharmacology)

তবে রোগী-সাধারণের এ ধরনের আশা তো আকাশ থেকে সৃষ্টি হয় নি। ওষুধ কোম্পানীরা সুকৌশলে চিকিৎসকদের কাজে লাগিয়ে এ ধরনের বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে দীর্ঘদিনের প্রচারের ফলে। তাই ঈশ্বর বিশ্বাস বা জন্মান্তরের মত প্রাচীন সংস্কারের তুলনায় এধরনের অর্বাচীন আধুনিক সংস্কার বিজ্ঞানের নামে সৃষ্টি করা হয়েছে অত্যন্ত সচেতন ভাবে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে।

একইভাবে হরলিক্স, ভিভা, মল্টোভা, গ্লুকন-ডি, গ্লুকন-সি-র মত মালকড়িকে ঘিরেও সৃষ্টি করা হয়েছে সংস্কার। ঠাকুরের থানে পূজো দিয়ে বা মানত করে মুস্কিল আশান করার মত আর টনিকের মত, এসব পদার্থের থেকেও আশা করা হয় যে এগুলি দুর্বল শরীরের পক্ষে নিশ্চিত বলকারক, মহান শক্তিদাতা। অথচ টনিক সহ এ সব পদার্থে যে সব জিনিষ থাকে, সেগুলি অনেক সস্তায় সাধারণ খাবার থেকেই পাওয়া যায়। টনিকের ঐ সব ভিটামিন বা হরলিক্স-এর

গমের গুঁড়ো এত দাম দিয়ে কেনার কোন প্রয়োজন নেই। যাঁরা এগুলি হজম করতে পারেন তাঁরা প্রচলিত সাধারণ খাবার দাবার হজম করেও ঐ একই উপাদান অনেক সহজে পেতে পারেন। সংস্কার এটাই যে, কষ্টার্জিত পয়সা খরচ করে লেবেল দেওয়া বোতলের মাল খেলেই শরীর ভাল হওয়ার আশা করা।

এ ধরনের পদার্থগুলি চিকিৎসাবিজ্ঞানেও বিপদের আভাস নিয়ে আসছে। তাই সতর্কতা উচ্চারণ করতে হচ্ছে,—"বিভিন্ন কোম্পানী অসংখ্য তথাকথিত টনিক বাজারে ছেড়েছে, যাদের মধ্যে সক্রিয় পদার্থও রয়েছে। এ গুলিকে পরিহার করা দরকার। টনিকের নামে ভিটামিনের অপরিণামদর্শী ব্যবহার সম্পর্কে প্রচার ওষুধ কোম্পানিগুলি ব্যাপক ভাবেই করে এবং ধোঁকা খেয়ে রোগীদের তা লিখেও দেওয়া হয়। অথচ উদাহরণ স্বরূপ, ভিটামিন-এ ও-ডি এভাবে দিলে ভয়াবহ বিপদের সৃষ্টি করতে পারে"। (ঐ) বেবিফুডের ব্যবসায়ীরাও মায়েদের মধ্যে এ ধরনের সংস্কারের সৃষ্টি করেছে। ফলে বুকের দুধ থাকুক বা না থাকুক, বুকের দুধের চেয়ে বাচ্চাদের বেবিফুড দিয়ে স্বাস্থ্যবান করে তোলার আশা করা হয়। অথচ শিশুর ৫-৬ মাস বয়সের আগে বেবিফুড দেওয়া তো বিপজ্জনকই, এমনকি তার পরেও সাধারণ খাবারদাবার কমিয়ে বা না দিয়ে ঐ ধরনের ফুড দেওয়া শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর।

ধর্মের মুখোশ পরিয়ে পুরনো সংস্কারের মত, বিজ্ঞানের আর আধুনিকতার মুখোশ পরিয়ে এধরনের সাম্প্রতিক ও ক্ষতিকর সংস্কারগুলিকেও দূর করা দরকার।*

---

* এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে লেখকের 'ওষুধ খেয়ে অসুখ' বইতে।

২

শারীরিক নানা ঘটনা

শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, নানা অংশে বিভিন্ন ধরনের খটনা ঘটে। এগুলির পেছনকার শারীরবৃত্তীয় কারণগুলির অনেককিছুই বর্তমানে জানা গেছে। কিন্তু মাত্র শতখানেক বছর আগেও এসবের অনেক কিছুই ছিল অজানা। তাই তাদের ঘিরে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ নানা কল্পনার মধ্য দিয়ে অজস্র সংস্কারের জন্ম দিয়েছে। অভিজ্ঞতার সাথে কল্পনা মিশিয়ে মনগড়া নানা সিদ্ধান্ত টেনেছে। এই সব সংস্কারের কয়েকটির পেছনে সঠিক পর্যবেক্ষণের কারণে কিছু যুক্তি থাকলেও, অধিকাংশই বিজ্ঞানসম্মত নয়।

শারীরিক এইসব ঘটনার অল্প কয়েকটির আলোচনা এখানে করা হল।

চোখের পাতা নাচা

কোনো চোখের পাতা বিভিন্ন সময়ে নাচলে তার নাকি শুভ-অশুভ ফল আছে। ছেলেদের চোখের পাতা আর মেয়েদের চোখের পাতা নাচার ফলাফলও নাকি আলাদা। আপনি যদি ছেলে হন, তবে আপনার ডানদিকের উপরের পাতা যদি আপনা আপনি কয়েকবার নাচে তবে আপনার শুভ হবে, বাঁদিকের নাচলে অশুভ; মেয়েদের ক্ষেত্রে উল্টোটা। নানা জায়গায় র আবার ব্যাখ্যা নানা ধরনের।

কিন্তু চোখের পাতা নাচার ব্যাপারটা কি ? আমাদের সকলেরই চোখের পাতায় আসর পাতিয়ে পরপর রয়েছে কয়েকটা মাংস-পেশীর পাত্‌লা স্তর। চোখের পাতায় থাকে দুটি মাংসপেশী—অরবিকুলারিস অকুলি (Orbicularis oculi), আর লিভেটর প্যাল্পেব্রি সুপিরিওরিস (Levator palpebrae superioris)। শেষোক্ত মাংসপেশীটি যখন সংকুচিত হয় তখন চোখের পাতা ওপরে

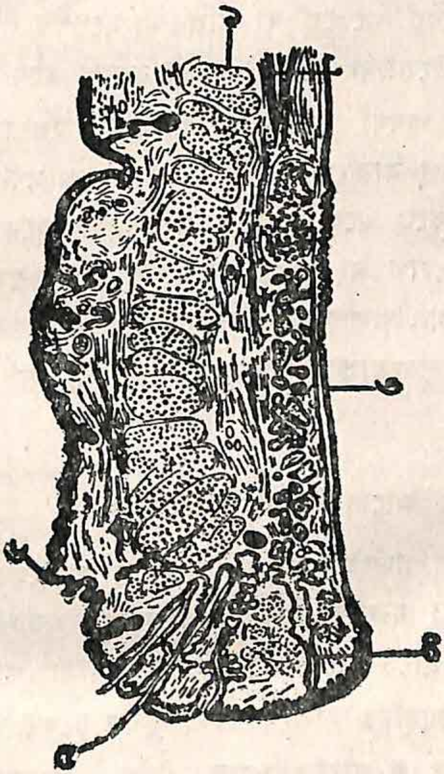
ওঠে। আর প্রথম মাংসপেশীটির দুটি অংশ—চোখের পাতার (Palpebral) ও চক্ষু গোলকের (orbital)। এর প্রথম অংশটি সংকুচিত হলে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর মাধ্যমে এইসব মাংসপেশীকে সংকুচিত বা প্রসারিত করতে পারি। আবার আমাদের ইচ্ছে করুক, ছাই না করুক, কোন সামান্য বা অসামান্য উত্তেজনায় ওরা, বিশেষতঃ অর্বিকুলারিস অকুলির চোখের পাতার অংশটি, আমাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে (involuntarily) নড়তে পারে অর্থাৎ চোখের পাতা আপনা আপনি নাচাতে পারে। তখন বলা হয় চোখের পাতাটি প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় (অর্থাৎ reflexly)* নড়ল। আসলে এই ধরনের নড়ার ব্যাপারটা চোখকে রক্ষা করার একটি প্রাকৃতিক উপায়। চোখের সামনের পাৎলা আবরণী কনজাংটাইভা শুকিয়ে গেলে ক্ষত হয়ে যেতে পারে। এটি যাতে না হয় তার জন্য কয়েক

---

* বাহ্যিক কোন উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় শরীরে আপনা থেকেই (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় সেটা করেন না) যে ক্রিয়া ঘটে তাকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে। স্নায়ুতন্ত্রের কাজের সংহতির পরিচায়ক হিসেবে এবং আমাদের শারীরিক নানা কাজকর্ম ও জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পেছনে এটি একটি প্রাথমিক শারীরবৃত্তীয় ঘটনা। এটি দু'ধরনের হয়—শর্তনিরপেক্ষ (unconditioned) ও শর্তাধীন (conditioned)। প্রথমটি জন্মগতভাবে পাওয়া এবং এর স্নায়বিক পথ নির্দিষ্ট। প্রস্রাবের থলিতে মূত্র জমলে প্রস্রাব করা, শরীর কাৎ হয়ে পড়লে সোজা হয়ে যাওয়া, যৌন উত্তেজনার ঘটনা ইত্যাদি নানা শারীরিক ঘটনা এইভাবে ঘটে। অর্বিকুলারিস অকুলি মাংসপেশীর চোখের পাতার অংশটির অনৈচ্ছিক সংকোচনও এইভাবে ঘটে। ব্যাপারটি আমাদের ইচ্ছানির্ভর না হলেও সম্পূর্ণতই স্নায়ুনির্ভর। মুখের স্নায়ু (facial nerve)-এর একটি শাখা একে নিয়ন্ত্রণ করে—কিন্তু বাইরের বা ভবিষ্যতের কোন শুভাশুভ ঘটনা নয়।

শর্তাধীন প্রতিবর্তী ক্রিয়া আমাদের অভিজ্ঞতাসঞ্চয় ও শিক্ষাগ্রহণের প্রাথমিক ব্যাপার। এটি জন্মের পর লাভ করা হয় এবং পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। নানা ধরনের অভ্যাস (habits), বিশেষ খাবার দেখলে মুখে লালা জমা ইত্যাদি এর উদাহরণ। ঠাকুর দেবতার ছবি দেখলেই কপালে হাত ঠেকান বা ভক্তি প্রকাশ করার ব্যাপারটি ছোট বেলা থেকেই শেখাতে থাকলে তাও একসময় শর্তাধীন প্রতিবর্তী রূপ নেয়।

সেকেণ্ড অন্তর অন্তর চোখের পাতা বন্ধ হয়—এর ফলে চোখের বাইরের কোণে থাকা অশ্রুগ্রন্থি (lacrimal gland)-এর চোখের জল সারা কনজাংটাইভায় ছড়িয়ে গিয়ে তাকে ভিজিয়ে রাখে। চোখের কাছাকাছি কিছু এলেও প্রতিরক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় চোখের পাতা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। চোখে সূক্ষ্ম ধূলো বালি পড়লেও পাতা কয়েকবার নেচে নেচে এগুলিকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে।



চোখের পাতার বিভিন্ন অংশ—ভেতরে এমন কিছুই নেই যা নেচেনেচে শুভাশুভ জানাবে। (১) অর্বিকুলারিস অকুলি মাংসপেশী (এটি সংকুচিত হলে চোখ বন্ধ হয়); (২) লিভেটের প্যাল্পেব্রি সুপিরিওরিস (এটি সংকুচিত হলে চোখের পাতার ওপরে ওঠে); (৩) চোখের পাতার পেছনের আবরণী 'কনজাংটাইভা' ; (৪) চোখের পাতার গ্ল্যাণ্ড—এটির প্রদাহ হলে তথাকথিত অঞ্জনি হয় ; (৫) চোখের পাতার নীচের দিকের চুল ; (৬) চোখের পাতার সামনের চামড়া।

এছাড়া কিছু কিছু রোগেও চোখের পাতা দীর্ঘক্ষণ ধরে নাচতে পারে। এই অবস্থার পোযাকি নাম ব্লেফারোস্পাজম্ (blepharospasm) (গ্রীক শব্দ blepharon-এর অর্থ চোখের পাতা ; spasm মানে সংকোচন)। বৃদ্ধ বয়সে এটি ঘটতে পারে। এছাড়া চোখের ব্যথা বা নানা ধরনের রোগ, যেমন হিস্টেরিয়া ও বিশেষ কয়েকটি স্নায়বিক রোগে এবং খনি শ্রমিকদের মধ্যে এটি দেখা যায়।

সোজা কথায় অল্প দু'চারবার চোখের পাতা নাচলে সাধারণভাবে চোখে কিছু পড়েছে বা সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীর (orbicularis oculi) মৃদু উত্তেজনা ঘটেছে—এটিই বুঝতে হবে। মিছিমিছি শুভাশুভ ভেবে অযথা আহ্লাদিত বা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, যদি আপনার চোখের পাতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেচে যেতেই থাকে তবে বুঝতে হবে কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে—হয় চোখের ভেতরে কোন রোগ বা সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীকে নিয়ন্ত্রণ করে যে স্নায়ু তার কোন রোগ ; অত্যন্ত শুভ বা সাংঘাতিক অশুভ কিছু নয়। তাই এক্ষেত্রে শুভাশুভ ভেবে সময় নষ্ট না করে, ডাক্তার দেখানই ভাল।

আরো কিছু শারীরিক নাচানাচি

শুধু চোখের পাতাই নয়, শরীরের নানা প্রত্যঙ্গের নাচানাচি বা স্পন্দনেরও নানা ধরনের সংস্কারাচ্ছন্ন ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন পুরুষের ডান হাতে-পায়ের স্পন্দন নাকি আসন্ন পরিণয়ের ইঙ্গিত বহন করে। কন্বমুনির আশ্রমে রাজা দুষ্মন্ত ঢুকেই অনুভব করলেন তাঁর ডান হাত ও পায়ের স্পন্দন হচ্ছে। অবশেষে শকুন্তলার সাথে তাঁর পরিণয় ঘটলো। কালিদাস এভাবে ব্যাপারটাকে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং বোঝা গেল বিশ্বাসটি অনেক প্রাচীন। দুষ্মন্তের হাত-পায়ের সত্যিই স্পন্দন হয়েছিল নাকি ব্যাপারটি নিছকই মহাকবির কল্পনা তার বিচার না করেও বলা যায়, এই ধরনের স্পন্দনের সাথে পরিণয়ের কোন সম্বন্ধ নেই। হাতের বা পায়ের

ঐচ্ছিক মাংপেশীগুলিকে আমরা নিজেদের ইচ্ছায় নাড়াতে পারি। কিন্তু অনেক সময় ঐ সব মাংসপেশীর স্নায়ু কোন কারণে সামান্য উত্তেজিত হলে আপনাআপনিই সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীর স্পন্দন ঘটতে পারে। অনেক সময় কায়দা করে ইচ্ছাকৃতভাবে এভাবে কাঁধ ঝাঁকানি অনেকে দেয়। পরে সেটি স্থায়ী হয়ে যেতে পারে, তখন তাকে বলা হয় tic. মানসিক দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদি কারণে হাত পায়ের অনৈচ্ছিক স্পন্দন ঘটতে পারে। এছাড়া মস্তিষ্কের ও স্নায়ুর বিভিন্ন রোগেও এটি ঘটে। তাই এক-আধবার হাতে পায়ের স্পন্দনের জন্য বিবাহিতদের চিন্তিত বা অবিবাহিতদের আনন্দিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু বারবার যদি এটি ঘটতে থাকে তবে ডাক্তার, বিশেষত: কোন স্নায়ু বিশেষজ্ঞকে দেখান ভাল।

হাঁচির বাধা

কোথাও বেরুচ্ছেন, এমন সময়, আচমকা আপনি হেঁচে ফেল্লেন বা অন্য কেউ হাঁচলো বা হাঁচির শব্দ শুনলেন। অমনি সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠবেন, বসে যাও, বসে যাও। আপনার মনটাও খুঁত খুঁত করতে লাগল, 'বেরুনর মুখেই বাধা'! যেন হাঁচিটা আপনাকে বেরুতে বাধা দিচ্ছে! বোঝাচ্ছে বাইরের কোন বিপদের কথা, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই যেন হাঁচির এই অশুভ গুণটা কেটে যাবে, বিপদমুক্ত হবেন আপনি।

আদৌ কি ব্যাপারটা তাই? মোটেই না। হাঁচি শরীরের একটি প্রতিরক্ষামূলক প্রক্রিয়া। কোন কারণে আমাদের নাকের ভেতরের পাৎলা আবরণীটি উত্তেজিত হলে trigeminal ও olfactory নামে দুটি নার্ভের উত্তেজনা ঘটে, এবং আপনা-আপনি শ্বাসপ্রশ্বাসের মাংসপেশীগুলো সহসা সংকুচিত হয়ে হাঁচি ঘটায়। এটিও একটি প্রতিবর্তী ক্রিয়া। নাকের ভেতর কিছু ধূলোবালি ঢুকলে এইভাবে হেঁচে তা বের করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অ্যালার্জি হলেও হাঁচি হতে পারে—তা সে কোন খাবার, যেমন

ডিম, চিংড়ি মাছ ইত্যাদি, ফুলের রেণু, পশুপাখির লোম, ধূলোবালি যেটিতেই হোক না কেন। সবার এই অ্যালার্জি হয় না, আপনার হয়েছে। যাই হোক, নাকের ভেতরের পাৎলা আবরণীর উত্তেজনাটা স্নায়ু মারফৎ মস্তিষ্কে গেল এবং ঘুরে ফিরে মস্তিষ্কে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার জন্য যে কেন্দ্র বা অংশ রয়েছে তাকে উত্তেজিত করল। উত্তেজিত করল মুখের মাংসপেশীকেও। ফলে আপনি নাকমুখ কুঁচকে প্রচণ্ড বেগে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ফেললেন অর্থাৎ হাঁচলেন। এর সঙ্গে বাইরের 'শুভ-অশুভ' ব্যাপারের যোগটা কোথায়?

তাই করেই দেখুন না একবার! বেরুনোর মুখে হাঁচা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়ুন। দেখবেন শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে নতুন কোন ঝামেলা হবে না। আর যদি এক আধবার কিছু হয় তা হাঁচি হলেও হত, না হলেও হত। অর্থাৎ কিনা কাকতালীয়। তবে একটা ব্যাপার। হাঁচি সম্পর্কে সংস্কারটা যদি আপনার মনের গভীরে শিকড় গেড়ে থাকে, তাহলে জোর করে বেরিয়ে পড়লেও আপনার মনে খচখচ্ করবে ব্যাপারটা। ফলে অন্যমনস্ক হয়ে কলার খোসায় পা পিছলাতে পারেন বা পাথরে হুঁচোট খেয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাতে পারেন অথবা এই জাতীয় কিছু ঘটতে পারে। এতে হাঁচির দোষটা কোথায়? দোষটা আপনারই সংস্কারাচ্ছন্ন মনের দুর্বলতার।

তবু সংস্কারটা এমনই যে, কোন 'শুভ' অনুষ্ঠানের শুরুতে হাঁচি পড়লে অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়ার উদাহরণও রয়েছে। আবার কখনো কেউ হাঁচলে আশেপাশের বন্ধু বা আত্মীয়রা বলে ওঠেন 'জীয়ো' বা 'জীব'। হাঁচির তাড়শে 'আত্মা বা প্রাণবায়ু' বেরিয়ে যাচ্ছে—এই ধারণা থেকে এই কথা বলা হয় কিনা কে জানে! তবে মালয়ে এ ধারণা চালু। তাই হাঁচির পর জোরে নিজের নাম ডেকে এই 'আত্মাকে' ফিরিয়ে আনা হয়। বিশেষতঃ পার্বত্য অঞ্চলের অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের কোন বাচ্চা হাঁচলে তার মা বাচ্চার

নাম ধরে আত্মাকে ডেকে বলে 'ফিরে এসো'। প্রাচীন গ্রীসের রীতি ছিল বা এখনো হয়তো আছে, হাঁচির পর 'জুপিটার রক্ষা করুন' জাতীয় কথাবার্ত্তা বলা। ইংলণ্ডে কোন্ বারের হাঁচির কি ফল তা নিয়ে ছড়াও রয়েছে। আর কেউ হাঁচলে বলা হয়, 'ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ করুন'। জাপানীরা মনে করে হাঁচির সংখ্যার উপর শুভ-অশুভ নির্ভর করে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে এই ধরনের সংস্কারের বৈচিত্র্য তাদের নানা খাতে বওয়া কল্পনার জন্যই ঘটেছে। হাঁচি হাঁচিই। এর সাথে আত্মা বেরোয় না, কারণ আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। যা বেরোয় তা হল জলীয়বাষ্প, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বনডাই অক্সাইড ইত্যাদি যুক্ত ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা বাতাস।

তবে কোথাও বেরুনর মুখে যদি দেখেন ক্রমাগত খালি হেঁচেই যাচ্ছেন, নাক দিয়ে জল পড়ছে, শরীরটা কেমন লাগছে, তবে বুঝতে হবে আপনার শরীর খারাপ, ভাইরাসের আক্রমণে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে কিংবা হয়েছে অন্য কোনকিছুতে সাংঘাতিক এ্যালার্জি। সেক্ষেত্রে হাঁচির অশুভ ফলের জন্য নয়, শরীর খারাপের জন্যই বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

দাঁতে পোকা

বাচ্চাটা 'দাঁতের ব্যথায়' বেশ কষ্ট পাচ্ছে। হাঁ করিয়ে দেখলেন, কোণার দিকে একটা দাঁতে কালো গর্ত। আপনার ডাক্তারি সিদ্ধান্ত হবে বাচ্চাটির দাঁতে পোকা লেগেছে। সাধারণভাবে আমরা সবাই-ই তাই বলি,—দাঁতে পোকা। কিন্তু আসলে দাঁতে পোকা লাগে না, যা হয়, দাঁত ক্ষয়ে যায়।

আমাদের দাঁতের যে সাদা, শক্ত অংশটি দেখতে পাওয়া যায় তার নাম এনামেল (enamel)। এটি শরীরের সবচেয়ে শক্ত অংশ। এতে রক্তবহা নালী থাকে না ; স্নায়ুও থাকে না—তাই ব্যথা অনুভূতির কোন ক্ষমতা এর নেই। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস,

অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরী হাইড্রক্সিএ্যাপাটাইট [$Ca_5(Po_4)_3OH$] নামে এক পদার্থ দিয়ে এর বেশীরভাগ অংশ গঠিত। ভাত-রুটি বা চকোলেট ইত্যাদি খাওয়ার পর যদি দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে এইসব শর্করা জাতীয় খাদ্যের টুকরো লেগে থাকে তবে মুখের ভেতর এমনিতেই থাকা নানা ধরনের জীবাণু (যেমন Lactobacilli, Streptococci ইত্যাদি) তাদের বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে পায় এবং এই সব জীবাণু শর্করা খাদ্যের টুকরোর সাহায্যে এ্যাসিড তৈরী করে। ল্যাকটিক অ্যাসিড, পাইরুভিক অ্যাসিড, এ্যাসেটিক অ্যাসিড, বুটারিক অ্যাসিড ইত্যাদি তৈরী হয়ে এনামেলে থাকা পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় দাঁতের শক্ত এনামেলকে ধীরে ধীরে ক্ষইয়ে দিতে থাকে। এনামেলের ওপর হলুদ রঙের ছোপ ছোপ হয়ে গেলে এই ধরনের অ্যাসিড তৈরীর সুবিধা হয়। আর একবার দাঁতের গভীরে ক্ষয় ঘটে গেলে দাঁতের কেন্দ্রস্থলে থাকা স্নায়ুর সূক্ষ্ম অংশগুলি অ্যাসিড ও খাবারের টুকরোয় উত্তেজিত হয়; শুরু হয় দাঁতের যন্ত্রণা। খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি অথবা পানীয় জলে ফ্লোরিন-এর অভাব ঘটলে এনামেল অংশটি দুর্বল হয়ে পড়ে; তখন অতি সহজেই সেটি এইসব অ্যাসিডের আক্রমণে কাহিল হয়ে যায়—শুরু হয় দন্তক্ষয় (dantal caries)। তাই খাওয়া-দাওয়ার পর মুখ ভাল করে নিয়মিত ধুলে বা বাচ্চারা চকোলেট ইত্যাদি খেয়ে ফেলার পর তাদের মুখের ভেতরটা কুলকুচি করে পরিষ্কার রাখলে এই ধরনের দন্তক্ষয় রোধ করা যায়। ভিটামিন-ডি ও ক্যালসিয়ামের অভাব যাতে না ঘটে তার জন্য বাইরে থেকেও এগুলির জোগান দেওয়া যায়। সাধারণত ডিম, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদিতে এসব যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এছাড়া, সূর্যের আলো চামড়ায় পড়ে চামড়াতেই যথেষ্ট ভিটামিন-ডি তৈরী হয়। আর পানীয় জলে ফ্লোরিনের অভাব যাতে না হয় তারজন্য অনেক উন্নত দেশে পানীয় জলে অতি সামান্য পরিমাণে ফ্লোরিন মিশিয়ে দেওয়া হয়। অনেক টুথপেষ্টেও অল্প পরিমাণে

ফ্লোরিন দেওয়া থাকে দাঁতের এনামেলকে শক্ত রাখার উদ্দেশ্যে। (এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, ব্যবসায়িক স্বার্থে বিভিন্ন টুথপেষ্টের যে হাজারো গুণ ও প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করা হয় তার প্রায় সবটাই মিথ্যা। দাঁতের সুস্বাস্থ্যের জন্য এর প্রয়োজন প্রায় নেই। আসল প্রয়োজন হচ্ছে দাঁতকে ভালভাবে ব্রাশ করা তা সে নিম বা শ্যাওড়ার ডাল দিয়েই হোক বা প্ল্যাষ্টিকের টুথব্রাশ দিয়েই হোক। আর আমাদের দেশের জলে ফ্লোরিনের ঘাটতি তো নেই-ই, বরং কোথাও কোথাও তার পরিমাণ একটু বেশীই। তাই আমাদের দেশের পক্ষে ফ্লোরিনযুক্ত টুথপেষ্টের প্রয়োজন নেই, বরং অনেক সময় এ ধরনের টুথপেষ্ট ক্ষতিই করে)।

যাই হোক, মোদ্দা কথা বোঝা গেল, দাঁতের ব্যথা ঘটে দাঁতের এনামেলটি অ্যাসিডে ক্ষয়ে যাওয়ার পর নীচের স্নায়ুর উত্তেজনার জন্যই, কোন পোকা লাগবার জন্য নয়। অবশ্য Lactobacilli, Streptococci ইত্যাদি জীবাণুকে পোকা ধরলে আলাদা কথা। কিন্তু প্রথমতঃ, এরা এনামেলকে সরাসরি কখনো ক্ষয় করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এরা আকারে এতই ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া এদের দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়, তাই সাধারণভাবে এদের পোকা বলা হয় না।

আসলে আলু-বেগুন বা ফলমূলে পোকা লাগলে যেমন কালো গর্ত হয়ে যায়, দাঁতের গায়েও ঐ রকম ক্ষত হতে দেখেই সাধরণভালে ভুল ধারণা হয় যে দাঁতে যেন পোকা লেগেছে। কিন্তু মুস্কিল হয় যখন দেখা যায়, অনেকে জোর দিয়েই বলেন যে, দাঁত থেকে বেশ বড় একটা পোকা বেরুতে দেখেছেন অথবা রাস্তার ধারে বসা বা গ্রামে বাড়ী বাড়ী ঘুরে জড়ি-বুটি-মাজন বিক্রেতারা বিশেষ কায়দায় ঐ ধরনের পোকা সকলের চোখের সামনে দাঁত থেকে বের করে দেয়—দেখা যায় কয়েক মি· মি. লম্বা একটা পোকা যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যে। দন্তক্ষয়ের রোগীর দাঁত থেকে কখনোই এ ধরনের পোকা বের করান সম্ভব নয়।

অনেক সময় ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁতের একটি ছোট্ট টুকরো শক্ত জিনিষ চিবানোর সময় বা অন্য কোন কারণে আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসে। এটিকে কেউ দাঁতের বড় পোকা দেখেছেন বলে ধারণা করেন। আর জড়ি-বুটি-মাজন বিক্রেতারা অনেক সময় যে 'পোকা' দেখায় তা আসলে ধোঁকা।

দেখা গেছে এই ধরনের লোকেরা আসলে কুমড়োর শুকনো বিচিকে খুব সরু একটু লম্বাটে টুকরো করে কাটে। তারপর এই টুকরোর দু-তিনটিকে মেশায় মাজনের গুঁড়োর সঙ্গে। এই মাজন দিয়ে বলা হয় দাঁত মাজতে আর বিশ্বাসযোগ্য বক্তৃতার মাধ্যমে বোঝান হয় এই মাজনের এমনই গুণ যে, এতে দাঁত মাজলে দাঁতের পোকা বেরিয়ে আসবে। আসলে মুখের ভেতরের লালার সংস্পর্শে এসে মাজনের মধ্যে থাকা কুমড়ো বিচির শুকনো টুকরোগুলি ফুলতে থাকে। তারপর থুথুর মধ্যে থাকা বাতাসের বুদ্বুদের ধাক্কায় এগুলো নড়তে থাকে, আর দাঁতের পোকার অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ়মূল ধারণা থাকায়, মনে হয় দাঁতের পোকা বেরিয়ে এল। তখন মাজনের বিক্রি ঠেকায় কে? গরীব জড়ি-বুটি-মাজন বিক্রেতারা পেটের দায়ে এ ধরনের চালাকির আশ্রয় নেয়, সাধারণ মানুষের মিথ্যে বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাদের ঠকায়। কোন কোন সময় এই ধরনের মাজন দিয়ে দাঁতমাজলে 'পোকায় লাগা' দাঁতের ব্যথাও কমে যায়। এটিও আসলে ঘটে কৌশলে একটু লবঙ্গ তেল (clove oil) আক্রান্ত দাঁতে লাগানর মাধ্যমে, তা সে মাজনের মধ্য দিয়েই হোক বা দাঁত পরীক্ষা করার ছলে আঙ্গুলে লাগিয়ে রাখা লবঙ্গ তেল দাঁতের গোড়ায় দিয়েই হোক।

তাই 'দাঁতে পোকা লেগেছে' বা 'দাঁতের পোকায় ভুগছেন' কথাগুলি ভুল। আসলে হয়েছে দন্তক্ষয়। খুব ব্যথা হলে লবঙ্গ তেল দিতে পারেন, ব্যথা কমানোর ঔষধ খেতে পারেন। তবে এর প্রকৃত চিকিৎসা আক্রান্ত দাঁতটিকে তুলে ফেলা। আর দন্তক্ষয় যাতে না হয় তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তাতো আগেই

বলা হয়েছে। কিন্তু দাঁতের পোকা বের করে দেওয়ার ধেঁকায় দয়া করে ভুলবেন না।*

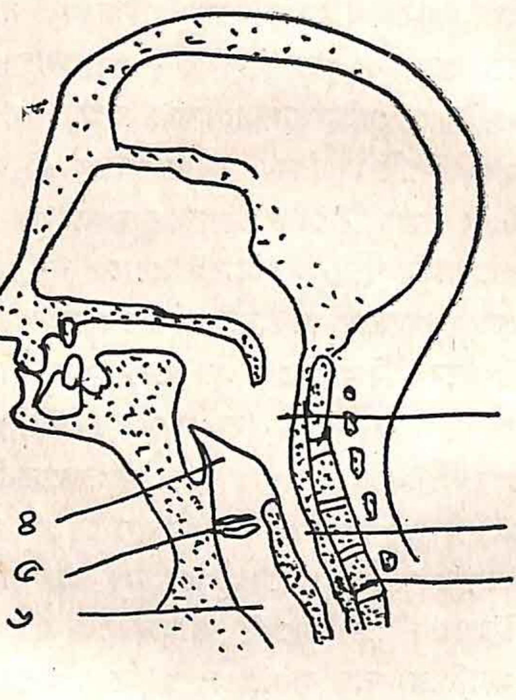
বিষম খাওয়া

খেতে খেতে হঠাৎ বিষম খেলেন, যদিও এটি কোন খাদ্যদ্রব্য নয়। জল খেয়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে কোনরকম সামলে তো নিলেন, তারপর শুরু হল গবেষণা—কেন এই আচমকা বিষম খাওয়া। নিশ্চয়ই দূরে কেউ আপনার কথা বলছে বা ভাবছে। তাই এই আচমকা বিপত্তি। বিষম খাওয়ার সাথে এই telecommunication-এর ব্যাপারটাকে হামেশাই যুক্ত করে ফেলা হয়।

আসলে ব্যাপারটি ঘটে আপনারই দোষে বা অন্যমনস্কতার জন্য। আমাদের মুখগহ্বরের পেছনের অংশটিকে বলা হয় ফ্যারিংক্স, ওপরে নাকের পেছনের দিক থেকে এর শুরু আর নীচে, গলার সামনের দিকে থাকা শ্বাসনালী (trachea)-র ওপরের অংশে এর শেষ। ফ্যারিংক্স-এর মধ্যবর্তী অংশটি থাকে মুখগহ্বরের ঠিক পেছনে (oropharynx)। এরপর শুরু হয় খাদ্যনালী (oesophagus) যা মুখগহ্বর থেকে খাদ্যকে পেটের মধ্যেকার পাকস্থলিতে নিয়ে যায়। ফ্যারিংক্সের নীচের দিকেই আবার শুরু হয় ল্যারিংক্স ও শ্বাসনালী। ফ্যারিংক্স আর ল্যারিংক্স-এর মধ্যে থাকে এপিগ্লটিস (epiglottis) নামে তরুণাস্থি (cartilage) দিয়ে তৈরী একটি ভাল্‌ভের মত জিনিষ। আমরা যখন কোনকিছু গিলেফেলি তখন এই এপিগ্লটিস ভাল্‌ভের মত ল্যারিংক্স্-এর মুখটিকে বন্ধ করে দেয় ফলে খাবারের টুকরো বা তরলের ফোঁটা ল্যারিংক্স-এ ঢুকতে পারে না। আবার শ্বাস নেওয়ার সময় এটি খুলে যায় যাতে হাওয়া শ্বাসনালীতে ঢুকতে পারে। কিন্তু যদি অন্যমনস্কভাবে খাওয়া হয়

* হাঁ-করে ঘুমুলে কখনো সখনো মাছি মুখের ভেতর ডিম পাড়তে পারে। মুখের ভেতরে নোংরা আর খাবারের টুকরো থাকলে তো কথাই নেই। এই ডিম ফুটে সাদা লম্বাটে লার্ভা বেরোয়। অবশ্য দাঁতের এনামেলকে ক্ষইয়ে দেবার মত ক্ষমতা এদেরও নেই।

বা খেতে খেতে কথা বল্লে, হাসলে—এপিগ্লটিস ঠিকমত বন্ধ হয় না বা শ্বাস নেওয়ার সাথে খাবার গেলার ব্যাপারটা একই সময়ে ঘটে যায়। ফলে খাদ্যদ্রব্যের টুকরো ল্যারিংক্‌স্‌-এ ঢুকে যেতে পারে। আর সঙ্গে সঙ্গেই বিপত্তি। ল্যারিংক্সের অতি সংবেদনশীল



বিষম যেখানে খাওয়া হয়—(১) ওরো ফ্যারিংক্স ; (২) খাদ্যনালী ; (৩) মেরু দণ্ড ; (৪) এপিগ্লটিস ; (৫) স্বরযন্ত্র ; (৬) শ্বাসনালী ; খাবার খাওয়ার সময় এপিগ্লটিস শ্বাসনালীর মুখ বন্ধ রাখে। যদি সুষ্ঠুভাবে তা না ঘটে, তবে খাবারের টুকরো শ্বাসনালীতে ঢোকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষম খেয়ে এই টুকরো বের করানোর চেষ্টা চলে। তরল পদার্থের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে।

আবরণটির স্নায়ু (vagus nerve) উত্তেজিত হয়। শুরু হয় কাশি—এবং এটিই বিষম খাওয়া। আসলে এইভাবে চেষ্টা করা হয় অবাঞ্ছিত ঐ খাদ্যদ্রব্যকে ল্যারিংক্‌স্‌-শ্বাসনালীর এলাকা থেকে দূর করে দেওয়ার, না হলে ল্যারিংক্‌স্‌ এর সংকোচন হয়ে শ্বাসরুদ্ধ

হয়ে মারাও যেতে পারে লোকে। এই মৃত্যুর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভেগাস নার্ভের উত্তেজনাও কাজ করে ; এই নার্ভ শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃদপিণ্ডের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

যাই হোক বিষম খাওয়ার ব্যাপারটি ঘটে আমাদেরই দোষে ; দূরের বিরহী কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের আমাদের স্মরণ করার জন্য নয়। বরং ব্যাপারটা হয়তো উল্টোই—আমিই কারোর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি, বা খেতে খেতে কথা বলছি বা হাসছি। তাই খাওয়ার সময় নিশ্চিন্তে ঠিকমত শুধু খেয়ে যাওয়াই দরকার যাতে বিষম খাওয়া এড়ান যায়। আর বিষম খেলেও দূরের কারোর কথা ভেবে মনকে ভারাক্রান্ত করাটা বোকামি। দূরের কারোর চিন্তা আপনার এপিগ্লটিসকে খুলে রাখতে পারে না বা খাবারের টুকরো ল্যারিংক্স্-এ ঢোকাতে পারে না,—এপিগ্লটিস আর ল্যারিংক্স্-এর মালিকই এই সব কাজ করে।

রথে চুল

রথের মেলার সময় মাথার চুল কেটে রথে দিলে নাকি চুল তাড়াতাড়ি বড় হয়। কেশবতী হওয়ার ইচ্ছায় অনেকেই একগাছি চুল কেটে জগন্নাথের কাছে সমর্পণ করে। দড়ি টেনে টেনে জগন্নাথের রথকে যেমন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তেমনি জগন্নাথও চুল টেনে টেনে বড় করে দিতে পারেন—এ ধরনের বিশ্বাস থেকে এ সংস্কারের জন্ম কিনা জানি না, তবে রথে চুল দিলে চুল যে বড় হয় না তা ঘটনা।

আমাদের শরীরের চুল আসলে মৃত একটি অংশ ; এটি কেরাটিন নামে এক ধরনের প্রোটিন (scleroprotein) দিয়ে তৈরী। এর মধ্যে স্নায়ুও নেই, রক্তবহা নালিকাও নেই। তাই চুল কাটলে ব্যথা বা রক্তপাত কিছুই হয় না। তাই বলে এটি অপ্রয়োজনীয় আদৌ নয়। মাথার চুল যেমন কুশনের মত জিনিস তৈরী ক'রে মাথার খুলিকে তথা তার ভেতরের মস্তিষ্ককে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে,

তেমনি মস্তিষ্ককে তাপমাত্রার আকস্মিক পরিবর্তন থেকেও রক্ষা করে, কারণ চুলের ভেতর দিয়ে তাপ ভালভাবে পরিবাহিত হতে পারে না। জন্তুজানোয়ারদের গায়ের বড় বড় লোমও একই কাজ করে। মানুষ নিজেদের শরীরকে পোযাক দিয়ে আচ্ছাদিত করতে শুরু করেছে, তাই পশুপাখির তুলনায় মানুষের শরীরে চুলের প্রয়োজন ও বাহুল্য কমে এসেছে।

আমাদের হাত-পায়ের নখের মত চুলও আসলে চামড়ার একটি পরিবর্তিত অবস্থা। চামড়ার মধ্যে থাকে hair follicle, যার ভেতর থাকে hair bulb ; চামড়ার এক ধরনের পরিবর্তনের ফলে এখান থেকেই আস্তে আস্তে চুল বেরোয় ও বড় হতে থাকে। চুল বৃদ্ধি পাওয়ার হার মোটামুটি দিনে ০'২-০'৩ মি. মি.। আর একটি চুলের আয়ুষ্কাল হয় ৪ মাস (ভুরুর বা বগলের চুল) থেকে ৪ বছর (মাথার চুল)। বংশগত কারণ (hereditary factor) ছাড়াও কয়েকটি হরমোন চুলের বৃদ্ধি ও সৌন্দর্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। পুরুষদের বিশেষ হরমোনের প্রভাবে তাদের শরীরে চুলের আধিক্য ঘটে।

যাই হোক চুলের বৃদ্ধির ব্যাপারটি একটি জৈব প্রক্রিয়া। Hair follicle-এ রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেলে চুলের বৃদ্ধি ঘটবে না, চুল পড়েও যাবে। তাই রথের মেলায় চুল বড় হবে এ ধারণাটি নিছকই একটি মিথ্যে বিশ্বাস।

চুলকে নিয়ে আরো নানা ধরনের সংস্কার চালু আছে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে। অনেকের ধারণা মৃত্যুর পরেও নাকি চুল গজাতে পারে। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ চুল মৃত হলেও hair follicle-এ রক্ত সঞ্চালন ও স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলে চুলের সৃষ্টি ঘটে না যা মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হওয়া সম্ভব নয়। তবে মারা যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে চামড়া কুঁচকে গেলে তার বাইরের চুল সামান্য বড় মনে হতে পারে। চুলের মধ্যে অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় শক্তি থাকতে পারে বলেও ধারণা করা হয়। চুল ছিঁড়ে অভিশাপ দেওয়া, দৈত্য সৃষ্টি করার উদাহরণ পুরাণ-ভাগবতে পাওয়া

যায়। সতীর দেহত্যাগের পর শিব নাকি নিজের জটা ছিঁড়ে বীরভদ্রের সৃষ্টি করেছিলেন যে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করেছিল। আধুনিক কোন কোন 'বাবার' দাবি তার ঝাঁকড়া চুলের মধ্যেই নাকি তার আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত আছে। ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণ ই মিথ্যা। চামড়ার ওপরে বেরিয়ে থাকা চুলের অংশটি সম্পূর্ণ মৃত। একে পোড়ালে দহনের ফলে কিছু শক্তি উৎপন্ন হতে পারে—অন্যথায় এর মধ্যে কোন শক্তি থাকার বা এর থেকে শক্তি বেরুনর কোন আশা নেই।

মাকুন্দ

পূর্ণবয়স্ক পুরুষের যদি দাড়ি-গোঁফ না জন্মায় তবে তাকে মাকুন্দ বলে। এ ধরনের ব্যক্তিকে অশুভ বলে ধারণা করা হয়। যাত্রাপথে মাকুন্দ-দর্শন নাকি শুভ নয়। খনার বচনে বলা হয়েছে "যদি দেখ মাকুন্দ চোপা। এক পা না যেও বাপা।" পুরুষের দাড়িগোঁফ বেরুনর পেছনে কিছু কিছু হরমোনের প্রভাব কাজ করে। আর এই হরমোনের নিঃসরণ ও তার ক্রিয়া ঐ ব্যক্তির শরীরের মধ্যেই ঘটে। স্বাভাবিকভাবে তাকে দেখলে ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ শুভ বা অশুভ কোন কিছু হওয়ারই সম্ভাবনা নেই। দাড়িগোঁফহীন বা স্বল্প দাড়িগোঁফ যুক্ত অধিকাংশ পুরুষেরই যৌনজীবন স্বাভাবিক থাকে। ঐ ব্যক্তিও বিয়ের পর সন্তানাদির জন্ম দেবেন। যদি মাকুন্দ দর্শন সত্যিই অশুভ হয় তবে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে তো তাহলে সবসময়েই পৃথক করে রাখতে হবে অথবা তাদের জীবন বিড়ম্বিত হবে। তা হয় না তার একটিই কারণ ঐভাবে কাউকে দেখলেই ভবিষ্যতের কোন ঘটনা (যেমন যাত্রাপথে) প্রভাবিত হতে পারে না। যদি কিছু ঘটে তবে তা নিজের মনের সংস্কার ও দুর্বলতার ফলে সৃষ্টি হওয়া খুঁতখুঁতানি ও অন্যমনস্কতার জন্যই ঘটবে। অনেকে মনে করেন যাদের শরীরে চুলের আধিক্য থাকে তাদের পৌরুষ তথা শারীরিক শক্তি বেশী। এটিও ভুল ধারণা। যেমন

গোর্খা সৈন্যদের দাড়ি গোঁফ প্রায় থাকেই না অথচ বীর হিসেবে তাঁরা বিশ্ববিখ্যাত। চীনা, জাপানী, নেপালী লোকেদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। মহাভারতের মহাবীর ভীমকেও বর্ণনা করা হয়েছে মাকুন্দ হিসেবেই। অবশ্য, কারো যদি স্বাভাবিক চুলও পড়ে যেতে থাকে তবে তার পেছনে কোনো রোগ নিশ্চয়ই আছে।

হাতে-পায়ের চুলকানি

হাতের তালু যদি হঠাৎ চুলকোতে থাকে তবে বিশ্বাস করা হয় অর্থোপার্জন হবে। পায়ের পাতা চুলকোনোর অর্থ নাকি আসন্ন ভ্রমণ যোগ। যেহেতু হাত দিয়ে অর্থ গ্রহণ করা হয় আর পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করা হয়—তাই এধরনের ধারনা। এ ধরনের বিশ্বাসকে সদৃশ ঘটনা (homeopathic occurrence) জাত বলা যায়। যেহেতু পা চুলকোচ্ছে অতএব পায়ের আসন্ন কাজ হবে—এই ধরনের ধারণা করা হচ্ছে। আসলে কোন জায়গায় চুলকুনি হয় সংশ্লিষ্ট জায়গার চামড়ার নীচের স্নায়ুর প্রান্তগুলি (nerve endings) কোন কারণে উত্তেজিত হলে। এ্যালার্জি হলে, জীবাণু আক্রমণ বা কোন রাসায়নিক দ্রব্যের কারণে এটি ঘটতে পারে। এ্যালার্জিতে হিস্টামিন নামে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরিত হয়ে স্থানীয় রক্তবহানালীর প্রসারণ ঘটে ও চুলকুনি হয়। বিছুটি বা শুঁয়োপোকার শুঁয়া ইত্যাদি লাগলেও একই ব্যাপার ঘটে। তাই হাত ও পায়ের চেটো বেশি চুলকোলে কি কারণে এটি ঘটছে সেটিই ঠিক করা দরকার। অর্থাগম বা ভ্রমণ যোগের আনন্দে সময় নষ্ট করলে আসল রোগটিই চাপা পড়ে যাবে।

স্বপ্নতত্ত্ব

সেই আদিমকাল থেকেই স্বপ্ন মানুষের মনে বিস্ময় ও ভীতি জাগিয়ে এসেছে। স্বপ্নের পেছনকার কারণগুলো এখন কিছু কিছু জানা গেলেও অনেককিছুই অজানা। আর আগে তো কিছুই

জানা ছিল না। তাই স্বপ্নের নানা মনগড়া ব্যাখ্যা করা ও স্বপ্ন থেকে অতীত বা ভবিষ্যতের কিছু অনুমান করার চেষ্টা মানুষ করেছে এবং সংস্কারের জগতে স্বপ্নদর্শন একটি বিরাট অংশ অধিকার করে আছে।

বাংলা পঞ্জিকায় স্বপ্নতত্ত্ব বর্ণনা করা হয়। বলা হয়েছে এটি "নেপোলিয়নের গ্রন্থ (The Imperial Royal Fortune Teller) হইতে গৃহীত।" এটি এই রকম—"১। শুক্লাপ্রতিপদের স্বপ্ন দ্রষ্টার সুখের কারণ। ২। দ্বিতীয়ার স্বপ্ন নিস্ফল। ৩। তৃতীয়ার স্বপ্ন সফল। ৪। চতুর্থীর স্বপ্ন নিস্ফল। ৫। পঞ্চমীর স্বপ্ন কিয়দংশে সফল। ৬। ষষ্ঠীর স্বপ্ন সহসা সফল হওয়া অসম্ভব। ৭। সপ্তমীর স্বপ্ন গোপন রাখিলে সিদ্ধ হয়। ৮। অষ্টমীর ও নবমীর স্বপ্ন সিদ্ধ হয়। ৯। দশমীর ও একাদশীর স্বপ্ন অসিদ্ধ। ১০। দ্বাদশীর স্বপ্ন কদাচিৎ সফল হয়। ১১। ত্রয়োদশীর স্বপ্ন সিদ্ধ হয়। ১২। চতুর্দশী ও পূর্ণিমার স্বপ্ন বিলম্বে সিদ্ধ হয়। ১৩। কৃষ্ণা পঞ্চমীর স্বপ্ন বিলম্বে সিদ্ধ হয়। ১৪। কৃষ্ণা একাদশীর স্বপ্ন অবশ্য সিদ্ধ হয়। ১৫। কৃষ্ণা ষষ্ঠীর ও দ্বাদশীর স্বপ্ন মিথ্যা হয়। ১৬। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর স্বপ্নে মন্দ ফল হয়। ১৭। কৃষ্ণা চতুর্দশীর স্বপ্ন শুভ হয়।" বাংলাদেশে মুসলিমদের মধ্যে 'ইউসুফী খাবনামা' নামে একটি পুস্তিকা বিক্রি হয় যাতে স্বপ্নের আরো বহু ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে।

এ ধরনের বিশ্বাসও আছে যে স্বপ্নে যা দেখা যাবে ফল হবে তার বিপরীত। যেমন কেউ যদি কাঁদে, তবে বুঝতে সুখের দিন আসছে। স্বপ্নে মৃতদেহদেখা শুভ লক্ষণ। স্বপ্নে প্রিয়জন কাউকে অসুস্থ বা মৃত দেখলে তার ভাল হবে, তার দীর্ঘজীবন লাভ হবে, —এধরনের ধারণা করা হয়। আবার স্বপ্নে গরুর গাড়ীর চড়ে গেলে নাকি অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। ডান হাতে সাপ কামড়ানোর অর্থও নাকি তাই। আবার এমনও বিশ্বাস আছে স্বপ্নে দেখা বিষয় অনুযায়ী ফল হয়। যেমন মন্দির বা দেবদেবী দেখলে শুভ, আগুন

দেখলে অশুভ, মহিষ দেখলে কারোর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে, কারণ মহিষ মৃত্যুর দেবতা যমরাজার বাহন। ভাঙ্গা বাড়িঘর দেখলে বা শরীরে তেল মালিশ করার স্বপ্ন দেখলে পরিবারের কেউ অসুস্থ হতে পারে। দাঁত পড়ার স্বপ্ন আসন্ন বিবাদ-বিসংবাদের ইঙ্গিত বহন করে। হাতি বিশেষ করে সাদা হাতীর স্বপ্ন কোন মহাপুরুষের জন্মের ইঙ্গিত বহন করে, যেমন বুদ্ধদেবের জন্মের আগে তাঁর মা নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি সাদা হাতী তাঁর শরীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার সাপ দেখলে নাকি বংশবৃদ্ধি হয়।

স্বপ্নকে নিয়ে এমনি ধারা হাজারো সংস্কার পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মনে ছড়িয়ে আছে। স্বপ্ন আসলে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রেরই বিশেষ ক্রিয়ার ফল। এর সঙ্গে তিথিরও যেমন যোগ নেই, তেমনি যোগ নেই কোন মহাপুরুষের আগমন, কারোর মৃত্যু বা বংশবৃদ্ধি ইত্যাদিরও।

ঘুম-এর একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় মানুষ স্বপ্ন দেখে। ঘুম (sleep)-কে সংজ্ঞা (consciousness)-এর সাময়িক, স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় ছেদ হিসেবে বলা যায়। সাধারণতঃ রাত্রিতে কম কাজ করা হয় বলে এই সময়েই মানুষ নিদ্রা যায় ও স্বপ্ন দেখে ; কিন্তু যাঁদের রাত্রিতে কাজ থাকে যেমন কারখানার শ্রমিক, ট্রেনচালক ইত্যাদি, তাঁরা দিনে নিদ্রা যাওয়াটাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নেন এবং দিনের বেলায় স্বপ্নও দেখেন। আবার দুপুরে খেয়ে দেয়ে কাজ না থাকলেও অনেকে বেশ একটু ঘুমিয়ে নেন এবং স্বপ্ন দেখেন। দিনের স্বপ্ন আর রাত্রির স্বপ্নের মধ্যে আলাদা কোন ব্যাপার নেই, তাই দিবাস্বপ্নের ভিন্নতর কোন তাৎপর্য নেই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় ঘুমের সময় কমে যায়। যেমন নবজাত শিশুর ১৮-২০ ঘন্টা ঘুম যেমন স্বাভাবিক, পূর্ণবয়স্ক একজন ব্যক্তির ৬-৭ ঘণ্টার ঘুমও তেমনি যথেষ্ট। আবার অভ্যেস করে এই সময়টাকে আরো কমান যায়। এই ঘুমের কতকগুলি পর্যায় থাকে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রথম ঘন্টার পরে গভীর ঘুম হয়।

[এই অবস্থাকেই অনেকে ভাত ঘুম বলেন এবং গ্রামের দিকে চোরেরা এর সুযোগ নিয়ে চুরি করে। গ্রামের দিকে এ ধরনের একটা ধারণা চালু আছে যে চুরির সময় চোরেরা এমন কিছু মন্ত্র পড়ে দেয় যাতে গৃহস্থ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং এই সুযোগে চোর চুরি করে নেয়। ব্যাপারটি আসলে তা নয়। দূর থেকে কারোর অজ্ঞাতে, মন্ত্র পড়ে তাকে ঘুম পাড়ান সম্ভব নয়। অবশ্য কাউকে শুনিয়ে একটানা মন্ত্র বা কথাবার্তা বলে ঘুম পাড়ান যায়। এটি প্রায় সম্মোহন (hypnosis) করারই মত। প্রতিদিনই 'ভাত ঘুম' হয় খুব গভীর কিন্তু চুরি হয়ে যাওয়ার পর নিজেদের দোষস্খালনের অবচেতন প্রচেষ্টায় চোরের মন্ত্র পড়াকে দায়ী করা হয়।] অন্যদিকে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গভীর ঘুমের সময় হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় ঘণ্টা এবং সপ্তম ও অষ্টম ঘণ্টার সময়। এই গভীর ঘুমের সময় কেউ স্বপ্ন দেখে না। এ সময় আমাদের চোখ প্রায় স্থির থাকে (Non rapid eye movement বা NREM)।

বাকী সময়ের ঘুম হাল্কা এবং এই হাল্কা ঘুমের সময়েই আমরা স্বপ্ন দেখি। এই সময় চোখ দ্রুত ঘুরপাক খায় বা নড়ে (rapid eye movement বা REM)। এ সময় দাঁত কড়মড় করা (bruxism), পুরুষের লিঙ্গ শক্ত হওয়া ইত্যাদি হতে পারে। ঘুমের সময় মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে মৃদু বৈদ্যুতিক পরিবর্তন হয় যা মস্তিষ্কের তড়িৎ পরীক্ষায় (electro encephalogram বা EEG) জানা যায়। এছাড়া কিছু রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে যেমন স্বাভাবিক ঘুমের সময় মস্তিষ্কের midbrain, hypothalamus ও aqueduct-এর চারপাশে সেরোটোনিন নামক পদার্থর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া অ্যাসিটাইলকলিন, ল্যাকটিক অ্যাসিড ইত্যাদি নানা পদার্থের ভূমিকা আছে বলেও মনে করা হয়। স্নায়ুতন্ত্রের রেটিকুলার ফর্মেশান নামক অংশেরও এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা থাকে।

হাল্কা ঘুমের পর্যায়ে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের স্নায়ুকোষের

(neurone) মধ্যে জটিল জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া চলে। আর মানুষের মস্তিষ্ক একটি জটিল কমপিউটারের মত, যার মধ্যে অসংখ্য তথ্য ও স্মৃতি জমা করা থাকে। জৈব রাসায়নিক ও তড়িৎ ক্রিয়ার ফলে এই সব তথ্য বিভিন্ন সময়ে বিশ্লেষিত হয়, যার ফলেই চিন্তা করা যায়, পুরনো স্মৃতিকে মনে করা যায়, পরীক্ষায় লেখা বা স্টেজে উঠে আবৃত্তি করা সম্ভব হয় ইত্যাদি এবং জাগা অবস্থায় ঐচ্ছিকভাবে কাজ করা যায়। হাল্কা ঘুমের সময় মস্তিষ্কের মধ্যে আপনা আপনি যে সব বিক্রিয়া চলে তার ফলেই নানা ঘটনা বা দৃশ্য দেখার, শব্দ শোনার অনুভূতি হয়। এটিই সাধারণভাবে স্বপ্ন দেখা।

স্বপ্নের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় এটি হল ঘুমের সময় মনের মধ্যে জাগা কল্পনা-প্রসূত ও কমবেশী সুসংবদ্ধ ধারণাবলী ও প্রতিবিম্বসমূহ। মস্তিষ্কের মধ্যেকার দর্শনকেন্দ্র, শ্রবণকেন্দ্র ইত্যাদির মধ্যে জটিল যোগাযোগের মাধ্যমে অনুভূত হয় যেন কিছু দেখা যাচ্ছে বা শোনা যাচ্ছে, যদিও এই দেখা বা শোনার জন্য যে স্নায়ুটি বাইরের উত্তেজনাগুলো মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে বয়ে নিয়ে যায় সেটি সরাসরি উত্তেজিত হচ্ছে না, আর এইভাবেই প্রতি ব্যক্তি প্রতিদিনই ঘুমের সময় প্রচুর স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু এদের অধিকাংশই আমরা ভুলে যাই। কোন কোনটি মনে থাকে। যেমন হয়তো কোন ভয়ের বা উত্তেজনার স্বপ্ন দেখে স্নায়বিক ক্রিয়ায় শরীরের নানা অংশ এমনভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে ঘুম ভেঙ্গে যায়, ফলে স্বপ্নটিকে তখন মনে করা সম্ভব হয়। ভোরে দেখা স্বপ্নের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বেশী ঘটে। ভোরের দিকে সাধারণ কোন স্বপ্ন দেখার পরও ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে কারণ তখন ঘুম এমনিতেই পাৎলা হয়ে আসছিল। ঘুমের মধ্যে দেখা অজস্র স্বপ্নের মধ্যে এই যে সামান্য সংখ্যক দু'চারটি স্বপ্ন আমাদের মনে থাকে সেগুলিই মনের মধ্যে আলোড়ন তোলে এবং আমরা ওগুলির ফলাফল নিয়ে বিচার করি। স্বাভাবিকভাবেই তাদের কোন্‌টি শুভ কোন্‌টি অশুভ, কোন্‌টি মিলে

গেল, কোনটি মিলল না—এ ধরনের চিন্তা করাটা হাস্যকর, কারণ ওগুলির বাইরে অজস্র স্বপ্নের কথা ধরাই হচ্ছে না, যেহেতু সেগুলি আমাদের মনে নেই। আবার যেহেতু স্বপ্ন হচ্ছে আমাদেরই চিন্তাভাবনার অন্য একটি রূপ তাই সেগুলির শুভাশুভের বা ভবিষ্যৎ নির্দেশেরও কোন প্রশ্ন আসে না। জাগা অবস্থায় করা চিন্তা-ভাবনার (যেমন কেউ হয়তো তন্ময়ভাবে ভাবছেন তিনি অফিসে গেছেন, উপরওয়ালার সাথে অনেক কথা হল, এইভাবে তিনি তার উত্তর দিলেন অথবা অমুক ছেলে বা মেয়ের সাথে আলাপ হল, সে ভালভাল কথা বল্ল, সে এইভাবে আদর করল ইত্যাদি) যেমন শুভাশুভ বা মেলা না-মেলা বিচার করতে বসাটা হাস্যকর, তেমনিই হাস্যকর স্বপ্নের শুভাশুভ নির্ণয়ের চেষ্টা। তবে সচেতন চিন্তাভাবনার সাথে স্বপ্নের অবশ্যই তফাৎ আছে। জাগা অবস্থায় বাইরের বহু উত্তেজনা মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করে, ফলে চিন্তাভাবনা বিক্ষিপ্ত হতে পারে। অবশ্য একাগ্রভাবে, নির্জন পাহাড়ে বা বনে, অন্ধকার নিরালা ঘরে বসে চিন্তাভাবনা করে এই বিক্ষিপ্ততা কিছুটা কমান যায়। আর গভীর ঘুমের সময় মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্র অনেকটাই অবদমিত থাকে—ফলে তাদের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখার কাজটি সংঘটিত হয় না। অপেক্ষাকৃত হাল্কা ঘুমের সময় এদের সামান্য কাজকর্ম হয়। বাইরের উত্তেজনাও তখন মস্তিষ্কে কম প্রভাব ফেলে। ফলে এ সময় স্বপ্ন দেখার ঘটনা ঘটে আর পুরনো অনেক স্মৃতিও স্বপ্নের মাধ্যমে জাগরিত হতে পারে। সম্মোহন (hypnosis)-এর সময়ও এই ধরনের ব্যাপার ঘটে।

আপাতভাবে হারিয়ে যাওয়া এই স্মৃতি হঠাৎ স্বপ্নে দেখলে রহস্যময় বা অলৌকিক কিছুর কথাই মনে আসে—কারণ অলৌকিকত্ব সম্পর্কে ধারণা আগে থেকেই মনের মধ্যে গেড়ে বসে আছে। অনেক আগে ছোটবেলায় কোথাও কোন মুল্যবান কিছু লুকিয়ে রাখার স্বপ্ন কেউ দেখতে পারে এবং ঐ অনুযায়ী তা খুঁজে পেতেও পারে। বহু আগে দেখা, ভুলে যাওয়া কোন ঠাকুর-দেবতার ছবিকে স্বপ্নে

দেখা যেতে পারে। এবং অস্তিত্বহীন ঠাকুর-দেবতার অস্তিত্ব সম্পর্কে মিথ্যে বদ্ধমূল ধারণাবশতঃ ভক্তিবিনম্র চিত্তে ঐ দেবতার পূজা করার বা তাকে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা জাগতে পারে, আর এর পরে কাকতালীয়ভাবে কিছু অর্থ লাভ বা চাকরির উন্নতি হলে তো কথাই নেই—স্বপ্ন আর দেবতার মাহাত্ম্যে বিশ্বাসটা দৃঢ়মূল হয়ে যায়, প্রচারের মাধ্যমে অন্যদের মধ্যেও তা সংক্রামিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে ঘুমের সময় যে অজস্র স্বপ্ন দেখা হয় তার অনেকগুলিই আমরা ভুলে যাই। আর ভোরের দিকে দেখা স্বপ্নের পরে সাধারণতঃ ঘুম এমনিতেই ভেঙ্গে যায়। ফলে এই সময়ে দেখা স্বপ্নের অধিকাংশই আমরা মনে রাখতে পারি। এদের দু'চারটি বাস্তব জীবনে মিলে যেতেই পারে কারণ স্বপ্ন হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনেরই একধরনের প্রতিচ্ছবি। আর এই ধরনের কিছু ঘটনা থেকেই এ ধারণা করা হয় যে, ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়। যেমন কেউ হয়তো কোন অতিথি বা প্রিয়জনের আসার অপেক্ষায় ছিলেন, এ নিয়ে চিন্তাভাবনাও করছিলেন। ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখলেন, ঐ আকাঙ্ক্ষিত মানুষ বাড়ীতে এসেছেন। পরের দিন বা হয়তো তারও পরের দিন সত্যিই তিনি এলেন এবং 'ভোরের স্বপ্ন সত্যি হল'। স্বপ্ন দেখার পর আবার ঘুমিয়ে পড়লে সাধারণতঃ তা পুরোপুরি বা আংশিক ভুলে যাওয়া যায়। স্বপ্নটিকে হুবহু মনে রাখার ইচ্ছেতেই তাই এ ধরনের কথাও বলা হয় যে, ভোরের স্বপ্ন দেখার পর ঘুমিয়ে পড়লে তা আর ফলে না।

কোন কিছু বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবলেও ঐ ব্যাপারটা স্বপ্নে দেখা দিতে পারে। যেমন পরীক্ষার আগে, পরীক্ষার হলে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকের আছে। অনেকে এতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও দেখতে পারে। মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করা সম্ভাব্য প্রশ্নগুলোর কিছু কিছু এর মধ্যে থাকতে পারে আর তার মধ্যে দু'একটি বাস্তবে পরীক্ষায় মিলে যেতেও পারে। তেমনি, কোন বিশেষ সমস্যা নিয়ে ভাবতে ভাবতে

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে ঐ সমস্যার বিশেষ কোন সমাধানও পাওয়া যেতে পারে। আসলে জাগ্রত অবস্থায় অন্যান্য উত্তেজনা মস্তিষ্কের কাজকে বিক্ষিপ্ত করে রাখে, ঘুমের মধ্যে এই বিক্ষিপ্ততা যখন অনেক কমে যায়, তখন স্নায়ুর মধ্যে জমে থাকা তথ্যাবলী বিশ্লেষিত হয়ে পথ দেখাতে পারে। বিখ্যাত গণিতবিদ রামানুজন নাকি এইভাবে কিছু সমাধান পেয়েছেন। বেঞ্জিন-এর গঠনপ্রণালীর আবিষ্কর্তা কেকুলেও নাকি স্বপ্নে দেখা একটি প্রতীক থেকেই বেঞ্জিনের গঠন প্রণালী বুঝতে পারেন। ব্যাপারগুলো অস্বাভাবিক কিছুই নয়, যদিও সব সময় ঘটে না। মুস্কিল হয় তখনি যখন সাধারণ মানুষ তো বটেই, এই ধরনের বিখ্যাত ব্যক্তি বা বিজ্ঞানীরাও ব্যাপারটিকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা অলৌকিক শক্তির প্রভাব বলে মনে করেন। অস্তিত্বহীন ঈশ্বর বা অলৌকিক শক্তির উপর সরল বিশ্বাসের প্রভাবেই ভ্রান্তভাবে এধরনের মন্তব্য করা হয়।

আর আকাশে চাঁদের দৃশ্যমান অংশ অনুযায়ী বিচার করা তিথির উপরও স্বপ্নের মেলা বা শুভ-অশুভ আদৌ নির্ভর করে না। কি স্বপ্ন দেখা হবে তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চিন্তাভাবনা ও বাস্তব জীবন এবং তাঁর নিজের স্নায়ুর ক্রিয়ার উপর—পৃথিবী থেকে ৩'৮ লক্ষ কিলোমিটার দূরবর্তী চন্দ্রের দৃশ্যমান অংশের উপর নয়।*

*তিথির পরিবর্তনে এমন কিছু ঘটেও না, যা আমাদের স্বপ্নকে প্রভাবিত করতে পারে। সবসময়েই আকাশে পুরো চাঁদটাই থাকে। আবার চাঁদের পুরো একপিঠে সবসময়ই সূর্যের আলো পড়ে—যা প্রতিফলিত হয়ে 'জ্যোৎস্না' নামে পৃথিবীতে আসে। পৃথিবীর চারদিকে ঘোরার বিভিন্ন অবস্থানে চাঁদের এই পিঠের কিছু কিছু অংশ পৃথিবীর দিকে ঘোরান থাকে, তাই বিভিন্ন রাতে তথা তিথিতে তার বিভিন্ন অংশ আমরা দেখি। আকাশে চাঁদের ভর স্থির থাকলেও, বিভিন্ন তিথিতে চাঁদ ও পৃথিবীর দূরত্বের অল্প কিছু তারতম্য ঘটায় পৃথিবীর উপর প্রযুক্ত চাঁদের মহাকর্ষজ বলের অতি সামান্য হেরফের ঘটে। কিন্তু এই পরিবর্তনও এতই নগন্য যে, তা আমাদের স্বপ্ন ইত্যাদিকে প্রভাবিত করতে পারে না, এর চেয়েও অনেক বেশী বল আমাদের উপর প্রয়োগ করে পাশে শুয়ে থাকা মানুষ বা কাছাকাছি গরু-বাছুর, আলমারি-বাক্স, পাহাড়-পাথর ইত্যাদি—মহাকর্ষের নিয়মেই।

যে কেউই এ নিয়ে নিজের উপর গবেষণা চালাতে পারেন এবং দেখতে পারেন তার বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিগ্রাহ্যতা।

যেমন আমি ১৩৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৬ই মে, ১৯৮৩ থেকে ১৫ই জুন, ১৯৮৩ পর্যন্ত) দেখা কয়েকটি স্বপ্ন এবং ঐদিনের তিথি লিখি। ৭ই জ্যৈষ্ঠ শুক্লা একাদশীতে স্বপ্ন দেখলাম, নিজের চেম্বারে বসে রোগী দেখছি এবং পরের দিন চেম্বারে সত্যিই রোগী দেখলাম। পঞ্জিকা মতে শুক্লা একাদশীর স্বপ্ন অসিদ্ধ হয়। আর সত্যি কথা বলতে কি, পেশায় চিকিৎসক হওয়ার জন্য রোগী বা চেম্বারের স্বপ্ন প্রায়ই দেখি। আবার ১১ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন দেখলাম, আমার বাবা যেন গ্রামের বাড়ীতে বসে আছেন ; আমি মেডিক্যাল কলেজের হস্টেল থেকে ছুটিতে বাড়ী গেছি, বাবার সাথে কথা বলছি ইত্যাদি। পঞ্জিকার মতে, চতুর্দশী ও পূর্ণিমার স্বপ্ন বিলম্বে সিদ্ধ হয়। কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় বাবা ১৯৮০ সালে মারা গেছেন। সুতরাং তাঁর সাথে দেখা হওয়ার আশু সম্ভাবনা তো নেই-ই, বিলম্বিত সম্ভাবনাও নেই। অবশ্য যাঁরা এই ধরনের কুসংস্কারকে ধ্রুবসত্য বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা বলতে পারেন, এর অর্থ আমি কয়েক দিন পরেই মারা যাব এবং পরলোকে বাবার সাথে দেখা হবে। (তবে এ বইটির তৃতীয় সংস্করণের সময় অর্থাৎ এই ১৯৮৮ সালের মাঝামাঝিতেও আমি বেঁচে আছি।) এমন হাস্যকরভাবে ভ্রান্ত ধারণাকে আঁকড়ে রাখার চেষ্টা হামেশাই করা হয়। বাস্তবতঃ, পরলোক বলে কিছুই নেই, এবং আমার চিরতরে হারিয়ে যাওয়া বাবার সাথে দেখা আমার কোনদিনই হবে না। আই আমি ঘটনাচক্রে শিগগিরই যদি মারাও যাই, তবে সেটিও স্বপ্নফল অনুযায়ী বিলম্বে বাবার সাথে দেখা হওয়ার ব্যাপারটাকে সত্যি করে তুলবে না। মৃত বাবার কথা মাঝেমাঝেই মনে পড়ে—তাই মাঝেমাঝেই তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি, সুতরাং তিথিফলের সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই। আবার পঞ্জিকার

তাকে ঘিরে নানা মনগড়া ব্যাখ্যা করে ফেলা যায়। অমুক দিনের স্বপ্ন শুভ কি অশুভ বলা হল কিন্তু শুভ-অশুভ ব্যাপারটা বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে অর্থবহন করে এবং ধারণাটাই ভ্রান্ত-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আদিমকালের মানুষের কাছে স্বপ্ন ছিল একটা বিস্ময়। অনেকে একে শয়তান বা বদ্‌-আত্মার কারসাজি ভেবে আতঙ্কিতও হত। বাস্তবে না-পাওয়া কোন সঙ্গি বা সঙ্গিনী, পূরণ না-হওয়া কোন মধুর ইচ্ছা অথবা দারিদ্রের মধ্যে এই না-পাওয়া, না-হওয়া ব্যাপার-গুলোকে ঘিরে চিন্তাভাবনা চলে। আর এ ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখলে তা সফল হবে কিনা তা নিয়ে অসহায় জল্পনাকল্পনা চলে। এইসব জল্পনা কল্পনার ফলশ্রুতিতেই স্বপ্নকে ঘিরে নানা ধরনের তত্ত্ব ও ধারণার সৃষ্টি। এর সাথে মিশে যায় কিছু প্রতীক। মহিষকে হিন্দুরা মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে দেখে, কারণ সে যমরাজার বাহন। কিন্তু যমরাজা ও মহিষের কথা একেবারেই অজানা কোন ব্যক্তির কাছে যেমন অনেক খ্রীষ্টান বা ইসলাম ধর্মাবলম্বীর কাছে এর কোন তাৎপর্য নেই। গরুর গাড়ী চেপে মাল নিয়ে যাওয়া হয় ব্যবসার জন্য বা বিয়ের দ্রব্য-সামগ্রী আনা হয়। তাই হয়তো, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে গরুর গাড়ী চড়ার স্বপ্ন অর্থপ্রাপ্তির ইঙ্গিত বহন করে।

স্বপ্ন মস্তিষ্কের ক্রিয়ারই ফল। তাই এর শুভাশুভ নির্ণয় করতে বসাটা বোকামি। এর পেছনে নিজের কোন্‌ চিন্তাভাবনা বা স্মৃতি কাজ করেছে সেটি বড় জোর ভেবে দেখা যায়।

স্বপ্নের ব্যাপারটা মনস্তাত্বিকদের গভীর আলোচনার বিষয়। বিখ্যাত মনস্তাত্বিক সিগমণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) সমগ্র স্বপ্ন বৃত্তান্তকে প্রতীক সংকেত হিসেবে গণ্য করেন। তাঁর মতে স্বপ্নের মধ্যে মানুষ তার অবদমিত ইচ্ছাকে প্রকাশ করে—এই অবদমন সাম্প্রতিক বা অতীতেরও হতে পারে। যেমন কোন মেয়ে যদি ঘোড়ার স্বপ্ন দেখে তবে সেটি তার অবদমিত যৌন আকাঙ্খার নির্দেশ দেয়। তবে "ফ্রয়েডের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ না করেও বলা চলে

যে, তাঁর প্রতীক অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যার ব্যাপার আর গুপ্ত সম্প্রদায়ের সংকেতলিপির সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান প্রায়ই একই পর্যায়ে পড়ে। প্রতীকার্থ ঠিক করার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণভাবে দূরকল্পনার উপর নির্ভরশীল।" (পাভলভ পরিচিতি, ৪র্থ খণ্ড ; ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৭৭) এবং সত্যি কথা বলতে কি ফ্রয়েডের তাত্ত্বিক দিকগুলির ভিত্তিই হচ্ছে এই ধরনের দূরকল্পনা ও ভাববাদী নানা ধারণা। তিনি মনের চালিকাশক্তি (Psychic energy) ও এর আবাসস্থল হিসেবে মনের নির্জ্ঞান প্রকোষ্ঠের কল্পনা করেছেন। অন্যদিকে পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে জন্মের পর থেকেই বিভিন্ন বাস্তব অনুভূতি স্নায়ুর মাধ্যমে চেতনা ও চিন্তাভাবনার জন্ম দেয়, এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য প্রতিবর্তী ক্রিয়া (reflex action) প্রধান ভূমিকা পালন করে। স্বপ্ন এই চেতনা ও চিন্তাভাবনারই ফসল, অর্থাৎ সেটি স্নায়ু ও বস্তু নির্ভর। কোন কোন সময় তা জিন-এর ক্রিয়ার উপরও নির্ভরশীল। কিন্তু কখনোই মানুষের শরীর ও পরিবেশের বাস্তব পরিমণ্ডলের বাইরে অবাস্তব অলৌকিক, কল্পনাশ্রয়ী কিছু এ ব্যাপারে দায়ী নয়। এ কারণেই এর শুভ-অশুভ ফল, মেলা বা না মেলা—ইত্যাদি বিচার করতে বসাটা হাস্যকর।*

ভয়ে বুক কাঁপে-পিলে চমকায়-চুল হয় খাড়া

এ ধরনের কথাবার্তা হামেশাই শোনা যায়। আমরা ভয় পেলে বা উত্তেজিত হলে আমাদের শরীরের ভেতর অ্যাড্রেনালিন

* দুঃস্বপ্ন—ঘুমের স্তরভাগ করতে গিয়ে পাভলভ আপাতবিরোধি (paradoxical) স্তরের কথা বলেছেন, যখন সামান্য কোন উত্তেজনা মস্তিষ্কে অতিরিক্ত উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই স্তরে বুকের উপর থাকা হাতের বা গায়ে পড়ে থাকা মশারির দড়ির সামান্য চাপ, গায়ে পড়া রোদের তাপ বা কুঁকড়ে শুয়ে থাকার উত্তেজনা ইত্যাদি উত্তেজক স্বপ্নের অনুভূতি জাগাতে পারে, যেমন হয়তো যথাক্রমে পাথরে চাপা পড়ার, অজগর সাপ জড়িয়ে ধরার, আগুনে পুড়ে আসন্ন মৃত্যুরকিংবা দুই ট্রেনের মাঝে পিষ্ট হওয়ার স্বপ্ন। এগুলিই তথাকথিত দুঃস্বপ্ন।

(adrenaline) নামে একটি পদার্থের ক্ষরণ হয়। এটি ঘটে ভয় বা উত্তেজনার (পরিশ্রমেও) সময়, শরীরে অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজনীয়তা ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কারণে, শরীরকে রক্ষা করার প্রয়োজনেই। কিড্‌নীর ওপরে থাকা এ্যাড্রেনাল গ্ল্যাণ্ডের মেডালা অংশ থেকে এই অ্যাড্রেনালিন বেরোয়। এই পদার্থটির ফলেই এই ধরনের ঘটনাগুলি সত্যিই ঘটে। তবে বুক কাঁপার ব্যাপারটি আসলে হৃদপিণ্ডের অতিরিক্ত ধুকপুকানি। অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে হৃদপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণের হার বা গতি, উত্তেজনা ও মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। জীবন্ত শরীরে হৃদ্‌পিণ্ডটি সর্বদাই সংকুচিত-প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এটি আমরা বুঝতে পারি না। ভয় পেয়ে অ্যাড্রেনালিন বেরিয়ে হৃদ্‌পিণ্ডের গতি ও সংকোচন-প্রসারণের মাত্রা অনেক বেড়ে যাওয়ার ফলে আমরা তখন হৃদ্‌পিণ্ডের এই অতিরিক্ত কাজটি অনুভব করতে পারি। এটিকে বলা হয় **palpitation.** বুকের ভেতর হৃদ্‌পিণ্ডের এই সচেতন লাফালাফির ফলেই বুকটা যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। একেই 'বুক কাঁপা', 'বুক ধড়ফড় করা' ইত্যাদি বলে বর্ণনা করা হয়।

অ্যাড্রেনালিন আবার পিলে তথা প্লীহার (spleen-এর) চারপাশের আবরণী (capsule)-এর অনৈচ্ছিক মাংসপেশীর সংকোচন (spasm)-ও ঘটায়। ফলে হঠাৎ পেটের উপরের বাঁদিকে থাকা প্লীহাটি চমকে উঠল এধরনের বোধ হতে পারে। অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে বুক ধড়ফড় করার মত প্লীহা তথা পিলের এই চমকানি অবশ্যি খুব বেশী হয় না—সবার ক্ষেত্রেও হয় না। তবে কারো কারোর ক্ষেত্রে হতেই পারে। তাই ব্যাপারটিও একেবারে ভিত্তিহীন হয়।

চামড়ার মধ্যে থাকে এ্যারেকটোরেস পাইলোরাম (arrectores pilorum or pili) নামে একটি মাংসপেশীর পাৎলা স্তর। এটি চামড়ার মধ্যে থাকা চুলের গোড়া (hair follicle)-র সাথে যুক্ত থাকে। অ্যাড্রেনালিন এই মাংসপেশীকেও সংকুচিত করে ; এর ফলে

চুলের গোড়ার ঠিক চারপাশের অংশটি উঁচু হয়ে ওঠে ও তার বাইরের অংশটি একটু নীচু হয়ে যায়। এর ফলে চুলটি সোজা, খাড়া হয়ে ওঠে এবং চামড়া কাঁটাকাঁটা হয়ে যায়। এটিই ভয়ে চুল খাড়া হওয়ার ও গায়ে কাঁটা দেওয়ার ব্যাপার। এইভাবে উত্তেজিত হলে পাখীর পালক খাড়া হয়ে ওঠে, ময়ূর পেখম মেলে, সজারুর গায়ের কাঁটাগুলো সোজা হয়ে ওঠে ইত্যাদি।

অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে, ঘর্মগ্রন্থি (sweat gland)-রও উত্তেজনা ঘটে এবং ঘাম বেরোয়। তাই ভয় পেয়ে কুল কুল করে ঘেমে যাওয়ার ব্যাপারও ঘটে।

কু-দৃষ্টি

কারো কারোর দৃষ্টি নাকি খারাপ বা অশুভ। এর ফলে বাচ্চার শরীর নাকি শুকিয়ে যেতে পারে, কারোর শরীর খারাপ হতে পারে। কেউ খাচ্ছে—তার খাওয়ার দিকে লোভার্ত দৃষ্টিতে কেউ হয়তো তাকিয়ে আছে। তাহলে এর ফলে নজর লেগে খাবার নাকি বমি হয়ে যেতে পারে বা পেট খারাপ করতে পারে। শনির দৃষ্টি হিসাবে এগুলোকে অনেকে অভিহিত করে। কাল্পনিক শনিঠাকুরের দৃষ্টি নাকি খুব ক্ষতিকর। যার ফলে শিশু গণেশকে আশীর্বাদ করতে এসে তার চোখে চোখ ফেলায় গণেশের মাথা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পাশে একটি হাতীর মাথা পড়ে ছিল। ঐটি বসিয়ে যা হোক করে গণেশকে আস্ত রাখা গেল। শুধু হিন্দু পুরাণে নয়, গ্রীক পুরাণেও আছে রাক্ষসী মেডুসার কথা,—এ যার দিকে তাকাত সে ভস্ম হয়ে যেত। চোখের দৃষ্টি দিয়ে এইভাবে ভস্ম করে দেওয়ার (ভস্ম-লোচন!) ব্যাপারটা অনেক প্রাচীন কল্পকাহিনীর বিষয়বস্তু। এখন ঠিক এইসব ভস্মলোচনের কথা ততটা বলা না হলেও কু-দৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্বাস, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ও অশিক্ষিত-অসচেতনদের মধ্যে বেশ ভালভাবেই রয়েছে যা এই ধরনের সমস্ত মিথ্যে সংস্কার বা কুসংস্কারের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

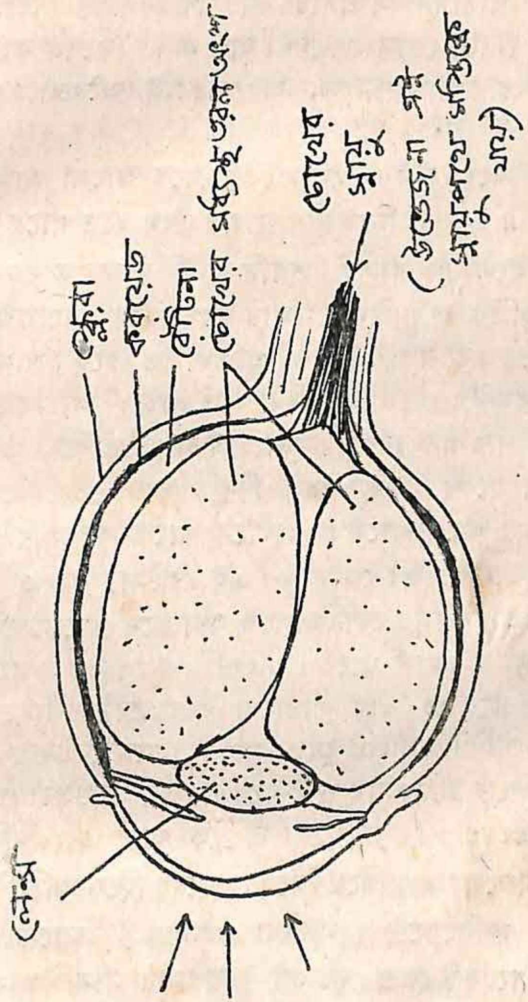
'বুরা নজরবালে তেরি মুহ্ কালা'—গাড়ীর পেছনে অনেকেই এসব লিখে দেয়। কু-দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিকে এইভাবে গালাগালি দিয়ে ভাগান হচ্ছে যাতে গাড়ীর যাত্রাপথ শুভ বা বিপদমুক্ত হতে পারে। বাচ্চাদের কপালের একপাশে কাজলের কালো টিপ দেওয়া, ঘুনসিতে লোহার কালো টুকরো বা শেকড়-বাকড় মাদুলি ঝোলান ইত্যাদির উদ্দেশ্যও এই একই—বদ্দৃষ্টি থেকে শিশুকে রক্ষা করা। নৌকা বা জাহাজের গায়ে চোখ এঁকে দেওয়া, গাড়ীর পেছনে ছেঁড়া জুতো ঝুলিয়ে রাখা ইত্যাদিও করা হয়। গ্রামের দিকে কোন শনিবার বা মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা শুকনো লঙ্কা, একমুঠো সর্ষে ও নুন কোন ব্যক্তি বা গৃহপালিত পশু (যেমন দুগ্ধবতী গাই)-র গায়ে বুলিয়ে দিয়ে একে রক্ষা করা হয় বদ নজর থেকে। তুর্কী ও আরবরা তাদের উট, ঘোড়া ইত্যাদির গলায় মন্ত্রপড়া কোন বস্তু ঝুলিয়ে রাখে বা আয়ারল্যাণ্ডে কৃষকরা একটি বিশেষ গাছের পাতা পুড়িয়ে তার ছাই ঘোড়া বা গরুর ল্যাজে বেঁধে রাখে একই কারণে। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় এরকম বিশ্বাস আছে যে, নতুন শাড়ি কিনে তার আঁচল থেকে একটু সূতো খুলে নিলে আর কারোর নজর লাগবে না। আবার সন্তানের উপর মায়ের দৃষ্টি থাকে সবচেয়ে বেশী, তাই তার বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় যখন সে আরেকজনের সাথে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে যাচ্ছে, তখন মাকে ঐ বিয়ের অনুষ্ঠান নাকি দেখতে নেই, পাছে ঈর্ষাকাতরা মায়ের নজর লেগে যায়। কোন কোন মা আবার সন্তানের বিদায়কালে পায়ের কড়ে আঙ্গুলের ধুলোনিয়ে তাতে একটু থুথু দিয়ে সন্তানের কপালে দিয়ে দেন ; বাইরের কারোর বদ্ নজর থেকে সন্তানকে রক্ষা করার এই হল ওষুধ। স্পষ্টতঃই ব্যাপারটি প্রতীকী। যেন মায়ের পায়ের ধূলোর সাথে মা-ও চলেছেন ছেলের সাথে, কেউ নজর দিতে এলে তাকে লাথি মেরে ধূলোর মতো সরিয়ে দেবেন।

এইভাবে পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকেই অশুভ ও ক্ষতিকর কু-দৃষ্টির ধারণা করে এসেছে। বিশেষ কোন

মানুষ ছাড়াও কাল্পনিক ভূত-প্রেত, দেবদেবীরও কু-দৃষ্টি পড়ার ভয় করা হয়। শনিঠাকুর বা মেডুসার মতো বাংলাদেশে যেমন প্রচলিত আছে মাষাণ দেবতার ধারণা—যার কোপদৃষ্টিতে বাড়ীর অনেকে পরপর অসুস্থ হয়ে পড়ে বা মারা যায় এবং এটি কাটানর জন্য ফকির স্থানীয় ওঝা বা গুণিন বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান করে। কাল্পনিক ভূত-প্রেত বা দেবদেবীকে কু-দৃষ্টি সম্পন্ন হিসেবে ভেবে নিজের বিপদ ও ঝামেলাটাই শুধু বাড়ান হয়। যেমন পেত্নির নজর লেগে বাচ্চা শুকিয়ে গেছে ভেবে তার জন্য মন্ত্রপড়া বা শান্তিস্বস্ত্যয়ন করে গেলে বাচ্চা রোগা হয়ে যাওয়ার আসল কারণ আর নির্ধারিত হয় না এবং বাচ্চাটি হয়তো মারাই যায়। বাচ্চাটি হয়তো ভুগছে কৃমি, হুকওয়ার্ম বা অপুষ্টিতে—যার চিকিৎসা করালে বাচ্চাটি সুস্থ হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে, যখন বিশেষ কোন মানুষকে এইভাবে কু-দৃষ্টি সম্পন্ন ভেবে তাকে দোষারোপ করা হয়। সাধারণতঃ গরীব ও শরীরের দিক থেকে অসুন্দর দেখতে কাউকে এধরনের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। ক্ষুধার্ত এক ভিখিরি হয়তো গৃহস্থ শিশুর খাওয়ার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—'নজর দিচ্ছে' অপবাদ দিয়ে তাকে মারধোর করার ঘটনা ঘটে এবং শিশুটিও এসবে ভয় পেয়ে বা অন্য কোন কারণে ভয় পেয়ে খাবার বমি করতে পারে বা পায়খানা করতে পারে, যাকে ঐ ভিখিরির নজর দেওয়া হিসেবেই বলা হয়। একই ভাবে বিশেষ কাউকে ডাইনী সন্দেহ করা হয়—যেন সে তার দৃষ্টি দিয়ে কোন শিশুর রক্ত শুষে নিচ্ছে, অসুস্থ করে ফেলছে। তারাশংকরের 'ডাইনী' গল্পে এর ভয়ংকর সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। কিভাবে এক নির্দোষ নিষ্পাপ কিশোরী ধীরে ধীরে ডাইনী অপবাদে ভূষিত হল তার করুণ বর্ণনা রয়েছে এবং শেষ অব্দি সে নিজেও বিশ্বাস করতে লাগল তার দৃষ্টিতে কেউ মারা যেতে পারে বা অসুস্থ হতে পারে। আমাদের দেশে বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে এ ধরনের ডাইনী হত্যার খবর প্রায়ই খবরের

কাগজে প্রকাশিত হয়। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, সামাজিক অসহায়তাই এগুলির মূলে প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে। সব ধরনের কুসংস্কারের মত কুদৃষ্টি বা নজর লাগার ধারণারও রয়েছে সামাজিক ভিত্তি এবং এগুলি এইভাবে সামাজিক ক্ষত সৃষ্টি করছে।



এইভাবেই আমরা দেখি। যাকে দেখা হচ্ছে, তার থেকেই আলোক শক্তি আসছে। যে দেখছে, তার চোখ থেকে কোন শক্তি বেরোয় না, যার সাহায্যে যাকে দেখা হচ্ছে, তার কোন ক্ষতি করা যাবে।

প্রকৃতপক্ষে তাপশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদির অনুরূপ 'দৃষ্টিশক্তি'র মত কোন শক্তি আদৌ নেই। তাপশক্তি ইত্যাদিকে চোখে না

দেখা গেলেও তাকে যেমন বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা যায় তেমনি তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নানাভাবে। কিন্তু মানসিক শক্তির মত দৃষ্টিশক্তিও অস্তিত্বহীন। তাপশক্তি সব সময়েই তার নির্দিষ্ট গুণাবলী প্রকাশ করবে, যেমন সবসময়ই তা—কম হোক বেশী হোক—জল বা পারদের সম্প্রসারণ ঘটাবে। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের নির্দিষ্ট কোন গুণ দেখা যায় না। বিশেষ কারোর ক্ষেত্রে এর অস্তিত্বের কথা বলা হয়, যা স্পষ্টতঃই অবৈজ্ঞানিক ও মনগড়া।

আমরা চোখ দিয়ে দেখি। কোন কিছু থেকে আলো আমাদের চোখে পড়ে। ঐ বস্তুটি নিজেই আলোর উৎস হতে পারে যেমন সূর্য, নক্ষত্র বা ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব ইত্যাদি। কিন্তু অন্যান্য সব বস্তুর ক্ষেত্রেই এই প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম আলোর উৎস থেকে আলোকশক্তি ঐ বস্তুর উপর পড়ে এবং বস্তুটি থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে। তখন বস্তুটিকে আমরা দেখতে পাই। আলোকশক্তি চোখের সামনের পাৎলা আবরণী কন্‌জাংটাইভা ও কর্ণিয়া, তারপর লেন্‌স্ ও চক্ষুগোলকের মধ্যস্থ তরল কিছু পদার্থ ভেদ করে চক্ষু গোলকের পেছনের অংশে আসে। এখানে থাকে আলোর প্রতি সংবেদনশীল স্নায়ুজর্জরিত স্তর রেটিনা। এই রেটিনার রড ও কোন্ (rods & cones) নামক কোষগুলিতে যথাক্রমে রোডোপসিন ও আয়নোপসিন নামক পদার্থ থাকে। এগুলি আপতিত আলোকশক্তিকে শোষণ করে ও তার সাহায্যে পর্যায়ক্রমিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার (photochemical process) মাধ্যমে রেটিনার সাথে যুক্ত স্নায়ুতন্তুগুলিতে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই উত্তেজনা চোখের স্নায়ু (optic nerve)-এর মাধ্যমে মস্তিষ্কে যায় এবং মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়ে পেছনের দিকে অক্সিপিট্যাল অংশে অবস্থিত দর্শনকেন্দ্রে (vision centre) আসে। এর পাশেই থাকে আরেকটি কেন্দ্র যেটি এই উত্তেজনার মানসিক ব্যাখ্যা করে ও তাকে অর্থবহ করে তোলে (visuopsychic centre)। আর তখন আমরা, যে জিনিষটি থেকে আলো এসে চোখে পড়েছে সেটিকে, জন্মের পর থেকে লাভ করা অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ স্নায়বিক সংকেত অনুযায়ী, বিভিন্ন নামে চিনতে পারি। আলোকরশ্মি

তরঙ্গের আকারে সঞ্চরণ করে। বিভিন্ন মাত্রার ও রঙের আলোক-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। আমাদের চোখ ৩৯০-৭৫০ মিলি মাইক্রন—এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যবর্তী সমস্ত আলোকরশ্মিকে দেখতে পায়, তাই এর কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলট্রাভায়লেট রশ্মি ও বেশী তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ইনফ্রা-রেডরশ্মি আমরা দেখতে পাই না।

সংক্ষেপে এই হল আমাদের দৃষ্টি-রহস্য। এখানে বাইরে থেকে আলোকশক্তি তরঙ্গের আকারে চোখে ঢেকে ও বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে সেটিই মস্তিষ্কে বিশ্লেষিত হয়ে অর্থবহ নানা দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। স্পষ্টতঃই এখানে চোখ থেকে কোন শক্তি বেরোনর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তাই প্রাচীন নানা সাহিত্যের চিত্ররূপে ক্রুদ্ধ দেবতা বা মুনিঋষির চোখ থেকে আলোকচ্ছটা বেরুচ্ছে ও কাউকে ভস্ম করে দিচ্ছে ইত্যাকার ব্যাপারগুলি নিছকই মিথ্যে ও কল্পনা ছাড়া কিছুই নয় কারণ প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি উল্টোই। আলোকচ্ছটাই চোখে ঢুকছে। আর যেহেতু কোন শক্তি ছাড়া কোন ধরনের কাজ হতে পারে না, ও দৃষ্টিশক্তির অস্তিত্ব নেই, তাই দৃষ্টি বা নজর দিয়ে ভাল-খারাপ কোনকিছু করাই সম্ভব নয়,—বাচ্চার রক্ত শুকিয়ে দেওয়াও না, গাড়ীর যাত্রাপথকে বিপদসংকুল করাও না। যদি কিছু ঘটে তা ঘটবে 'নজর লাগার' প্রতি অন্ধ ও মিথ্যা বিশ্বাসের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভীতিজনিত মানসিক কারণেই—যেটিও আবার স্নায়ু-নামক বস্তু নির্ভর। তাই যেসব ঘটনাকে কারোর বদ্‌-নজর বা কু-দৃষ্টির জন্য ভাবা হচ্ছে, সেগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই বিচার করে তার প্রতিবিধান করা উচিত। বদ্‌নজর কাটানর জন্য ফালতু কাজকর্মে সময় নষ্ট না করাটাই দরকার।

তিলতত্ত্ব ও যতুকতত্ত্ব

চামড়ার বিভিন্ন স্থানে ছোট্ট কালো দাগকে তিল বলা হয়। আর এই দাগ একটু বড় হলে তাকে যতুক বা জড়ুল বলে—যেটি চামড়া থেকে একটু উঠে থাকতে পারে, তার ওপর চুলও থাকতে পারে। ইংরেজিতে একে বলে mole, আর চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিভাষা হচ্ছে nevus pigmentosus. Nevus শব্দটি ল্যাটিন, যার অর্থ হচ্ছে জন্ম দাগ। মোদ্দা কথা হল, চামড়ার সঙ্গে একই

তলে অবস্থিত বা একটু উঁচু হয়ে উঠে থাকা, বিভিন্ন আকারের জন্মগত কালো দাগকে nevus pigmentosus বা mole অর্থাৎ তিল ও যতুক বলা হয়।

যে কোন অস্বাভাবিক জিনিসই আদিমকাল থেকে মানুষের মনে আগ্রহ জাগিয়ে আসছে। নিজেদের গায়ের রঙের কারণ যেমন জানা ছিল না, তেমনি চামড়ার ওপর হঠাৎ হঠাৎ বিশেষ কোন স্থানে অস্বাভাবিক কালো দাগ তথা তিল ও যতুকের বৈজ্ঞানিক কারণও প্রাচীনকালে জানা ছিল না। তাই মাণুষের সদা অনুসন্ধিৎসু, জ্ঞানপিপাসু মন এসবের তাৎপর্য খোঁজার চেষ্টা করেছে এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও কিছু ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থিত তিল ও যতুকের বিশেষ অর্থ কল্পনা করছে। অবশ্যই এর সাথে রয়েছে পর্যবেক্ষণজাত কিছু অভিজ্ঞতা, যা কখনো কাকতালীয়ভাবে, কখনো বা মনের মধ্যে পূর্ব আরোপিত ধারণার উপর ভিত্তি করে মনগড়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিলেছে, সাথে আছে কিন্তু প্রতীকী ধারণা। অন্যান্য বহু সংস্কারের জন্মও এইভাবে।

প্রাচীন বই সুব্রহ্মণ্যের যতুকতত্ত্বে বলা হয়েছে—"১। মুখের বামভাগে যতুক থাকিলে সুখী ও ধীর হয়। ২। দক্ষিণভাগে সম্মান ও রাজবৎ সুখী। ৩। বামহস্তের কনুইয়ের উপর দুঃখী। ৪। বামহস্তে কনুই-এর নীচে অভিলাষী। ৫। দক্ষিণহস্তের কনুইয়ের উপর নিন্দিত চরিত্র। ৬। দক্ষিণহস্তের কনুইয়ের নীচে কামুক। ৭। বামবক্ষে পরধন লাভে গর্বিত। ৮। দক্ষিণ বক্ষে মূর্খ ও পাপী। ৯। নেত্রে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও দাতা। ১০। করতলে অঋণী ও অপ্রবাসী। ১১। পদতলে, ধন-নাশকারী ও অর্দ্ধ মূর্খ। ১২। গুহ্যে পীড়িত ও অসুখী। ১৩। জননেন্দ্রিয়ে কামুক ও নিন্দিত চরিত্র। ১৫। উরুতে নষ্টচরিত্র ও পরদারলোভী। ১৫। বাম পদমূলে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। ১৬। দক্ষিণপাদমূলে ভ্রমণশীল। ১৭। কর্ণে শ্রুতিধর ও সুভাষী। ১৮। কটিদেশে দৈহিক পীড়ার যন্ত্রণায় কাতর ও সর্বদা অসুখী। ১৯। নিতম্বে অস্বাভাবিক অভিগমন প্রিয়। ২০। পৃষ্ঠে দাতা, ধীর ও শান্ত। ২১। জানুতে বলিষ্ঠ, ভোক্তা ও পরোপকারী।"

একইভাবে তিলতত্ত্বে বলা হয়েছে—"১। ললাটের দক্ষিণপার্শ্বে

নাসার উপর তিল থাকিলে দৈবধন ও যশোলাভের সম্ভাবনা। ২। নেত্রের নিম্নে তিল, অধ্যবসায়ীর চিহ্ন। ৩। গণ্ডস্থলে তিল থাকিলে কখনোই ধনশালী হয় না। ৪। নিম্ন ও ওপর ওষ্ঠের তিল বিলাসিতা ও প্রেমিকের চিহ্ন। ৫। কণ্ঠের তিল বিবাহদ্বারা ধনলাভ প্রকাশ করে। ৬। বক্ষস্থ তিল সুস্থ দেহ ও ভাগ্যের পরিচায়ক। ৭। দক্ষিণ পঞ্জরস্থ তিল হীনবুদ্ধির পরিচয়। ৮। উদরের তিল পেটুক। ৯। হৃদয়ের বিপরীতদিকস্থ তিল অর্থপর ও পরিচ্ছন্ন প্রিয়তার লক্ষণ। ১০। দক্ষিণবাহুস্থ তিল দৃঢ়দেহ ও ধৈর্যশীলতার চিহ্ন। ১১। কণ্ঠস্থ তিল ধৈর্যশীলতা, বিশ্বাস ও ভক্তিমানের চিহ্ন। ১২। ললাটের বামপার্শ্বের তিল (কেশের নিকটবর্তী) দুঃখ ও অসচ্চরিত্রতার চিহ্ন। ১৩। ললাটের বামপার্শ্বের (কর্ণের দিকের) তিল অপব্যয় নিন্দা ও অখ্যাতি ঘোষণা করে। ১৪। নাসিকার দক্ষিণপার্শ্বের (চক্ষুর দিকের) তিল দীর্ঘজীবী ধনবান ও অধ্যবসায়ীর চিহ্ন। ১৫। ভ্রূনিম্নস্থ তিল জীবনব্যাপী দুঃখদারিদ্রের পরিচায়ক। ১৬। নাসিকার বামপার্শ্বস্থ তিল নির্ধনী, অপব্যয়ী ও মূর্খের পরিচায়ক। ১৭। বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থ সরোম তিল বিদ্বান ও কবিত্বশক্তির চিহ্ন। ১৮। দক্ষিণপদের তিল জ্ঞানের পরিচায়ক। ১৮। বামগণ্ডের তিল দাম্পত্যপ্রেমে সুখী ও সৌভাগ্যের চিহ্ন। ২০। কর্ণমধ্যস্থ তিল ভাগ্য ও যশের চিহ্ন।”

তিল ও যতুকের অবস্থান দেখে লোকচরিত্র বিচার করার প্রবণতা এখন অনেকটাই কম। তবু এখনো অনেকেই এ ব্যাপারে উৎসাহী। “রাত্রি ঘণ্টা ৮।১০।৪৫ মধ্যে বার্ত্তাকু, পরে মাষকলাই ভক্ষণ নিষেধ”—পঞ্জিকার এ হেন নির্দেশকে মেনে চলার মত লোক এখন প্রায় নেই। কিন্তু তিল বা যতুক তত্ত্বের সবটা না হলেও বিশেষ দু’চারটি নিয়মকে গুরুত্ব দেন এধরনের লোকের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বেশীই।

তিল বা যতুকের কালো রঙটি হয় মেলানিন নামে একটি পদার্থের জন্য। আমাদের গায়ের রঙের পেছনে কয়েকটি পদার্থের ভূমিকা থাকে—এগুলি হল কালো রঙের মেলানিন ও মেলানয়েড,

ক্যারোটিন, অক্সিহিমোগ্লোবিন ও বিজারিত হিমোগ্লোবিন। এদের মধ্যে মেলানিনের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মেলানোব্লাষ্ট নামে শরীরের বিশেষ ধরনের কোষে এই পদার্থ তৈরী হয় কিছু হরমোন ও উৎসেচক বা এনজাইমের প্রভাবে। এই কোষ শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং মেলানোব্লাষ্ট মেলানিনে পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে বলা হয় মেলানোসাইট। অনেকের মতে 'অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরোসিন' নামে এক ধরনের প্রোটিন, মেলানেজ নামক উৎ-সেচকের দ্বারা রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে মেলানিনে পরিণত হয়। ইন্টারমেডিন বা মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন (MSH) নামের হরমোনটি মেলানোসাইট তথা মেলানিন প্রস্তুতিকে প্রভাবিত করে। শরীরের কালো অংশে ও কালো চামড়ার লোকের মধ্যে এই রঞ্জন পদার্থের আধিক্য থাকে। মেলানিন তৈরীর এই সামগ্রিক প্রক্রিয়া তথা সারা শরীরে এর ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম ছন্দপতনের ফলে চামড়ার কোন কোন অঞ্চলে মেলানোসাইটের আধিক্য ঘটে যায়, ফলে ঐ বিন্দুটিকে চার পাশের অংশ থেকে কালো দেখায়। আর এটিই তিল বা যতুক।

স্বাভাবিক ভাবেই এই মেলানিন তৈরী বা আচমকা কোন স্থানে মেলানিনের আধিক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সুখী বা ধীর হওয়া, বুদ্ধিমান বা অর্দ্ধমূর্খ হওয়া ইত্যাকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যেমন কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি সম্পর্ক নেই বিয়েতে অর্থলাভ, জীবনব্যাপী দুঃখদারিদ্র্য ইত্যাদি ভবিতব্যের সাথেও। যতুকতত্ত্ব বা তিলতত্ত্বের অধিকাংশই করা হয়েছে শরীরের স্থানীয় অঞ্চলের বিশেষ কাজ বা প্রতীকী তাৎপর্যের উপর ভিত্তি করে। যেমন জননেন্দ্রিয়ে তিল থাকলে কামুক হওয়া, উরুতে যতুক থাকলে পরদারলোভী হওয়া, কর্ণে যতুক থাকলে শ্রুতিধর সুভাষী হওয়া ইত্যাদি ধরনের ধারণা। হস্তরেখা-বিদ্যা (palmistry), জ্যোতিষবিদ্যা ইত্যাদির মত এধরনের ধারণাবলীও সম্পূর্ণ অনুমানপ্রসূত বা ভ্রান্ত ধারণা ও পর্যবেক্ষণের ভ্রান্ত পদ্ধতির উপর গড়ে ওঠা। সময়ের পরিবর্তনের সাথে এই

ধরনের অপ-তত্ত্বের উপর নির্ভরতা অনেক কমে গেছে। এটিও প্রমাণ করে যে, এগুলি সনাতন ও সত্য আদৌ নয়।

হাতের রেখা

বাঁদর, গেরিলা, শিম্পাঞ্জী, বনমানুষ ইত্যাদির মত মানুষের করতলেও ছোট বড় ভাঁজ বা তথাকথিত রেখা রয়েছে। বাঁদর বা গেরিলারা এই সব ভাঁজের বিশেষ তাৎপর্য কল্পনা করে নিজেদের ভবিতব্য বা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে বলে কোন জীববিজ্ঞানীর জানা নেই। তবে মানুষ যে করে তা আমরা সবাই জানি। এ থেকে হস্তরেখাবিদ্যা (palmistry)-র সৃষ্টি হয়েছে, এটি আবার জ্যোতিষবিদ্যা (astrology) নামক অপবৈজ্ঞানিক ধারণার সাথে সরাসরি যুক্ত।

প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষের মনে অতি স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবিটা জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। সামাজিক অসহায়তা এই আকাঙ্ক্ষাকে আরো পুষ্টি জুগিয়েছে। তাই আরো নানা পদ্ধতির মত মানুষ জ্যোতিষবিদ্যার জন্ম দিয়েছে। উন্নততম মস্তিষ্ক তথা কল্পনা করার ক্ষমতার অধিকারী মানুষ নিজেদের জীবন তথা এই প্রকৃতি ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আদিমকালেই এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কল্পনা করেছে। এই ঈশ্বর থাকেন মহাকাশে, তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে সূর্যচন্দ্রগ্রহ-নক্ষত্রাদি পরিচালিত হয় ; আবার তাঁরই নির্দেশে প্রতিটি মানুষের চরিত্র ও জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়—এধরনের কল্পনা থেকেই ভাবা হয়েছে, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান থেকে ঐ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকে জানা সম্ভব এবং এর উপর ভিত্তি করেই কোন মানুষের জীবন ও চরিত্রকেও জানা সম্ভব। কারণ এটিও তাঁরই ইচ্ছায় ঘটে। তাই জ্ঞানপিপাসার ফলে মানুষ যেমন মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিপথ ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ করেছে তেমনি তার সাথে মিশিয়েছে নিজেদের জীবনকে। এই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে নিজেদের ভবিষ্যৎ ইত্যাদিকে জানার জন্য

জ্যোতিষবিদ্যার। হাতের কাছেই পাওয়া হাতের রেখার উপরও তাকে আরোপিত করেছে। সৃষ্টি হয়েছে হস্তরেখা বিদ্যার। এর সাথে মিশেছে কিছু পর্যবেক্ষণ, যা কাকতালীয়ভাবে কিছু কিছু হয়তো মিলেছেও।

হাতের তালুতেই রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শনি, শুক্র, মঙ্গল, বুধ, রাহু, কেতু ইত্যাদি গ্রহের প্রতীক অবস্থানের কথা বলা হয়—যেমন তর্জনীর গোড়ায় বৃহস্পতি বা বুড়ো আঙ্গুলের গোড়ায় শুক্র ইত্যাদি। এই সব স্থানের উঁচু-নীচু আকার, ছোটবড় নানা রেখা ইত্যাদির উপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র ও ভবিতব্য নির্ভর করে বলে বলা হয়। যেমন বৃহস্পতিস্থান উঁচু থাকলে কেউ সুখী, ধনবান ও খ্যাতিমান হবে। আবার হাতের বিভিন্ন রেখার সাথে শরীরের নানা অংশকে মেলান হয়েছে যেমন মস্তিষ্ক-রেখা, হৃদয়রেখা ইত্যাদি। কয়েকটি আবার অন্যভাবেও বলা হয় যেমন আয়ুরেখা। এই সব রেখার দৈর্ঘ্য, অবিচ্ছিন্নতা, শাখা-প্রশাখা, গতিপথ ইতাদির বিশ্লেষণ করে কে কদ্দিন বাঁচবে, কার কটি বিয়ে হবে, কটি ছেলেমেয়ে হবে, কখন কি অসুখ হবে ইত্যাদি ধরনের ভবিষ্যদবাণী করা হয়। কে হৃদয়হীন কি দয়াবান, সাহিত্যরসিক কি বিজ্ঞানী হবেন তাও নাকি বোঝা যায়। তথাকথিত হস্তরেখাবিদ্‌রা গম্ভীরভাবে, কখনো বা লেন্স নিয়ে, এই সব রেখা পর্যবেক্ষণ করে থাকে আর ধোঁয়াটে নানা কথাবার্তার দ্বারা খদ্দেরদের তথা অন্ধবিশ্বাসী মানুষদের সর্বনাশ করে।

জ্যোতিষবিদ্যার প্রাথমিক ভিত্তিটিই কাল্পনিক। মনে করা হয়, বহু সহস্র মাইল দূরবর্তী গ্রহনক্ষত্রাদি মানুষের চরিত্র ও জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আদৌ এ ব্যাপারটি ঘটতে পারে না। সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর কাছাকাছি হওয়ার জন্য এদের মহাকর্ষজনিত আকর্ষণের প্রভাব পৃথিবীর আবহাওয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারেই। কিন্তু জ্যোতিষবিদ্যা বর্ণিত অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রাদি এই প্রভাবটুকুও ফেলে না। বড়জোর অতিসূক্ষ্ম মহাকর্ষজনিত আকর্ষণ, মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদি দান

করে। আর এই আকর্ষণ, আমাশার জীবাণু থেকে শুরু করে গরু-বাছুর, বাঁদর, শিম্পাঞ্জী, মানুষ ইত্যাদি সমস্ত ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর কাজ করে কিন্তু তা কখনোই এমন নয় যে, সেটি তাদের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করবে। বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল, শুক্র ইত্যাদির মহাকর্ষজনিত ও অন্যান্য প্রভাব অতি সূক্ষ্মবিচারে সামান্য কিছু এদিক ওদিক হলেও, মোটামুটি তা একই। অথচ এদের তথাকথিত প্রভাবকে হাস্যকরভাবে, সম্পূর্ণ বিপরীত বলেই বলা হয়, যেমন বৃহস্পতির ও শনির প্রভাব ইত্যাদি। মানুষের চরিত্র তার পরিবেশ ও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, শেষোক্তটির উপর বংশগতি (heredity)-র প্রভাব রয়েছে যা 'জিন' নামক বস্তুর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের জীবনও তার সমাজ-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। শাসকশ্রেণীর অনুগত ভাববাদীরা অজ্ঞতাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, মানুষের জীবনে সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব তথা শাসকশ্রেণীর শোষণ-অত্যাচারকে ঢাকা দেওয়ার জন্য ধরাছোঁয়ার বাইরের গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য, দুর্দশা তথা সারল্য, জ্ঞান, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদির জন্য দায়ী করেছে এবং এইভাবে তাদের অজ্ঞ রেখে বিক্ষোভের বর্শা-মুখকে বিপথে চালিত করার কাজে ব্যবহার করেছে। সাথে ছিল রাজরাজড়াদের ভবিষ্যৎ জেনে দেওয়ার চেষ্টা। যাইহোক জ্যোতিষ-বিদ্যার প্রাথমিক ভিত্তি যে কল্পনাপ্রসূত ও পরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা পরিপুষ্ট তা স্পষ্ট। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিস্বভাব ও ভবিতব্যের উপর বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রাদির নিজস্ব বিভিন্ন প্রভাব একেবারেই ভুল ধারণা ; একইভাবে ভুল হাতের তালুর বিশেষ বিশেষ স্থানে ঐ সব গ্রহের প্রতীকী অবস্থান কল্পনা করে তার ব্যাখ্যা খোঁজা। এছাড়া মহাবিশ্বের ঐ সব গ্রহগুলো যে সামান্য মহাকর্ষ প্রভাব পৃথিবীর মানুষের উপর ফেলে তার তুলনায় অনেক বেশী প্রভাব মানুষের উপর ফেলে পাশের পাথর, পাহাড়, ঘরবাড়ি ইত্যাদি। তাহলে জ্যোতিষবিদ্যা তথা

হাতের রেখায় এগুলোকেও স্থান দিতে হয়। জ্যোতির্বিদ ডিন্সমোর অলটার, ক্ল্যারেন্স, ফ্লেমিনিশ্, জন ফিলিপস মন্তব্য করেছেন "গ্রহ-নক্ষত্রাদি থেকে যে পরিমাণে বিকীরণ (radiation) পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় তা অত্যন্ত ক্ষীণ। এদের মহাকর্ষজনিত প্রভাব এতই কম যে, কাছাকাছি বহু জিনিষের তুলনায় সে পরিমাণ নেহাৎই নগন্য।"

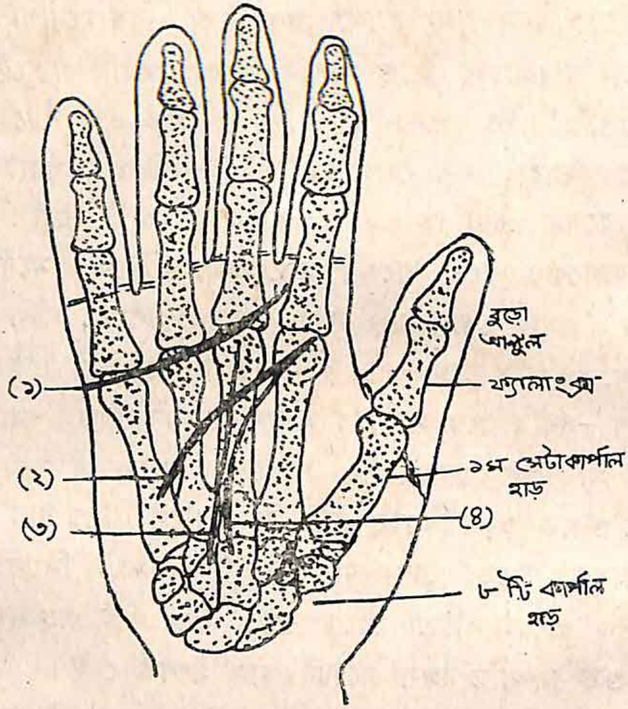
আবার জ্যোতিষবিদ্যা তথা হস্তরেখাবিদ্যায় যে সব গ্রহের কথা বলা হয় তাদের মধ্যে রাহু-কেতুর কোন বাস্তব অস্তিত্বই নেই। প্রথমে বলা হত এরা হল আকাশের দুটি দৈত্য। পরে এই গ্যাঁজাটিকে যখন আর চালান গেল না, তখন বলা হল আসলে এরা মহাকাশে অন্ধকার ও অদৃশ্য দুটি গ্রহ, যা আসলে সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবীর গতিপথের ছেদবিন্দু। বাস্তবতঃ এই ছেদবিন্দুর কোন অস্তিত্ব নেই এবং তার কোন বাস্তব কার্যকারিতাও নেই, যেমন নেই আকাশে উড়ে যাওয়া একটি এরোপ্লেনের গতিপথের সাথে নীচে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড দিয়ে চলন্ত একটি লরির গতিপথের ছেদবিন্দুর বাস্তব অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা। অন্যদিকে ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো, এই সব গ্রহের অস্তিত্ব থাকলেও এগুলোর কথা বলা হয় নি, তার সহজ কারণ এগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালের মানুষ জানতেন না। আর সৌর জগতের বাইরে যে অজস্র অতিকায় নক্ষত্র রয়েছে তাদের কথাও বলা হয় না, সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটা এমনি হাস্যকর।

সম্ভাব্যতার নিয়মে কিছু কিছু মিলে যাওয়া ছাড়া হাতের রেখা থেকে করা ভবিষ্যদ্‌বাণী কখনোই মেলে না। অনেক জ্যোতিষী সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, লোকচরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা, আর 'কমনসেন্স' মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দেখে কিছু কিছু কথা বলেন যার অনেকগুলিই মিলে যেতে বাধ্য। হাতের রেখার তথাকথিত বিশ্লেষণগুলি মাথায় না রেখেও যে কেউ এটি করতে পারেন। আর যিনি হাত দেখাতে এসেছেন তাঁর মধ্যেও এর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস থাকে। তিনি জ্যোতিষীর সব কথাকেই নিজের জীবনের সাথে

মেলানর মানসিকতা নিয়েই আসেন এবং তা করেনও। জ্যোতিষী একদিকে যেমন কিছু আশাব্যঞ্জক কথা বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গীতে আউড়ে খরিদ্দারের আস্থা অর্জন করেন, তেমনি তার হেঁয়ালিপূর্ণ কথাবার্তার বিভিন্ন ধরনের অর্থও হয়। "গত এক বছরের মধ্যে আপনার ভারী কোন রোগ হয়েছিল" —এটি প্রায় সবার ক্ষেত্রেই সত্যি বলেই প্রমাণিত হবে,—খরিদ্দার ভারী রোগ বলতে ইনফ্লুয়েঞ্জাকেও বুঝতে পারেন, এনকেফালাইটিসকেও মনে করতে পারেন। আর জ্যোতিষীর নানা গম্ভীর কথাবার্তা, জটিল হিসাব-নিকাশ, বৃহস্পতি তুঙ্গে—শনি বক্রী ইত্যাদি জাতীয় রহস্যময় শব্দ উচ্চারণ—সবমিলিয়ে সাধারণ মানুষ জ্যোতিষবিদ্যা তথা হাতের রেখায় আস্থাশীল হয়ে পড়েন ; ছোটবেলা থেকে এ সব ব্যাপার শুনতে শুনতে দৃঢ়মূল বিশ্বাস মনের মধ্যে আগেই জন্মে যায়।

আসলে হাতের রেখা বা ভাঁজ (crease) নিছকই একটি শারীরিক প্রয়োজনীয়তা থেকে সৃষ্ট। এর সঙ্গে বহু লক্ষ মাইল দূরের শুক্র-বৃহস্পতি-মঙ্গল গ্রহের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের শরীরের যে সমস্ত গাঁটেরই অনেক নড়াচড়া হয় সেই সব গাঁটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ধরনের ভাঁজ থাকে। গাঁটটি যে দিকে ভাঁজ হয় (flexor aspect) সেই দিকেই সাধারণতঃ এই ভাঁজটি থাকে। কনুই বা কব্জির সামনে, হাঁটুর পিছনে এইভাবে চামড়ার উপর ভাঁজ রয়েছে। কনুই-এর সামনের ভাঁজটি (elbow crease), বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হতে পারে, সূক্ষ্ম তফাৎ থাকতে পারে। কিন্তু এই ভাঁজ যেমন ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্র বা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ জীবনের কোন ইঙ্গিত দেয় না, হাতের তালুর উপর ভাঁজগুলিও (palmar creases) তেমনি ঐ ধরনের কোন অর্থ বহন করে না, কারণ হাতের তালুর ভাঁজ বা রেখাগুলিও আঙ্গুলের নড়াচড়ার সুবিধার জন্য বিভিন্ন গাঁট অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে। আঙ্গুলের ছোট ছোট হাড় (phalanges)-এর মধ্যবর্তী গাঁটের সামনে যেমন ভাঁজ আছে, আঙ্গুলের গোড়াতেও তেমনি

ভাঁজ রয়েছে। বিবর্তনের পর্যায় বেয়ে মানুষ (Homo sapien)-



হাতের তথাকথিত নানা রেখা (১) হৃদয় রেখা (আঙ্গুলগুলি ভাঁজ করার সুবিধার জন্য), (২) মস্তিষ্ক রেখা (বুড়ো আঙ্গুল ও অন্যান্য আঙ্গুল ভাঁজ করে জড়ো করার জন্য , (৩) ভাগ্য রেখা (বুড়ো আঙ্গুলকে অন্যান্য আঙ্গুলের আছে আনার জন্য), (৪) জীবন রেখা (শুধু বুড়ো আঙ্গুলকে ভেতরের দিকে আনার জন্য)। এগুলোর নীচে রয়েছে হাতের ছোট বড় নানা গাঁট—গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে যোগাযোগ রাখার মত কিছু নয়।

এর পূর্বসূরী বাঁদর-শিম্পাঞ্জীরা যখন থেকে হাতের ব্যবহার শুরু করেছে তখন থেকেই এই সব ভাঁজের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের শরীরের অন্যান্য অংশের মত এটিও বহু সহস্র বছরের বিবর্তনের ফসল—একটি শারীরিক বৈশিষ্ট্য মাত্র। একটি শিশু যখন মায়ের পেটে থাকে তার হাত থাকে মুষ্টিবদ্ধ। হাতের তালুর চামড়া এই সময়ে বিভিন্ন গাঁট অনুযায়ী যেভাবে সংকুচিত থাকে সেভাবেই এই সমস্ত রেখার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হাতের এই সব রেখার বিন্যাস মূলতঃ এক ধরনের হলেও সূক্ষ্ম কিছু কিছু তফাৎ থাকেই। নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় কারণে, জিন (gene)-এর প্রভাবে পৃথিবীর বহু

কোটি মানুষের মুখমণ্ডল তথা শারীরিক গঠন যেমন বিভিন্ন এবং তার সাথে যেমন বৃহস্পতি শুক্র ইত্যাদি গ্রহের কোন সম্পর্ক নেই তেমনি হাতের রেখার বিভিন্নতার মধ্যেও এধরনের কোন অপার্থিব শক্তির প্রভাব থাকে না। এছাড়া,মাতৃগর্ভে ভ্রূণের ২ মাস বয়সের মধ্যে তার মাংসপেশী ও চামড়া তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু ঐ সময়ে মাংসপেশীতে প্রচুর জলীয় পদার্থ থাকে যা ৩-৪ মাসের মধ্যে কমতে থাকে—তখন থেকেই সূক্ষ্ম ভাঁজের সৃষ্টি হতে থাকে, এটি হাতের বা পায়ের পাতার ক্ষেত্রেও ঘটে। একটি শিশু যখন জন্মায় তখনও তার শরীরের অন্যান্য অংশের চামড়ার মত হাতের তালুর চামড়ায় ও চামড়ার নীচের অংশে প্রচুর জলীয় পদার্থ থাকে। শিশুর বয়স বাড়লে ধীরে ধীরে এই জলীয় অংশ কিছুটা কমে যায়, ফলে চামড়ায় যেমন অতিসূক্ষ্ম ভাঁজের সৃষ্টি হয়, তেমনি হাতের তালুতেও ছোট ছোট রেখা দেখা দেয়। এইসব মিলিয়েই এইভাবে হাতের ছোট-বড় রেখার সৃষ্টি।

হাত ও পায়ের পাতা কাজকর্ম-হাঁটাচলার ফলে বহু জিনিসের সংস্পর্শে আসে ও সেখানে ঘর্ষণ লাগে ; তাই এসব জায়গার চামড়া অপেক্ষাকৃত পুরু। চামড়ার একেবারে উপরের অংশটির নাম এপিডারমিস (epidermis) ; এতে বিভিন্ন ধরনের আবরণী কলা (epithelial tissue) থাকে। এর নীচে থাকে শক্ত, মোটা ও স্থিতিস্থাপক (elastic) অংশ কোরিয়াম (corium)। হাতে-পায়ের পাতায় এটিও অপেক্ষাকৃত পুরু থাকে। বিভিন্ন গাঁটের সামনেকার কোরিয়াম-এ গাঁটের নড়াচড়ার ফলে স্থায়ী ভাঁজের সৃষ্টি হয়, ঐ অনুযায়ী ঐ স্থানের এপিথেলিয়ামেও ভাঁজ থাকে। হাতের পাতায়ও একই ভাবে ভাঁজের বা রেখার সৃষ্টি হয়। এছাড়া হাতে ও পায়ের পাতার চামড়ায় অতি সূক্ষ্ম খাঁজ রয়েছে যা চক্রাকার, মণ্ডলাকার বা অনিয়মিত ভাবে সাজান থাকে ; এই সব খাঁজে থাকে অজস্র ঘাম নিঃসরণকারী গ্রন্থি (sweat gland)। [চামড়ায় সিবাম নামে আরেকটি চটচটে আঠাল রস নিঃসরণের জন্য সেবেসিয়াস গ্রন্থি

(sebacious gland)-ও থাকে। কিন্তু হাতের ও পায়ের পাতায় এটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।] হাতের পাতার যে অংশটিকে বৃহস্পতির স্থান বলে (অর্থাৎ তর্জনীর গোড়ায়) সেখানকার চামড়া কেটে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় যা দেখা যাবে এবং সেখানকার চামড়ার রাসায়নিক বিশ্লেষণে যা পাওয়া যাবে, হাতের পাতার অন্য অংশেও ঐ একই জিনিস পাওয়া যাবে। তথাকথিত বৃহস্পতির স্থান বা রাহুর স্থানের চামড়ায় কোন ধরনের তফাৎ নেই যদিও জ্যোতিষীরা এদের কাজকে সম্পূর্ণ বিপরীত বলেই বলেন। (সূক্ষ্ম ভাবে দেখলে তফাৎ যা আছে তা চামড়ার ওপরে সাজান খাঁজ ও তাদের ভেতর থাকা sweat gland-এর বিন্যাসে। এটি একই ব্যক্তির হাতের পাতার বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হয়। একে কাজে লাগিয়ে আঙ্গুলের টিপছাপের সাহায্যে বিভিন্ন ব্যক্তিকে চেনা যায়। স্পষ্টতঃ এই তফাৎও বিভিন্ন বটগাছের পাতার সংখ্যার তফাতের মত, এর সাথেও গ্রহাদি বা ব্যক্তিজীবনের কোন সম্পর্ক নেই।)

হাত দেখার উপর তথাকথিত অনেক শিক্ষিত ও বিজ্ঞানীরাও আস্থা রাখেন। ব্যাপারটি নিছকই মিথ্যে বিশ্বাসপ্রসূত। ছোটবেলা থেকেই এ ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন নানা বিশ্বাসের সমর্থনে কথাবার্তা শুনতে শুনতে অবচেতন মনে এদের উপর একটি অন্ধবিশ্বাস জন্মে যায় যাকে delusion বলা যায়। এর ফলে জ্যোতিষীদের কথাবার্তা মনের উপর সম্মোহনী প্রস্তাব (hypnotic suggestion)-এর মত কাজ করে এবং যেন প্রায় সম্মোহিত অবস্থায় তাদের কথাগুলিকে মেলানর প্রচেষ্টা চলে। কাকতালীয় ভাবে এক-আধটি মিলে গেলে তারই প্রচার চলে বেশী। বিফলতার অজস্র উদাহরণ কাকতলীয় সাফল্যের একটি উদাহরণের ঢক্কা নিনাদে চাপা পড়ে যায়। রাজনৈতিক নেতাদের হাত দেখে অনেক জ্যোতিষী নানা ভবিষ্যদ্বাণী করেন যার কিছু কিছু নাকি মিলেও যায়। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ সঠিকভাবে করে আন্দাজে

কিছু কথা বললে কিছু মিলবেই। রিপোর্টার ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও এধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন ও তাদের অনেকগুলি মিলেও যায়। জ্যোতিষীদের সাথে এঁদের তফাৎ এই যে এঁরা সমাজ ও রাজনীতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন, গ্রহ-নক্ষত্র হাতের রেখার হাবিজাবির কথা বলেন না। কোন এক জ্যোতিষী ঘানার প্রেসিডেন্টের হাত দেখে নাকি বলে দিয়েছিল, ঐ দেশের কোথায় মাটির নীচে তৈলসম্পদ রয়েছে। এ ধরনের হাস্যকর প্রচার-এর পেছনে যদি বৈজ্ঞানিক সত্যতা থাকে, তবে তো অচিরেই ভূ-বিজ্ঞানীদের ভূ-বিজ্ঞানচর্চা বন্ধ করে দেওয়া উচিত এবং বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতির হাতের সামনে এক একজন জ্যোতিষীকে বসিয়ে দেওয়া উচিত। ভোল্টেয়ারকে দু'জন বিখ্যাত জ্যোতিষী হাত দেখে বলেছিলেন যে তিনি মাত্র ৩২ বছর বাঁচবেন, ভোল্টেয়ার ৮৪ বছর বেঁচে জ্যোতিষীদের এই বাণীকে মিথ্যে প্রমাণ করেছিলেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত, শ্রীলংকার নাগরিক ডঃ আব্রাহাম থোম্মা কোভুর হস্তরেখাবিদ্যাসহ বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি ১৯৬৩ সালে একটি আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি কেউ জ্যোতিষবিদ্যা ও হস্তরেখাবিদ্যাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সঠিক প্রমাণ করতে পারে তবে তাকে তিনি একলক্ষ শ্রীলংকার টাকা পুরস্কার দেবেন। তিনি ঘোষণা করেন, "যে সব জ্যোতিষী ও হস্তরেখাবিদ, জ্যোতিষবিদ্যা ও হস্তরেখা-বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক বলে দাবী করে সরল মানুষকে ঠকায়, তারাও আমার পুরস্কার জিতে নিতে পারে যদি তারা বড়জোর শতকরা ৫ ভাগ ভুল করে দশটি ঠিকুজি বা দশটি হাতের ছাপ দেখে সেগুলি নারী কি পুরুষের, জীবিত কি মৃতের তা বলে দিতে সক্ষম হয়। ঘণ্টা মিনিটের হিসেব পর্যন্ত জন্মসময় ও তারিখ এবং অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ দিয়ে জন্মস্থান বলে দেওয়া থাকবে।" ভারতে জ্যোতিষবিদ্যা শেখানর তথাকথিত অনেক অধ্যাপক ও মহাবিদ্যালয় রয়েছে। ডঃ কোভুর এদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে

এধরনের চ্যালেঞ্জের খবর জানিয়েছিলেন। এছাড়া সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দু'চারজন ছাড়া কোন জ্যোতিষী বা হস্তরেখাবিদ এগিয়ে আসেননি—স্পষ্টতঃই নিজেদের মিথ্যে দাবীর ভ্রান্তি ধরা পড়ার ভয়ে। আর যে দু' চারজন এসেছিলেন করুণভাবে তাদের জালিয়াতি ধরা পড়ে যায়। জ্যোতিষবিদ্যার তথাকথিত অধ্যাপকরা যদি সত্যিই জানতো যে, তাদের প্রচার করা বিদ্যায় কোন ফাঁকি নেই, তবে অনায়াসেই তারা এগিয়ে আসতো—পুরস্কারের টাকাও পেতো এবং জ্যোতিষবিদ্যার যথার্থতাও প্রমাণিত হত। অবিশ্যি তা না করলেও এদের জালিয়াতির ব্যবসা কমে নি। ব্যাপক সংখ্যক সরল বিশ্বাসী অসহায় মানুষ চারপাশে রয়েছে। তাদের শিকার করে আর হাতের তালুতে, হাতের রেখায় আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের কাজকর্ম তথা তাদের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ জীবন বোঝা যাচ্ছে—এ ধরনের আগডুম-বাগডুম বুঝিয়ে ব্যবসা যখন চালানই যাচ্ছে, তখন কেন আর মিছি-মিছি নিজের জালিয়াতিটা প্রকাশ করতে যাওয়া!

জন্ম-লগ্ন

এ আরেকটি সাংঘাতিক ব্যাপার। কোন্ মাসের কোন্ তিথির, দিনরাত্রির কোন্ সময়ে জন্ম হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে ঠিকুজি-কুষ্ঠি তৈরী হয় এবং ঐ সময় কোন্ গ্রহ কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল তার উপর নির্ভর করে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র ও ভবিষ্যৎ জীবন নাকি জানা যায়। জ্যোতিষবিদ্যায় এ নিয়ে সুবিশাল আলোচনা রয়েছে। খনার বচনেও 'জন্মলগ্ন বিচার'-এর কথা বলা হয়, যেমন "সূর্য কূজে রাহু মিলে। গাছে দড়ি বন্ধন গলে। যদি রাখে ত্রিদশনাথ, তবু সে খায় নীচের ভাত। খনা বরাহেরে বলে কোন্ লগ্ন দেখ। লগ্নের সপ্তম ঘরে কোন গ্রহ দেখ। আছে শনি সপ্তম ঘরে। অবশ্য তারে খোঁড়া করে। রবি থাকিলে জমায় ভূখণ্ড। চন্দ্র থাকে ধরে নবদণ্ড। মঙ্গল যাকে করে খণ্ড খণ্ড।

অস্ত্রাঘাতে যায় তার মুণ্ড। বুধ থাকে বিষয় করায়। গুরু শুক্র থাকে বহু ধন পায়। লগ্নে আঁকা লগ্নে বাঁকা। লগ্নে থাকে ভানুতনুজা। লগ্নের সপ্তমে অষ্টমে থাকে পাপ। মারে জননী পীড়ে বাপ" ইত্যাদি। জ্যোতিষবিদ্যায় সব মিলিয়ে জন্ম মুহূর্তটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে বহু দূরের গ্রহ-নক্ষত্রের পক্ষে নবজাত শিশুর শরীরে এমন কিছু প্রভাব ফেলা সম্ভব নয় যার ফলে তার চরিত্র ও ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হতে পারে। এটি সম্পূর্ণই নির্ভর করে ঐ শিশুর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া বংশগতি ও জিন gene-এর উপর, মায়ের পেটে থাকাকালীন ও জন্মের পর সে কেমন পুষ্টি পেল তার ওপর এবং পারিপার্শ্বিক সমাজব্যবস্থা ও পরিবেশের উপর। গ্রহ-নক্ষত্র যদি আদৌ কোন প্রভাব ফেলত তবে মায়ের জরায়ুতে থাকাকালীনও ফেলবে, সুতরাং সেখানে জন্ম সময়ের গুরুত্ব নেই। আর একটি শিশু ঠিক কোন্ সময়ে জন্মাবে তা অনেক কিছু শর্তের উপর নির্ভর করে। যেমন মায়ের যদি অপুষ্টিজনিত সৃষ্টি হওয়া রিকেটের জন্য কোমরের হাড়ের গঠন ঠিকমত না হয়, শিশুর মাথা যদি বড় হয় বা জরায়ুতে তার অবস্থান যদি অস্বাভাবিক হয় তবে প্রসব তথা শিশুর জন্ম বিলম্বিত হবে। এক্ষেত্রে সিজারিয়ান অস্ত্রোপ্রচার করে পেট ও জরায়ু কেটে বাচ্চাকে বের করাতে হতে পারে। ফলে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক অনায়াসেই শিশুর জন্মলগ্নকে পাল্টাতে পারেন। জন্মের সময়টি যদি সত্যিই একজন মানুষের জীবন ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করত তবে সারা পৃথিবী জুড়েই শুভলগ্ন দেখে প্রতিটি শিশুকে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার করে মায়ের জরায়ু থেকে বের করান হতো। কোন্ বাবা-মা-ই না চান যে, তাঁদের শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন বিপদমুক্ত ও সুখী হোক? আর স্বাভাবিক প্রসবকে দু'চার ঘণ্টা এদিক ওদিক করালে প্রায় কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়াই হবে না। কিন্তু এইভাবে করা হয় না, তার কারণ ব্যাপারটিই ভ্রান্ত ও আজগুবি, অথচ এই আজগুবি ব্যাপারটার উপর ভিত্তি করে জ্যোতিষীরা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

অনেকে আবার যৌনমিলন তথা গর্ভাধানের সময়টিকে সংশ্লিষ্ট শিশুর জীবন ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণকারী বলে মনে করেন। হিন্দুপুরাণে পূন্থনম বলে একজনের কথা আছে যার জন্ম হয়েছিল এক ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ঐ ব্রাহ্মণের অপরিচিতা এক মহিলার গর্ভে। ঐ ধান্দাবাজ ব্রাহ্মণটি ঐ ভদ্রমহিলাকে বোঝায় যে একটি শুভ মুহূর্ত আছে যে সময়ে যৌনসঙ্গম করলে তথা গর্ভাধান হলে শুভলক্ষণ সম্পন্ন একটি শিশু জন্মাবে। আর এইভাবেই পূন্থনমের জন্ম। পঞ্জিকাতে গর্ভাধানকে বিশেষ শুভ সময়ে করার বা অশুভ সময়ে না করার নির্দেশ থাকে। কিন্তু যারা এ ধরনের কল্পনা করেছে তারা জানত না যে, যৌনমিলনের সময়েই গর্ভ সঞ্চার হয় না। প্রতি ঋতুবতী নারী স্বাভাবিক ২৮ দিন অর্থাৎ এক চান্দ্রমাসের জন্য ঋতু চক্রের (menstrual cycle) অধীনে থাকেন। দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী (মাসিক শুরু হওয়ার ১০ম-১৮শ দিনের) কোন এক সময়ে তাঁর দু'টি ডিম্বাশয় থেকে সাধারণতঃ একটি মাত্র ডিম্বকোষ (ovum) নিঃসরিত হয়। যৌনমিলনের সময়, সাধারণ ভাবে পুরুষের বীর্যের লক্ষ লক্ষ পুং-জননকোষের একটি মাত্র এই ডিম্বকোষের সাথে মিলিত হয়ে নিষিক্ত (fertilised) হয়—সৃষ্টি হয় ভ্রূণ বা একটি শিশুর প্রাথমিক কোষটি। এই নিষেকক্রিয়া (fertilisation) প্রতিটি যৌনসঙ্গমের ফলে যেমন ঘটে না, তেমনি যৌনসঙ্গমের সঙ্গে সঙ্গেও ঘটে না—ঘটে পরবর্তী তিন দিনের কোন এক সময়ে। ফলত যৌনমিলনের সময়টি—একটি শিশুর সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত নয়।

এই পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্রতি মুহূর্তে শতাধিক মানব শিশুর জন্ম হচ্ছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক দম্পতি যৌনসঙ্গমে মিলিত হচ্ছেন। কিন্তু একই মুহূর্তে জন্মান বা একই মুহূর্তে করা যৌনমিলনের ফলশ্রুতি হিসেবে জাত শিশুগুলির চরিত্র ও জীবনযাত্রা বিভিন্ন হয়। শুধুমাত্র এটিই জন্মলগ্ন ও গর্ভাধানের (?) মুহূর্তটি যে মানবচরিত্র ও মানব-জীবনকে প্রভাবিত করে না—তার প্রমাণ দিতে যথেষ্ট।

পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানীও এ ধরনের ক্ষতিকর মিথ্যে বিশ্বাসের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। আমেরিকার আরিজেনো বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যা (astronomy)-র অধ্যাপক ও আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির প্রাক্তন অধ্যাপক বোক মন্তব্য করেছেন, গ্রহ, নক্ষত্ররা সূর্য ও পৃথিবী থেকে এতই দূরে যে তাদের মহাকর্ষজনিত বল, চুম্বকক্রিয়া ও অন্যান্য ক্রিয়ার প্রভাব নিতান্তই নগন্য। আর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পক্ষে সূতিকাগৃহের দেওয়ালই যথেষ্ট প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। উপরন্তু সূর্য থেকে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকীরণ পৃথিবীতে এসে পৌছয় তা চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের তুলনায় অনেক বেশী। নিউ ইয়র্কের 'দি হিউম্যানিষ্ট' (৩৫ সংখ্যা, ১৯৭৫) ও লণ্ডনের 'নিউ হিউম্যানিষ্ট' (৯১ সংখ্যা, ১৯৭৫) পত্রিকায় ১৯ জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সহ ১৯২ জন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীর পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল, "জন্ম মুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রদের আকর্ষণ বলের ক্রিয়া জাতকের ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণ করছে—এ রকম ভাবার পেছনে কোন যুক্তি নেই। এও সত্য নয় যে, ওই বহুদূরের গ্রহ-নক্ষত্রদের অবস্থান কোন বিশেষ দিন বা সময়কে কোন বিশেষ কাজের পক্ষে সুবিধাজনক করে তুলেছে।...গ্রহ-নক্ষত্রগুলির অবস্থান পৃথিবী থেকে এত দূরে যে, তারা পৃথিবীর উপর মহাকর্ষ বা অন্যান্য অভিঘাতজনিত যে বল বা শক্তি প্রয়োগ করে তার পরিমাণ অতি নগন্য। মানুষ নিজের অসহায় অবস্থায় ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক বহিঃশক্তির উপর নির্ভর করতে চায়। ভাবতে চায় পৃথিবী বহির্ভূত কোন অলৌকিক শক্তিই বুঝি তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। এটা বোঝা দরকার, আমাদের ভবিষ্যত নিজেদের উপর নির্ভর করছে, কোন গ্রহ নক্ষত্রের উপর নয়।" তাঁরা দ্ব্যর্থহীনভাষায় ঘোষণা করেন, "জ্যোতিষ চর্চার ধ্বজাধারীদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সরাসরি দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ জানানোর সময় এসেছে।"

বাঁ-হাতে মারা

কাউকে, বিশেষ করে বাচ্চাকে বাঁ হাতে মারতে নেই, মারলে নাকি বাচ্চার অমঙ্গল বা শরীর খারাপ হয়। আসলে আমাদের অধিকাংশই ডানহাতের কারবারি। শতকরা একজনেরও কম ব্যক্তি আছেন যাঁরা বাঁ হাতেই কাজকর্ম করেন, ডান হাতে নয়। তাই সাধারণভাবে বাঁহাতের কাজকর্ম সুনিয়ন্ত্রিত হয় না। এবং রাগের মাথায় এই হাতে কাউকে মারলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর আঘাত লাগতে পারে বা শরীরের সংবেদনশীলস্থানে ঘা পড়তে পারে। তাই ডানহাতি ব্যক্তিদের বাঁ হাতে মারধোর না করাই ভাল। একই ভাবে বাঁ-হাতিরা বাঁহতে দিয়েই মারবেন, ডানহাতে নয়। তাছাড়া বাঁ-হাতের কাজকর্ম তাচ্ছিল্য বা অবহেলা বোঝায়। এজন্যও বাঁ-হাতের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করার মনোভাব আসে। তবে কেউ যদি অনভ্যস্ত হাতেও সাবধানে কাজ করেন, তাহলে অবশ্যই তাতে খারাপ কিছু হবে না। বাঁ হাত ও ডান হাতের মধ্যে শারীরগত দিক থেকে (anatomical) কোন তফাৎই থাকে না। একটিকে আরেকটির আয়নায় ছায়া (mirror image) বলা যায়,—একই মাংসপেশী, একই স্নায়ু, একই ধমনী-শিরা ইত্যাদি। শুধু ব্যবহার কম হয় বলে, ডানহাতি ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক বাঁহাতের মাংসপেশীকে ততটা ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, মাংসপেশীর জোর একটু কম হয়। তবে বাঁহাতে মারা মানেই কারোর অমঙ্গল হবে—এ ধারণা ভুল। ভুল মঙ্গল-অমঙ্গলের এধরণের ধারণাও। আর সতর্ক ব্যক্তি উপযুক্ত সতর্কতার সাথে কাজ করলেও বাঁ হাতের কাজ মানেই অনিয়ন্ত্রিত বা অবহেলা—তাও ঠিক নয়। (প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, মস্তিষ্কে কথা বলার যে কেন্দ্র থাকে—যাকে বলা হয় Broca's area বা speech area, সেটি ডানহাতি ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে থাকে মস্তিষ্কের বাম-অর্ধে, বাঁ-হাতিদের ক্ষেত্রে দক্ষিণ অর্ধে। ডান-হাতি ব্যক্তিরা বাঁ হাতে বা বাঁ হাতি ব্যক্তিরা ডান হাতে বেশি কাজকর্ম

করার চেষ্টা করলে এই কেন্দ্রের কাজে গণ্ডগোল শুরু হয় যেমন তোতলামি, মানসিক অস্বাভাবিকত্ব ইত্যাদি।)

গায়ে পা লাগা

গায়ে পা লাগলে শশব্যস্ত হয়ে মাথায় হাত ছুঁইয়ে প্রণাম করতে হয়। গুরুজনদের গায়ে পা লাগলে তো কথাই নেই—সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করাই ভাল। সাহেবি মেজাজের লোক আবার শুধু sorry বা দুঃখিত বলেই সরে পড়েন। কেউ বা সাথে সাথে কপালে হাতও ছোঁয়ান। আসলে ব্যাপারটি সৌজন্যের পরিচায়ক একটি ঘটনা। কারো গায়ে হাত বা শরীরের অন্য কোন অংশ লেগে গেলে ততটা অসৌজন্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু পা লাগলে সেটিকে অভদ্রতা বলে মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটিও এক ধরনের সংস্কার মাত্র। পা থাকে শরীরের নীচে, মাটির উপর এই পায়ের পাতাই ঘোরাফেরা করে—যত ধুলোবালি নোংরা মাখামাখি হয়। তাই 'পা' নামের এই অঙ্গটিকে নোংরা বা অবহেলার যোগ্য বস্তুগুলোর সঙ্গে এক করে ফেলা হয়েছে। এ কারণেই হাত দিয়ে ঘুষি মারলে তা যতটা না-অপমানকর পা দিয়ে লাথি মারলে, সেটি মনে আঘাত করে অনেক বেশি—যদিও শারীরিক আঘাত দুটোতে একই হতে পরে বা লাথিতে ঘুষির চেয়ে কমও লাগতে পারে। শরীরের অন্যান্য অংশ ও হাতের মত পায়েও বিভিন্ন ধরনের মাংসপেশী রয়েছে, স্নায়ু, ধমনী, শিরা এবং নানা ধরনের কোষ রয়েছে। যারা সব সময়ে পায়ে চটি বা জুতো পরে চলাফেরা করেন তাঁদের পায়ে ও পায়ের পাতায় হাতে বা হাতের পাতার তুলনায় অনেক কম নোংরা লাগতে পারে। কেউ হাত দিয়েও তাচ্ছিল্যভরে অপমানকর কিছু করতে পারেন। তবু বেচারা পদ-যুগলই অসৌজন্য বা অভদ্রতা প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হিসেবে দায়ী হয়ে থাকে। আর গায়ে পা লেগে প্রণাম করার ব্যাপারটার মধ্যে শরীরের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা পরমাত্মার একটি অংশ রয়েছে—এই ধারণা কাজ করে। মানুষের

প্রাণের জন্য আত্মা দায়ী—যে আবার সেই পরমাত্মার একটি অংশ, গায়ে পা লাগলে যেন ঐ পরমাত্মাকে অপমান করা হয়। তাই প্রণাম করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান বা অপরাধের স্খালন করার চেষ্টা। নিম্নাঙ্গকে তাচ্ছিল্য বা নিম্নমানের কাজের সাথে তুলনা করার মানসিকতা থেকে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এ ধরনের কল্পনা করাও হয়েছে যে, সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর তাঁর বাঁ পা থেকে নিম্নজাতীয় শুদ্রবর্ণের ব্যক্তিদের সৃষ্টি করেছেন। বলাবাহুল্য, এই পরমেশ্বরের ব্যাপারটিও যেমন মানুষেরই কল্পনা তেমনি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র জাতীয় বর্ণের ভাগও সম্পূর্ণ মনগড়া—কারোর হাত-পা ইত্যাদি থেকে এসবের সৃষ্টি নয়। তবে এসব মাথায় রেখেও সাধারণ সৌজন্য বা ভদ্রতার ব্যাপারটাকে একেবারে পরিহার করা ঠিক নয়।

গায়ে ঝাঁটা বা পাখা লাগা

হাতপাখা দিয়ে কাউকে হাওয়া করছেন, এমন সময় তার গায়ে পাখা লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাখা মাটিতে ঠুকে নিতে হবে,—নইলে যার গায়ে লাগল তার নাকি অমঙ্গল হবে। যেহেতু পাখার হাওয়া দিয়ে অন্যদের, বিশেষ করে পুরুষদের সেবা করার মত কাজগুলি বহুদিন ধরে মেয়েদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে তাদের উপর চাপান রয়েছে, তাই এধরনের সংস্কারের প্রচলনটা মেয়েদের মধ্যেই বেশী। ঝাঁট দিতে দিতেও কারোর গায়ে ঝাঁটা লেগে গেলে ঝাঁটা ঠুকে দিতে হয় অথবা ঝাঁটার কাঠি ভেঙ্গে থুথু দিয়ে ফেলে দিতে হয়। না হলে যার গায়ে লাগল তার নাকি শরীর খারাপ হবে। কিন্তু সাধারণভাবে কোন রোগ পাখা বা ঝাঁটার মাধ্যমে কারোর শরীরে যেতে পারে না যদি না পাখা ও ঝাঁটায় বেশ নোংরা লেগে থাকে, এবং এই নোংরা চামড়ার কোন কাটা জায়গায় বা ঘা-য়ে লাগে। একইভাবে পাখা বা ঝাঁটার জন্য ভাবী কোন অমঙ্গলও ঘটতে পারে না, কারণ ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কোন ক্ষমতা এদের নেই। তবে দীর্ঘক্ষণ পাখা করতে করতে

ক্লান্ত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক; তখন, বা এমনিতেই কোন কারণে অন্যমনস্ক হলে, গায়ে পাখা লেগে যেতে পারে। তখন সতর্ক হয়ে যাওয়াই ভাল। এই সতর্ক হওয়ার ব্যাপারটা মাটিতে ঠুকে বা অন্যভাবে করা যেতে পারে, কিন্তু মাটিতে না ঠুকলে হবেই না—এটি ঠিক নয়। ঝাঁটার সঙ্গে আবার কাল্পনিক প্রেতাত্মার একটি সম্পর্ক গড়া হয়েছে। বিশ্বাস আছে 'ভূতের ভর' হলে ঝাঁটা পেটা করে তাকে তাড়ান যায় বা আঁতুড় ঘরে ঝাঁটা রাখলে ভূত-প্রেত আসে না, নানা আদিবাসী গোষ্ঠী প্রেত চর্চা বা প্রেত নৃত্যের সময় খ্যাংরা ঝাঁটা নিয়ে নাচগান করে। কারো গায়ে ঝাঁটা ঠেকলে এইসব প্রেতাত্মা তার শরীরে ভর করতে পারে, তাই ঝাঁটার কাঠি ভেঙ্গে, থুথু দিয়ে ফেলে দিয়ে তুক করা হয় যাতে ভূত-প্রেত আর না আসতে পারে। যেহেতু ভূত-প্রেত-পিশাচ-প্রেতাত্মার কোন অস্তিত্ব নেই, তাই তাদের ভর করা বা এইভাবে তাড়ানর ব্যাপারটিও নিছক মিথ্যে বিশ্বাসের জন্য করা; অন্যদিকে থুথু দিয়ে ঝাঁটার গায়ের জীবাণু মেরে ফেলা হয় এই ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা খোঁজাটাও হাস্যকর।

শরীর ডিঙ্গোন

কারোর শরীর বা শরীরের কোন অংশ ডিঙ্গিয়ে যেতে নেই। এর ফলে যাকে ডিঙ্গোন হচ্ছে তার অসুখ করবে বলে বিশ্বাস। এটিও একটি মিথ্যা সংস্কার মাত্র। বিশেষতঃ ঘুমন্ত শিশুর ক্ষেত্রে এ সংস্কারটি খুব বেশী করে মানা হয়।—মা-মাসি-পিসি-ঠাকুমারা হাঁহাঁ করে উঠবেন।

এ সংস্কারটি সৃষ্টির পেছনে প্রেতাত্মায় বিশ্বাসের ব্যাপারটি কাজ করেছে। মনে করা হয় প্রেতাত্মা ছায়ার মাধ্যমে কারোর শরীরে ঢুকে যেতে পারে। কোন বস্তু কোন আলোর উৎসকে আড়াল করলে উল্টো দিকে আলোর তীব্রতা অনেক কমে যাওয়ার ফলে কালো ছায়া পড়ে। ভূত-প্রেতকে কালো কালো দেখতে—এই ভাবে কল্পনা করা হয়। তাই কালোছায়ার সাথে তাদের সাদৃশ্য

টানা হয়েছে। অন্যদিকে একজন মানুষের তথাকথিত 'আত্মা' তো তার শরীরের মধ্যেই আছে—কিন্তু তার ছায়ায় নাকি থাকে এই 'আত্মার অনিষ্টকারী দিকটি'। এইভাবে নানা কল্পনা মিশিয়ে ছায়াকে অনিষ্টকারী কিছু বলে ধারণা করা হয়। ডিঙ্গোনর সময় এই ছায়াটি শরীরের উপর দিয়ে যায়, তাই এই ছায়ার মাধ্যমে প্রেতাত্মা শরীরে চলে আসতে পারে বলে কল্পনার সৃষ্টি। পরে এটি একটি সাধারণ সংস্কারে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু শুধুমাত্র ডিঙ্গোনর জন্য কারোর শরীর খারাপ হতে পারে না। তবে ডিঙ্গোনর সময় পায়ের ধূলো-নোংরা শরীরের উপর পড়তে পারে, পরনের কাপড় শুয়ে থাকা ব্যক্তির গায়ে লাগতে পারে বা জড়িয়ে যেতে পারে, নিদেনপক্ষে ওর গায়ে ঠোক্কর লাগতেই পারে—এই সব কারণে নোংরা পা নিয়ে, ঝুলে থাকা কাপড় পড়ে, অসতর্কভাবে কাউকে না ডিঙ্গোনই ভাল। আর এ ভাবে ডিঙ্গোনর সময় ঘুমন্ত বাচ্চার গায়ে পা বা কাপড় লেগে সে জেগে গিয়ে, যে চিল-চীৎকার শুরু করবে বা কর্মরতা মায়ের যে ঝামেলার সৃষ্টি করবে—তা এড়ানর কৌশলও বটে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা। তবে সাবধানে ডিঙ্গোলেও যাকে ডিঙ্গোন হচ্ছে তার অমঙ্গল হবে বা তার শরীর খারাপ করবে কিংবা তার উপর প্রেতাত্মার ভর হবে—এরকম ভাবাটা কোন যুক্তিবান ও বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। তবু কাউকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়াটা শোভনীয় নয়, সাধারণ সৌজন্যবোধের পরিচায়কও নয়।

এক চোখ দেখা বা হাতে লঙ্কা দেওয়া

এক চোখ দেখলে যে ঝগড়া হয়, এটা কেনা জানে! আপনার চোখ হয়তো করকর্ করছে, ঐ চোখটা চেপে ধরে বা রগড়াতে রগড়াতে কারোর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গেলেন। অমনি তিনি হাঁ-হাঁ করে উঠবেন, আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে দু' চোখ দেখাতেই হবে। আর উনি যদি মহিলা হন তো কথাই নেই। আরো বহু

সংস্কারের মত এধরনের সংস্কারও মেয়েদের মধ্যে বেশী—তার প্রধান কারণ পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তা ও শিক্ষার সুযোগ থেকে অনেক বেশি বঞ্চিত। যাই হোক, এক চোখ দেখার সাথে ঝগড়ার যে সম্পর্ক নেই, তা যে কেউ একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন, এমনকি মহিলারাও। তা না হলে ছোটবেলা থেকেই যাদের কোন কারণে একচোখ কানা তাদের সাথে সকলেরই ঝগড়া হয়ে যেত অর্থাৎ তাদের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই হত সমস্যা। একইভাবে হাতে লঙ্কা দিলেও নাকি ঝগড়া হয়, যেন লঙ্কার ঝাঁঝটা পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যেও চলে আসবে। আসলে লঙ্কার ভেতরে থাকা বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ (alkaloid)-এর জন্যই তার ঝাঁঝ হয়। লংকা হাতে দেওয়ার ফলে এটি গ্রহীতার স্নায়ুতন্ত্রে যায় না বা তাকে উত্তেজিত করে না যে ঝগড়া হবে। ঝগড়া হয় মতের অমিল, পারস্পরিক অপমান ইত্যাকার নানা ভাবে, যখন পারস্পরিক বোঝাপড়া ও হার্দ্য সম্পর্ক অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। যার সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে তার হাত পা নাড়া বা মুখের অঙ্গভঙ্গির দৃশ্য চোখের স্নায়ুর মাধ্যমে এবং তার তিতিবিরক্তিকর কথাবার্তা কানে শোনার স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে স্নায়বিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ফলে স্নায়ুতন্ত্রের জটিল নিয়ন্ত্রণে অঙ্গসঞ্চালন, স্বরযন্ত্রের উচ্চমাত্রায় স্বরসৃষ্টি, এ্যাড্রেনালিন নামক পদার্থের ক্ষরণ হয়ে হৃদপিণ্ডের দ্রুতগতি, ঘাম ইত্যাদি ঘটে অর্থাৎ ঝগড়ার আনুষঙ্গিক কার্য সাধিত হয়। অন্যান্য সমস্ত মানবিক আবেগের মত ক্রুদ্ধ হওয়া ও ঝগড়া করার ব্যাপারটিও এভাবে ঘটে স্নায়বিক কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ ও ফলাফলেই। এরসাথে এক চোখ দেখা, লংকা নেওয়া বা এই জাতীয় হাবিজাবির কোন সম্পর্ক নেই।

৩

শারীরিক নানা কারসাজি

শরীরের নানা অংশকে কাজে লাগিয়ে নানা ভেল্কি দেখান হয়, কখনো বা তথাকথিত মন্ত্র পড়ে ঐ অংশকে নাকি বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতাযুক্ত করে দিয়ে নানা কাজ করা হয়। আসলে দীর্ঘকালীন অভ্যাস বা ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের বিশেষ অংশের ক্ষমতা বা সামগ্রিকভাবে শারীরিক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলে বা অস্বাভাবিক করে তুলে নানা ধরনের চমকপ্রদ ঘটনা ঘটান যায় আর এসবকে অলৌকিক ক্ষমতা-প্রসূত বা ঈশ্বরের আশীর্বাদে সম্ভব হয়েছে বলে প্রচার করা হয়। কোন কোনটি আবার নিছকই ফাঁকি বা ধোঁকার ব্যাপার। প্রথমের দিকে এ সবের অনেকগুলি যাদুবিদ্যারই একটি অংশ ছিল, পরে তা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক রূপ পেয়েছে। এদের কয়েকটিকেই আলোচনা করা যাক।

নখদর্পণ

কোন বাচ্চা বা মহিলার বুড়ো আঙ্গুলের নখে তেল ও সিঁদুর (কোথাও বা কাজল) মিশিয়ে ঐ মিশ্রণকে চকচকে করে মাখিয়ে দেওয়া হয়; তারপর কোন ওঝা বা গুণিন ঐ নখে মন্ত্র পড়ে দেয়। এর ফলে নখের মালিক ঐ দর্পণ বা আয়নার মত চকচকে নখে অনেক কিছু নাকি দেখতে পায়। যেমন, কারোর বাড়ীতে হয়তো চুরি হয়েছে; তখন ঐ চোর ধরার জন্য এই নখদর্পণ করা হয়। এর ফলে নাকি কোন্ ব্যক্তি কিভাবে চুরি করে কোথায় পালাল তা নখে দেখতে পাওয়া যায় আর এভাবে চোর ধরা যায়। বাড়ীতে তথাকথিত ভূতের উৎপাত হলেও এইভাবে নখে ঐ অপদেবতাকে নাকি দেখা যায়। বলাবাহুল্য এইভাবে মন্ত্র পড়ে কাউকে সর্বদর্শী যেমন করে দেওয়া না, তেমনি নখের ভেতরও কিছু দেখতে পাওয়া

সম্ভব নয়—বড়জোর নিজের মুখ ও আশপাশের লোকজন-গাছ-পালার ছায়া ছাড়া !

নখদর্পণের জন্য বাচ্চা বা মহিলাকেই সাধারণতঃ বেছে নেওয়া হয়, তার কারণ কল্পনাপ্রবণতা এদের মধ্যে বেশীই থাকে এবং সহজে গুণিন তার কথাবার্তার সাহায্যে এদের প্রভাবিত করতে পারে, যা প্রায় সম্মোহন করারই সামিল। ফলে গুণিনের আকাঙ্খিত কথাবার্তা এরা বলে। গুণিনের সম্মোহনী কথাবর্তার সঙ্গে যার নখে নখদর্পণ করা হচ্ছে পুরো ব্যাপারটায় তার অন্ধবিশ্বাস, অনেকক্ষণ ধরে ঝুঁকে চকচকে নখের দিকে তাকিয়ে থাকা আর চারপাশে উদ্‌গ্রীব দর্শকদের ভীড়—সবমিলিয়ে সংশ্লিষ্ট বাচ্চা বা মহিলাটি গুণিনের আকাঙ্খিত উত্তরটি দেয় যেন প্রায় সম্মোহিত অবস্থায়।

অনেক সময়ই বাড়ীতে চুরি হলে বিশেষ কাউকে সন্দেহ করা হয়। কিন্তু প্রমাণাভাবে সরাসরি তাকে ধরা যায় না। তখন নখদর্পণ করলে, যার নখে এটি করা হচ্ছে তাকে আগে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলে সে ঐ সন্দেহভাজন ব্যক্তিটির কথাই বলে আর নখদর্পণে অন্ধবিশ্বাস থাকার কারণে এই সন্দেহভাজন ব্যক্তিটিও ভয়ে সবকিছু স্বীকার করে। ফলে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে ঐ ব্যক্তিকে দোষী করার ঝামেলা থেকে বাঁচা যায়। আবার নখদর্পণ যার নখে করা হচ্ছে সন্দেহভাজন ব্যক্তিটির প্রতি তার সন্দেহ থাকলে সে নিজেও বানিয়ে বানিয়ে বা প্রায় আবিষ্ট অবস্থায় তাকে নখের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে বলে বলতে পারে। অপদেবতা বা প্রেতাত্মায় অন্ধ বিশ্বাস থাকার কারণে সে নখে ভূতও দেখতে পারে। এটি দৃষ্টিবিভ্রম (illusion)-এর জন্যও ঘটে। চকচকে করে দেওয়া নখে নিজের ঝুঁকে পড়া মুখের ছায়া বা আশেপাশের গাছপালার ছায়া দেখে এই বিভ্রম হতে পারে। যে কেউই নিজের নখে এইভাবে তেল-সিঁদুরের মিশ্রণ মাখিয়ে নিয়ে দেখতে পারেন। দেখার ব্যাপারটি যেহেতু সম্পূর্ণ স্নায়ু নির্ভর ('কু-দৃষ্টি' অংশ দ্রষ্টব্য) তাই গুণিন মন্ত্র পড়ে কাউকে সর্বদর্শী করে দিতেও পারে না।

নখদর্পণের যে কয়েকটি ঘটনাকে আমার পক্ষে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়েছে তাতে এগুলি স্পষ্ট। মেদিনীপুরের এক গ্রামে একটি বাড়ীতে ভূতের তথাকথিত উৎপাতের জন্য বাড়ীর এক মহিলার নখে নখদর্পণ করা হয়। তিনি জানান, তিনি নখে তাঁর মৃতা বৌদির ছায়া দেখতে পাচ্ছেন, ইনিই উৎপাত করছেন। পরে জানা গেল বাড়ীর একটি ছেলেই সব উৎপাতের মূলে। ঐ ছেলেকে দূরে পাঠিয়ে দিতে সব উৎপাত বন্ধ হয়ে গেল। স্পষ্টতই ভূতের উৎপাত সম্পর্কে আরোপিত ধারণার জন্য ভদ্রমহিলার মতিভ্রম (hallucination) ঘটেছিল। অথবা তিনি ইচ্ছেকৃত ভাবে মিথ্যাকথা বলেছিলেন। দুর্গাপুরের এক ডাক্তারের স্ত্রী বলেছিলেন, ছোটবেলায় তাঁর নখে নখদর্পণ করা হলে তিনি সোনার বালা চুরি করা বাড়ীর এক আত্মীয়াকে ধরে দিয়েছিলেন। অনেক জিগ্যেস করায় জানা গেল, যে ঘরে বালিশের নীচে বালাটি ছিল ঐ ঘরে তিনি শুয়েছিলেন এবং ঘুমের ঘোরে তাঁর একবার মনেও হয়েছিল যেন আত্মীয়াটি ঘরে ঢুকলেন। যিনি নখদর্পণ করছিলেন তাঁকে কথাচ্ছলে ব্যাপারটি জানানর পর ঐ ভদ্রলোক তাঁকে বলেন যে, নখদর্পণে ঐ মহিলাকে তিনি অবশ্যই দেখতে পারেন। তারপর নখদর্পণ করা হলে তিনি বলেন যে, ঐ ভদ্রমহিলাকে দেখতে পাচ্ছেন।

নখের আলাদা বিশেষ কোন গুণও নেই যার ফলে এটি টেলিভিশনের মত কাজ করতে পারে। চুলের মত নখও আসলে চামড়ারই একটি পরিবর্তিত অংশ, নখের গোড়ার দিকের চামড়ার একটি অংশ (stratum lucidum) যথেষ্ট পুরু ও পরিবর্তিত হয়ে নখের সৃষ্টি করে। বিবর্তনের নির্দিষ্ট পর্যায়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এর সৃষ্টি। (মাঝে মাঝে নখে যে সাদা দাগ দেখা যায় তা আসলে নখের মধ্যে থেকে যাওয়া বাতাসের ছোট্ট বুদ্‌বুদের কারণে হয়। অনেকে এরও শুভাশুভ ব্যাখ্যা করেন—সেটিও ভুল।)

হাত চালা

কারোর কোন দামী জিনিস বা গরু-বাছুর হারিয়ে গেলে এ

পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। গ্রামের দিকে, নখদর্পণের মত এটি এখনো চালু আছে—আর শহরাঞ্চলে তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যেও যে একেবারে নেই তা বলা যায় না। এতে সাধারণতঃ কোন বাচ্চা ছেলেকে বিশেষভাবে উবু করে বসিয়ে তার হাতের চেটোর নীচে একটি বাটি রেখে গুণিন মন্ত্র পড়ে দেয়। এরপর নাকি হাত বাটিটি নিয়ে আপনাআপনি চলতে থাকে। যেদিকে যায় সেই দিকেই নাকি জিনিসটি রয়েছে বা ঐ দিকে গরুবাছুর চলে গেছে। বাটি দিয়ে করার জন্য অনেকে একে বাটিচালাও বলে, বাটির বদলে কুলো দিলে তা হয় কুলো চালা।

প্রকৃতপক্ষে এইভাবে মন্ত্রপড়ে দিলে অলৌকিকভাবে ও আপনা-আপনি হাতের সঞ্চালন হতে পারে না। হাতের ঐচ্ছিক মাংসপেশী-গুলির নির্দিষ্ট কয়েকটির সংকোচন-প্রসারণ না হলে হাত নড়তে পারে না, এটি আবার মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণে স্নায়ুর মাধ্যমে ঘটে। সাধারণতঃ আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী এটি সংঘটিত হয়; তবে কখনো কোন কারণে মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট অংশ বা স্নায়ু গুলি আপনা থেকেই উত্তেজিত হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাতের কিছু সঞ্চালন হতে পারে। হাত-চালার সময় যার হাত চালা হচ্ছে তাকে বিশেষ ভাবে উবু করে বসান হয়। পুরো পায়ের পাতায় তার শরীরের ভর থাকে না। এর সাথে হাতের অবস্থানও এমন থাকে যাতে ঐ হাতের নীচে থাকা বাটির উপর বাধ্য হয়েই সামান্য ভর দিতে হয় এবং এর ফলে বাটিটি সরে যেতে থেকে, আর একবার নড়লে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিও নড়তে থাকেন। তিনি যে ইচ্ছে করেই এটি করছেন সে সম্পর্কে তার সচেতনতা প্রায় থাকে না, তার প্রধান কারণ এভাবে মন্ত্র পড়ে হাত চালা যায়—এ সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আগে থেকেই আছে। এছাড়া উবু করে বসিয়ে দীর্ঘক্ষণ মন্ত্রপড়া, চারপাশে উদ্‌গ্রীব মানুষের ভীড়—সবমিলিয়ে একটি সম্মোহনের মত বা আধাঘুম-আধাজাগরণের মত অবস্থা হয়। আবার অনেক সময়, জিনিষ হারানর সব ব্যাপারটি শুনে কে লুকোতে বা নিতে পারে সে সম্পর্কে একটি অনুমান

করে গুণিন ঐ বাচ্চা বা ব্যক্তিকেই হাতচালার জন্য মনোনীত করে। হাতচালার অলৌকিক ক্ষমতায় আস্থা ও ভীতির কারণে সে তখন সচেতন বা অবচেতনভাবে যেখানে জিনিষটি রেখেছে ঐদিকে বাটি চালায়। জিনিষটি পাওয়া যায়। এইভাবে এক-আধটা সাফল্যের জন্য পুরো ব্যাপারটির প্রতি একটি ব্যাপক আস্থা গড়ে ওঠে—কারণ রহস্যময় কোন কিছুর প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ থাকে তীব্র।

হাতচেলে সাপের বিষও নাকি নামান যায়। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি বিশ্বাস। এর জন্য বাংলাদেশে প্রচলিত একটি মন্ত্র এইরকম—

হাত চালান্, হাত চালান
আতালে পাতালে বাঁশরী চালান
চল্ হাত চল্
যেখানে বিষ থাকে সেখানে চল
বিষ থুয়ে এদিক ওদিক যাস্
ঈশ্বর মহাদেবের জটা খাস্
ভূমস্তকে খসে পড়ে।

অনেকে মহাদেবের পরিবর্তে সর্পদেবী মনসার নাম করেন। যাই হোক, এইভাবে কোন মন্ত্র পড়ে সাপে কামড়ান রোগীর 'বিষ নামান'-র চেষ্টা খুবই বিপজ্জনক। সব সাপের বিষ থাকে না, যেমন ছুঁয়ে সাপ, হেলে, ঢোঁড়া, ময়াল বা অজগর, বেত আছড়া, ঢ্যামনা বা দাঁড়াশ, ঘরচিতি ইত্যাদি সাপের। তেমনি গোখরো, শঙ্খচূড়, চন্দ্রবোড়া, কালাচ, শাঁখামুটি, গেছো বোড়া ইত্যাদির বিষ অতি তীব্র। আর লাউডগা, কালনাগিনী, মেটেলি ইত্যাদি ক্ষীণ বিষ সাপ। কোন কোন সাপের বিষ স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করে, কোনটি করে রক্তের উপর—রক্তের লোহিত কণিকাকে ভেঙ্গে দেয়। সাপের বিষ তাড়াতাড়ি রক্তের মধ্যে মিশে গিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তাই এর চিকিৎসায় প্রথম দরকার, কামড়ানোর জায়গার ওপরটি খুব শক্ত না করে, বেঁধে দেওয়া—তবে দেড় ঘণ্টার

বেশী নয়। স্থানীয় জায়গাটি পরিষ্কার করা দরকার আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্যান্য আনুষঙ্গিক চিকিৎসার সাথে সাথে এ্যান্টি-ভেনম সিরাম **(AVS)** উপযুক্ত সাবধানতা নিয়ে ইনজেকশান করা প্রয়োজন—এটি রক্তের মধ্যে মিশে যায় এবং সাপের বিষকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। স্পষ্টতঃই রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে অর্থাৎ হাত চেলে রক্তের মধ্যে মিশে যাওয়া বিষকে দূর করার চেষ্টা নিরর্থক। এতে সময় নষ্ট ও রোগীর প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনাই বেশী থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই যা হয়, বিষধর সাপ কাউকে কামড়েছে কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ বিষ ঢালতে পারেনি, কিংবা নির্বিষ সাপ কাউকে কামড়ালেও—ব্যক্তিটি ভয়েই আধমরা হয়ে যায়। একমাত্র এক্ষেত্রেই যদি ঐ ব্যক্তিটি 'হাত চালা'য় গভীর বিশ্বাস করে, তবে তাকে এর সাহায্যে আশ্বস্ত করে সুস্থ করে তোলা যায়, কারণ সাপে কামড়ানোর ভয় এমনই যে, বিষ শরীরে না গেলেও শুধু ভয়েই মারা গেছে—এ রকম উদাহরণের অভাব নেই। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হল সাপটি বিষযুক্ত কি নির্বিষ তা নির্ধারিত করা এবং নির্বিষ সাপ হলে রোগীকে ব্যাপারটি ভাল করে বুঝিয়ে বলা। যদি ধরা যায় প্রতি দশটি সাপে কামড়ানো রোগীর ক্ষেত্রে ৫ জনকে বিষাক্ত সাপে কামড়েছে বা তাদের শরীরে বিষ ঢুকেছে আর ৫ জনের শরীরে বিষ যায় নি বা বিষাক্ত সাপ কামড়ায়নি তবে; সকলের উপরই হাত চালা প্রয়োগ করলে বিষহীন ৫ জন সুস্থ হয়ে যেতেই পারে—অথচ এই ৫ জনের অনেকেই হয়তো ভয়েই অজ্ঞান হয়ে, মুখ থেকে গ্যাঁজলা বার করে, আছাড়িপিছাড়ি খেয়ে এমন অবস্থা করছিল যেন এক্ষুণি মারা যাবে বা খুব সাংঘাতিক একটা ব্যাপার। শুধু হাতচালার মানসিক আশ্বাসের দরুন এ ধরনের 'রোগীও' ভাল হলে স্বাভাবিকভাবে হাতচালার ও মন্ত্রের মাহাত্ম্য বাড়ে। বাকী ৫ জন রোগী যদি মারাও যায় তাহলেও অন্ধবিশ্বাসীরা প্রচার করবে—মন্ত্র বা হাতচালায় কাজ নিশ্চয়ই হয়, নাহলে বাকীরাই বা বাঁচল কি করে! জ্যোতিষীর সাফল্য, ঈশ্বর বা দেবদেবী আরাধনার ফল,

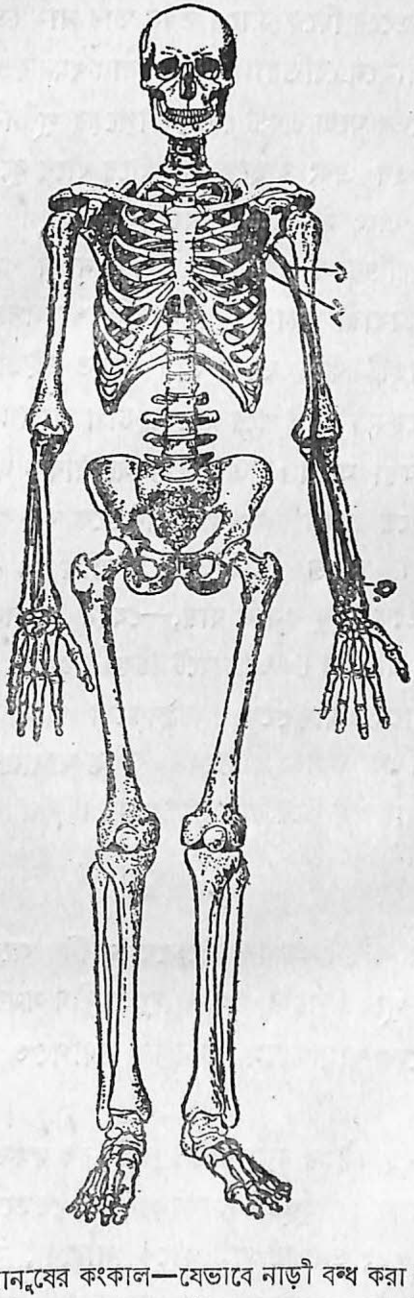
মাদুলি, আর্শীবাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এইভাবেই এদের মাহাত্ম্য বাড়ে।

নাড়ী বন্ধ করা

অলৌকিক ক্ষমতাবলে সাধু-সন্ন্যাসী বা গুণিন ওঝারা নিজের নাড়ী বন্ধ করে দিতে পারে বলে বিশ্বাস। কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে, চোখ বন্ধ করে ও গম্ভীর মুখ নিয়ে এমনভাবে এটি করা হয় যে উপস্থিত ভক্তরা ভয়ে-শ্রদ্ধায় হতবাক হয়ে যায়,—হাতের কব্জিতে নাড়ী আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল, আবার তাঁর নিজেরই ইচ্ছায় অর্থাৎ 'অলৌকিক শক্তির উপর অসাধারণ নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতায়' নিজের নাড়ী তিনি ফিরিয়ে আনলেন।

ব্যাপারটি নিছকই একটি ধোঁকার ব্যাপার। আমাদের হৃদপিণ্ড স্বাভাবিকভাবে প্রতি মিনিটে ৬০-৭০ বার সংকুচিত-প্রসারিত হয়। এই সংকোচনের সময় রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে ধমনী artery দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এই রক্তের মাধ্যমেই শরীরের প্রতিটি জীবিত কোষ পুষ্টি, অক্সিজেন ইত্যাদি পায় এবং দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। কোন জীবিত কোষ-ই রক্ত ছাড়া বড়জোর ৫ মিনিটের বেশী বেঁচে থাকতে পারে না; তাই হৃদপিণ্ড কয়েক মিনিট সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলেই দেহকোষের মৃত্যু ঘটতে শুরু করে। ধমনীগুলিও হৃদপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণের তালে তালে প্রসারিত-সংকুচিত হয়। শরীরের বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে হৃদপিণ্ডের সঙ্গে তাল রেখে ধমনীর এই প্রসারণ-সংকোচনকে আঙ্গুল দিয়ে অনুভব করা হয়—এটিই নাড়ী (pulse) এবং এর থেকে হৃদপিণ্ডের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করাও যায়। সাধারণতঃ কব্জির ঠিক ওপরে, বাইরের দিকে রেডিয়াস হাড়ের উপরে ও চামড়ার ঠিক নীচে থাকা রেডিয়াল ধমনী (Radial artery)-টি এই নাড়ী দেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি আবার ব্রেকিয়েল ধমনীর একটি ভাগ। হৃদপিণ্ড থেকে বেরিয়ে রক্ত সাবক্লেভিয়ান ধমনী হয়ে হাতের দিকে আসে।

বগলের গর্তের নিচে এর নাম এক্সিলারী ধমনী—এটিই যখন নীচে



মানুষের কংকাল—যেভাবে নাড়ী বন্ধ করা যায়

১—ব্রেকিয়াল ধমনী ; ২—বগলের এই জায়গায় কাপড়ের পঁটলি ইত্যাদি রেখে চাপ দিলে ব্রেকিয়াল ধমনী তথা নাড়ী বন্ধ হয় ; ৩—এইখানে নাড়ী দেখা হয়।

নেমে বাহুর ভেতরের দিকে আসে তখন তার নাম ব্রেকিয়াল ধমনী। এটি কনুই-এর সামনে রেডিয়াল ও আলনার ধমনীতে বিভক্ত হয়।

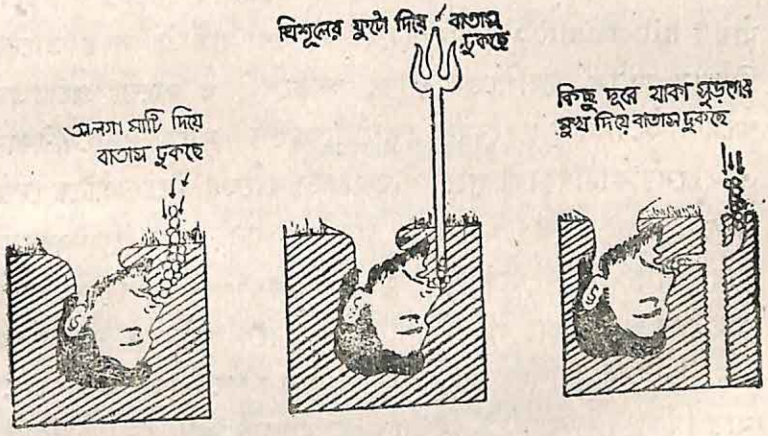
বগলের গর্তের মধ্যে একটি ছোট্ট কাপড়ের পুঁটলি বা নুড়ি যদি লুকিয়ে রাখা হয় এবং বাহুকে যদি ধীরে ধীরে বুকের পাশে চেপে ধরা হয় তবে এক সময় এই চাপে ব্রেকিয়েল ধমনী বন্ধ হয়ে যাবে—ফলে রেডিয়াল ধমনীতেও আর নাড়ী পাওয়া যাবে না। শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত জটাধারী কোন ব্যক্তি যদি খালিগায়ে বা উত্তরীয় জড়িয়ে এ কাজটি করে তবে তার হাতে এইভাবে নাড়ী পাওয়া যাবে না। কয়েক মিনিট পরে হাতের চাপ আলগা করলে আবার নাড়ী অনুভব করা যাবে। এর মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতায় নাড়ী বন্ধ করা বা ফিরিয়ে আনার অথবা হৃদপিণ্ডকে বন্ধ করে রাখার কোন ব্যাপার নেই। অবশ্য দীর্ঘকালীন অভ্যাস ও ব্যায়ামের ফলে হৃদপিণ্ডের গতিকে কিছু কমান যায়,—যেমন বাড়ানও যায়,—কিন্তু বন্ধ করে রাখা যায় না। এটি ঘটে চিন্তা করার (অর্থাৎ মস্তিষ্কেরই ক্রিয়ার) সাহায্যে হৃদপিণ্ডকে নিয়ন্ত্রণকারী অনৈচ্ছিক স্নায়ুগুলিকে কিছুটা প্রভাবিত করার মাধ্যমে। কিন্তু স্বয়ংক্রিয় এই সব স্নায়ুর কাজকে একেবার বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়।

ভূ-সমাধি

অলৌকিক শক্তির প্রকাশ হিসেবে নাকি অনেক সাধু সন্ন্যাসী মাটির নীচে পুরো শরীর অথবা মুণ্ডুটা দীর্ঘ সময় ঢুকিয়ে রাখেন। এই সময় তাঁদের শ্বাসপ্রশ্বাস, এমন কি হৃদপিণ্ডও বন্ধ থাকে বলে বিশ্বাস।

আসলে এই কষ্টকর ব্যাপারটিও শারীরিক দক্ষতা ও কারসাজিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মুণ্ডুটা ঢোকানর সময় ভেতরের গর্তটি বেশ বড় করে করা হয় এবং ওপরের মাটি থাকে আলগা, যাতে ফাঁক দিয়ে হাওয়া যেতে পারে। নাকে যাতে ধূলোবালি না ঢুকে যায় তার জন্য পাতলা কাপড়ের টুকরো দিয়ে অনেক সময় নাকটা ঢেকেও

রাখা হয়। মাটির ফাঁক দিয়ে বায়ু চলাচল হয় অনায়াসেই। মাটির নীচে থাকার সময়ও এই ধরনের নানা কৌশল করা হয়—কখনো বা সরু নল দিয়ে সবার অলক্ষ্যে বাহিরের সাথে যোগাযোগও রাখা হয়। গাজনের মেলায় সন্ন্যাসীরা এই খেলা দেখানর সময় পাশে একটি ত্রিশূল পুঁতে রাখে। এই ত্রিশূলের ভেতরটা যদি ফাঁপা হয় তবে অনায়াসেই তা একটি নলের কাজ করে সবার অলক্ষ্যে। অনেক সময় কিছু দূরে একটি সুড়ঙ্গের মত করে তার মাধ্যমেও বাতাসের চলাচল করান যায়। সুড়ঙ্গের মুখটি লাল কাপড় দিয়ে বন্ধ করে দিলে দর্শকের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। সঙ্গের ছবিটি দেখলে ব্যাপারটি কিছু পরিষ্কার হবে। অনেক ম্যাজিসিয়ানও



ভূ-সমাধির নানা কৌশল

এইভাবে দীর্ঘ সময় জল বা মাটির নীচে থাকেন—তাঁরা অবশ্যি এটাকে খেলা বা কারসাজি হিসেবেই বলেন, কোন অলৌকিক শক্তির পরিচয় হিসেবে জাহির করেন না। যেমন আমেরিকার বিখ্যাত ম্যাজিসিয়ান হুডিনী (১৮৭৪—১৯২৬) এই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা, মাটির ৬ ফুট নীচে একটি কফিনে থাকতে পারতেন। পরে ফরাসী সাংবাদিক পল হিউজ কফিনে আবদ্ধ থেকে ৮৫ মিনিট জলের তলায় ছিলেন। এঁরা সবাই স্বীকার করেছেন, দীর্ঘকাল

অভ্যাস করে, কফিনের বাতাস কম খরচ করে তাঁরা কষ্টকর এই ব্যাপারটি করতে সক্ষম হয়েছেন।

যারা দাবী করে যে তারা নিজেদের অলৌকিক শক্তি-বলে একাজ করছে, মাটির ওপরে কোন চালাকি করার সুযোগ থাকবে না এ রকম অবস্থায় তাদের নাকে শক্ত করে, বায়ুনিরুদ্ধ ভাবে কাপড় জড়িয়ে দিলেই তাদের চালাকি প্রমাণ হয়ে যাবে। তবে দীর্ঘকাল অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করে, কষ্টকর অনুশীলনের মাধ্যমে শরীরের অক্সিজেন তথা বাতাস ও খাদ্যের প্রয়োজনকে অস্বাভাবিক-ভাবে কমিয়ে দেওয়া সম্ভব। যে সব জীবজন্তুরা (ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি) শীতকালে-মাটি বা বরফের নীচে দীর্ঘ সময়ের জন্য চলে যায় (hibernation) তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ঐ সময় তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদপিণ্ডের কাজ, অক্সিজেন ও খাদ্যের প্রয়োজন অনেক কমে যায়। যেমন স্পার্মোংকাইল নামে আমেরিকার একধরনের কাঠবিড়ালী পুরো শীতকালটা বরফের নীচে কাটিয়ে দেয়, শুকনো পাতা-খড়ের বিছানায় শুয়ে। তখন এদের হৃদস্পন্দনের হার প্রতিমিনিটে স্বাভাবিক ২০০ থেকে ৪—৫-এ দাঁড়ায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার দাঁড়ায় প্রতিমিনিটে ১৮০-থেকে কমে ৪ বা তারো কম, শরীরের তাপমাত্রাও ১০০° F থেকে কমে ৫৫—৬০° F হয়ে যায়। কিছু জলচর প্রাণী এইভাবে গ্রীষ্মযাপনও করে (estivation)। তথাকথিত হঠযোগীরা ও ম্যাজিসিয়ানরা দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টার পর একই ধরনের ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারেন। কিন্তু এগুলির মধ্যে কোন ধরনের মন্ত্রতন্ত্র, অলৌকিক বা ঐশ্বরিক শক্তি কিছু নেই—যা হয় তা নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় নিয়মেই হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ ব্যক্তির প্রশংসনীয় বাস্তব দক্ষতারই প্রকাশ।

নিউদিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব্ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর বিজ্ঞানী বি. কে. আনন্দ ও তাঁর সহযোগীরা অন্ধ্রপ্রদেশের রামানন্দ যোগীর উপর কিছু গবেষণা চালান। এই যোগী বায়ুরুদ্ধ বাক্সের মধ্যে ৮-১০ ঘণ্টা কাটান। দেখা যায় বদ্ধ বাতাসে

কার্বনডাই অক্সাইডের মাত্রা বাড়তে থাকলে অক্সিজেনের চাহিদাও কমতে থাকে। সাধারণ একজন ব্যক্তি বেশীক্ষণ উচ্চ মাত্রার কার্বন ডাই অক্সাইডের মধ্যে থাকলে তাঁর স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হওয়া ও অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে উপযুক্ত ব্যায়াম ও যোগাভ্যাস, শ্বাস নিয়ন্ত্রণের পূর্ব প্রস্তুতির ফলে কার্বন-ডাই অক্সাইডের উচ্চমাত্রার প্রতি সহনশীলতা অর্জন করা যায়। বিশেষতঃ দীর্ঘক্ষণ মাটির নীচে বা বায়ুরুদ্ধ বাক্সে থাকার জন্য এটি প্রয়োজনীয়—যেমন স্বামী সত্যমূর্তি, ১৯৮১ সালের নভেম্বরে বোম্বাই-এর এক চিত্রতারকার বাড়ীর উঠোনে মাটির নীচে নাকি ৬ দিনেরও বেশী সময় ছিলেন। কিন্তু এ ধরনের স্বামী, বাবাজি, যোগীরা ব্যাপারটিকে নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবেই সাধারণ মানুষকে বোঝান।

আগুন-খাওয়া

জ্বলন্ত কর্পূর 'অলৌকিক শক্তিবলে' জিভের ওপর রেখে অনেকে ভক্তদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। জ্বলন্ত কর্পূরের লকলকে শিখাকে মুখের মধ্যে ধারণ করার কথা সাধারণ মানুষ ভাবতেই পার না। এবং ব্যাপারটি যদিও অলৌকিক শক্তিবলে ঘটে না, তবে যথেষ্ট সাহস, ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার পরিচয়। কর্পূর প্রচণ্ড উদ্বায়ী (volatile) জিনিষ। তাই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এটি জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়। এই কয়েক মুহূর্তের জন্য মুখ দিয়ে ক্রমাগত হাওয়া বাইরের দিকে ফুঁ দিয়ে যেতে হয়—যাতে জ্বলন্ত কর্পূরের সামান্য অংশও গলার দিকে না ঢোকে,—যদি এটি ঘটে তবে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। আর কর্পূর জিভে নেওয়ার আগে জিভ ও ঠোঁট ভাল করে লালা দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়। এর ফলে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য অতিরিক্ত তাপ অনুভব করা যায় না। ব্যাপারটি দীর্ঘদিন ধরে অভ্যাস করলে অনায়াসে দেখান যায়। সার্কাসে দুরূহ অনেক ব্যালেন্সের খেলা যেমন দীর্ঘকালীন

অনুশীলনের ফল, একইভাবে আগুন খাওয়ার মত এই ধরনের ঘটনাও অস্বাভাবিক দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ—কিন্তু অস্তিত্বহীন 'অলৌকিক শক্তির' পরিচয় আদৌ নয়। অনেকে আবার জ্বলন্ত কর্পূরের পবিবর্তে জিভে জ্বলন্ত কাঠকয়লাও কয়েক সেকেণ্ড ধরে রাখে বা গরম লাল লোহা দিয়ে জিভে ছেঁকা দেয়, গলন্ত সীসা ফোঁটা ফোঁটা জিভের ওপর ফেলে। এসব ক্ষেত্রেও থাকে কিছু কারসাজি, যেমন, ফটকিরি মেশান জলে ভাল করে কুলকুচি করে নিলে জিভের ওপর তাপ অনুভব অনেক কম হবে। সাথে জিভে কিছু চিনির গুঁড়ো লাগিয়ে নিলে ফল আরো ভাল হয়।

আগুনের উপর হাঁটা

কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে এই চমকপদ ব্যাপারটি দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় যোগী-ঋষিদের অত্যদ্ভুত অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ বলে প্রচারিত রয়েছে। চড়ক বা অন্যান্য নানা ধর্মীয় মেলায় 'ঠাকুরের আশীর্বাদে' অনেক ভক্ত বা সেবাইতরা এ খেলা দেখায় এবং ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য প্রচার করে। অনেকে আবার এ ধরনের খেলা দেখিয়ে দু'পয়সা উপার্জনও করে। এদের মধ্যে ভারতের খোদাবক্স ও আহমেদ হোসেন নামে দু'জন একসময় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। ১৯৩৫ ও ১৯৩৭ সালে লণ্ডনের University of London Council for Psychical Investigations নামক সংস্থাটি এদের উপর গবেষণা চালায়। ভারতের হায়দ্রাবাদ গান্ধী মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ শংকর রাও সহ আরো অনেকেই এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করেন। অবশ্য শুধু ভারতবর্ষে নয়। ব্যাপারটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ধর্মানুষ্ঠানেও করা হয়। ১৩. ৩. ৮০-এর স্টেটসম্যানে জাপানের টোকিও শহরের কাছাকাছি এক বৌদ্ধমন্দির প্রাঙ্গনে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কিভাবে আগুনের উপর হেঁটেছিলেন তার বর্ণনা বেরিয়েছিল। ভক্তদের মতে তাঁরা কোন যন্ত্রণা অনুভব করেন না কারণ তাঁরা জাগতিক চিন্তা থেকে মুক্ত

থাকেন। বুলগেরিয়ার বার্গাস বন্দরের কাছে একটি গ্রামে প্রতি বছর ৩রা জুন বিখ্যাত ধর্মীয় অগ্নিউৎসব হয়—এতে ধর্মান্ধরা নাচতে নাচতে আগুনের উপর দিয়ে চলে যান।

ব্যাপারটিকে নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেভাবে করা হয় ঐভাবে একটি আয়তাকার নীচু জায়গাকে কাঠকয়লা ইত্যাদির গনগনে আগুনে ভর্তি করা হয়। তার তাপমাত্রা হয় কয়েক শ' ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ ফুটন্ত জলের তাপমাত্রার কয়েকগুণ বেশী। সাধারণ মানুষের পক্ষে এর উপর হাঁটা একটি অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু খোদাবক্সের মত ব্যক্তিরা এই আগুনের উপর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে চলে গেল—ফোসকা পড়ল না, কোন কষ্টও হল না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে অনুশীলনের পর দ্রুত গতিতে হেঁটে যাওয়ার ফলে পায়ের পাতাটি মাত্র ০·৩-০·৫ সেকেণ্ড আগুনের সংস্পর্শে আসে। এত কম সময় আগুনের সংস্পর্শে আসার ফলে ফোস্কা পড়ার কথা নয়। তাপমাত্রাও এমন কিছু বাড়ে না। থার্মোকাপ্‌ল যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পায়ের পাতার তাপমাত্রা বাড়ে মাত্র ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অথচ ফোস্কা পড়ার জন্য চামড়ার নীচের অংশ ও কলা (tissue)-র তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রির বিশেষ (critical) মাত্রায় পৌঁছনো দরকার। একই ভাবে হুঁকোর তামাকে আগুন দেওয়ার সময়, বা রান্নাঘরে অনেক মহিলাও, জ্বলন্ত কাঠকয়লার টুকরো হাতের চেটোয় নাচিয়ে নাচিয়ে তুলে নেন—ফোস্কা পড়ে না। আর হাতের বা পায়ের চেটোর শক্ত চামড়াও এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যারা বহুবার আগুনের ওপর হাঁটে তাদের পায়ের পাতা এমনিতেই অনেক মোটা হয়ে হয়ে যায়। এছাড়া ধর্মীয় মেলায় ভক্তরা স্নান করে পূজো দিয়ে আগুনে হাঁটে। এ ক্ষেত্রে পায়ের তলায় লেগে থাকা জলে ভেজা কাদামাটি, পরনের ভেজা কাপড় থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়া জল, উপবাসের ফলে শরীরের হাল্কা ওজন ইত্যাদিও অতিরিক্ত সুবিধা এনে দেয়। এছাড়া কিছু কিছু

রাসায়নিক পদার্থ, গাছগাছড়ার রস মাখিয়ে নিলেও শরীরে তাপ কম লাগে। এই সব পদার্থের মধ্যে ঘৃতকুমারীর ডাঁটার রস উল্লেখযোগ্য। এতে আছে aloin, resin, uronic acid, crysophanic acid ইত্যাদি। এটি পায়ের পাতায় মাখিয়ে নিলে আগুনের ওপর অনায়াসে হাঁটা যায় ও হাতের পাতায় মাখিয়ে জ্বলন্ত কাঠকয়লার টুকরোও ধরে রাখা যায়। ভারতীয় পুরাণেও এই ধরনের নানা পদার্থের কথা বলা হয়েছে। যেমন গরুড় পুরাণে আছে বেলগাছের শিকড় ও পাতার রসের সাথে জোঁক বেটে অথবা শিমূল মূলের রসের সাথে গাধার প্রস্রাব মিশিয়ে, যে তরল পদার্থ তৈরী হয় তা চামড়ায় লাগালে নাকি তাপ লাগে না। এগুলি পরীক্ষিত ও কার্যকরী কিনা জানা নেই। তবে এটি সত্য যে, ফটকরি (alum) মেশান জলে হাত-পা ধুয়ে তাতে সাবান মাখিয়ে পরিষ্কার নেকড়া দিয়ে মুছে নিলেও হাতে-পায়ে তাপ লাগে না।

এই সব কারণেই নাস্তিক বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, যে কোন ব্যক্তিই, কিছুদিন অভ্যাসের পর, সাহস নিয়ে, আগুনের ওপর হেঁটে যেতে সক্ষম হবেন। এতে 'আধ্যাত্মিক-অলৌকিক বা দেবমাহাত্ম্যের' ব্যাপার কিছু নেই, মূলতঃ রয়েছে দ্রুত হেঁটে যাওয়া ও সাহসের ব্যাপার।

অজানা ভাষায় কথা বলা

অনেকে এ ধরনের দাবী করে যে, ধ্যান বা অন্য ধরনের কোন আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অজানা কোন ভাষা সে আয়ত্ত করেছে অথবা পৃথিবীর যে কোন ভাষাই সে বলতে পারে। প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত কারোর পক্ষেই এভাবে রাতারাতি সম্পূর্ণ অজানা একটি ভাষা আয়ত্ত করা (বা সম্পূর্ণ অজানা কোন তথ্য জানা অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হওয়া) অসম্ভব।

ভাষা আসলে আমাদের ভাবপ্রকাশের একটি মাধ্যম। মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে আমাদের গলার ওপরের দিকে অবস্থিত

স্বরযন্ত্র (vocal cord)-এর বিভিন্ন ধরনের বিশেষ কম্পনে বিশেষ বিশেষ শব্দ সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এই ধরনের শব্দের নানা ধরনের প্রতীকী অর্থ ঠিক করে নিয়েছে। এবং সেটিই তার ভাষা। ছোটবেলা থেকে অথবা বয়স্ক অবস্থায়, একটি ভাষার অন্তর্গত অজস্র শব্দের প্রতীকী অর্থ আয়ত্ত না করতে পারলে সেই ভাষা জানা সম্ভব নয়। কেউ তার স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ ক্ষমতায় কম সময়ে এটি আয়ত্ত করতে পারে কিন্তু ঐ ভাষা না শুনে ও না শিখে তার পক্ষে ঐ ভাষায় কথা বলা সম্ভব নয়। কোন কথা শোনার পর সেই অনুভূতি মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রের মাধ্যমে গৃহীত হয় এবং চোখে দেখা, অনুভব করা ইত্যাদি অন্যান্য অনুভূতির সাহায্যে তাকে বিশেষ কিছুর সাথে যুক্ত করা হয়। যেমন বাংলা ভাষার 'কলম' বা ইংরেজিতে 'pen'-এর সাথে বিশেষ দেখতে ও বিশেষ কাজের বস্তুটিকে সংশ্লিষ্ট করা হয়। সাথে সাথে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের নিয়ন্ত্রণে ঠোঁট, জিভ, ল্যারিংক্স, ফ্যারিংক্স্, তথা শ্বাসতন্ত্র ইত্যাদির সুসম্পর্কযুক্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ ধরনের কথা উচ্চারণ করার চেষ্টা করা হয়। এবং ঐ কথা অবশ্যই পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অর্থবহ হতে হয়। তাই ভূত বা ঠাকুরের ভর হয়ে অথবা তথাকথিত ধ্যান ইত্যাদির পর কেউ কেউ যে হঠাৎ, দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলতে থাকে এবং দাবী করে যে সে পূর্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অমুক একটি ভাষা বলছে—এই ব্যাপারটিকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তার কথাগুলি আদৌ কোন নতুন ভাষা নয়—অর্থহীন কিছু শব্দসমষ্টি মাত্র। এ অবস্থাকে বলা হয় glossolalia, অলৌকিকত্ব নয়। অনেক সময় একদা শোনা কোন ভাষা (বা তথ্য) স্মৃতিতে থেকে যায়, কিন্তু সাধারণভাবে মনে থাকে না। বিশেষভাবে আবিষ্ট অবস্থায়, আপাতভাবে ভুলে যাওয়া ঐ ভাষা (বা তথ্য) কেউ বলে চমক লাগাতে পারে।

(৫ম অধ্যায়ে 'ভূতে পাওয়া না হিস্টেরিয়া' আংশটি দ্রষ্টব্য।)

শরীরে পেরেক বিঁধিয়ে ঝোলা

ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর অনেক দেশেই চড়ক, গাজন, ভৈরবের মেলা বা এই ধরনের নানা ধর্মানুষ্ঠানে ভক্তরা পায়ের পাতায় বা পিঠের চামড়ায় বাঁকান পেরেক বিঁধিয়ে মাটিতে পোঁতা বাঁশ বা কাঠের দণ্ডের ওপর থেকে শূন্যে ঝোলে। কখনো বা এ ঝুলন্ত অবস্থায় ঘুরপাকও খায়। মহাভারতের বাণ রাজা মহাদেবের অনুগ্রহ লাভের জন্য শারীরিক নানা আত্মনির্যাতন করে মহাদেবের করুণা লাভের চেষ্টা করেছিলেন। হয়তো ওরই ধারাবাহিকতায় এ ধরনের ধর্মীয় আচারের সৃষ্টি। আবার পৃথিবীর বহু দেশেই এই ধরনের ধর্মীয় আত্মনির্যাতনের প্রথা চালু রয়েছে। কোথাও কোথাও এ অনুষ্ঠানকে কাবাডি (Kabadi) বলা হয়। পুরো ব্যাপারটিকেই দেবমাহাত্ম্য বলে ধরা হয়। যুক্তি হিসেবে তথাকথিত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বলেন যে, এটি যদি অলৌকিক ক্ষমতাপ্রসূত, দেবতার আশীর্বাদে না হত তাহলে এইভাবে পেরেক বিঁধিয়ে ঝোলার ফলে, শরীরের ভারে চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে, আসার ও প্রচুর রক্তপাত হওয়ার কথা, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় শক (shock) হয়ে মারা যাওয়ার কথা, টিটেনাস-গ্যাসগ্যাংরিন বা অন্য ধরনের জীবাণু আক্রমণে ঘা হওয়া বা রক্তদূষণ হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মারা যাওয়ার কথা ইত্যাদি। আপাতদৃষ্টিতে এসবগুলিই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচারবিশ্লেষণ করলে এসবগুলি না হওয়ার পেছনে বাস্তব কারণই খুঁজে পাওয়া যাবে।

যারা এইভাবে পেরেক বিঁধিয়ে ঝোলে তারা সবসময়ই একাধিক পেরেক শরীরে বেঁধায়। একটি স্প্রিং ব্যালেন্স থেকে একটি ১০ কে.জি. ওজন ঝোলালে স্প্রিং ব্যালেন্সে ১০ কে. জি. ওজনই উঠবে, দুটি থকে ঝোলালে প্রতিটিতে উঠবে ৫কে. জি. করে—অর্থাৎ এইভাবে ওজনটি ভাগ হয়ে যায়। একধভাবে গায়ে ৬টি পেরেক বিঁধিয়ে ঝুললে, যদি ব্যক্তিটির ওজন হয় ৫০ কে. জি. তবে প্রতিটি পেরেকের

জায়গায় উর্দ্ধমুখী চাপ পড়বে মাত্র প্রায় ৮ কেজির। এই চাপে চামড়া ও তার তলাকার কলা (tissue) ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা নয়। এ ছাড়া দীর্ঘদিন অভ্যাসের ফলে স্থানীয় চামড়া ও কলা শক্ত হয়ে যায় (fibrosed)—এটিও অতিরিক্ত সুবিধা এনে দেয়। আর পেরেকের উপর ঝুলন্ত শরীরের নিম্নমুখী চাপের দরুন, পেরেক উপরের দিক চাপ দেয়—এর ফলে এর ওপরের রক্তবহা নালীগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এই সহজ কারণেই অতিরিক্ত রক্তপাত হয় না। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির যদি রক্ত জমাট বাঁধার রোগ থাকে তবে অতিরিক্ত রক্তপাত হয়ে বিপদ ডেকে আনতে পারে।

ব্যথা অনুভবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হল,—ব্যথার অনুভূতি সম্পূর্ণই একটি ব্যক্তিগত (subjective) ব্যাপার। একই মাত্রার ব্যথা বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে অনুভব করতে পারেন। একজন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তেজনায়, শরীরে গুলির আঘাত নিয়েও যুদ্ধ করতে পারেন, আবার তিনিই শান্ত পরিবেশে হাসপাতালে ইনজেকশনের সামান্য ব্যাথায় অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন (vaso vagal attack)। একইভাবে শরীরে পেরেক বেঁধানর ব্যথা সাধারণ একজন মানুষ শান্ত-পরিবেশে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বলে ভয় করতে পারেন। কিন্তু একজন অন্ধবিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি কৃচ্ছ্রসাধনের মানসিকতা নিয়ে, চারিদিকের উৎসুক দর্শকের সামনে, ঘন্টা-ঢাক-ঢোল-কর্তালের আওয়াজের মধ্যে এই যন্ত্রণাকে নগন্য বলে অনুভব করতে পারেন। সাথে রয়েছে অবশ্যই তাঁর ব্যক্তিগত সাহস ও দীর্ঘকালীন অভ্যাস বা মানসিক প্রস্তুতির ফলে ব্যথা সহ্য করার প্রশংসনীয় ক্ষমতা। পেরেক বেঁধানর ফলে জীবাণুসংক্রমনের ও তারফলে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনাও সাধারণভাবেই অনেক কম। দৈনন্দিন জীবনে যে কেউই প্রতিনিয়ত ছড়ে যাওয়া, কেটে যাওয়া ইত্যাদির অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এর ফলে বিরাট ভাবে জীবাণুসংক্রমণ বা টিটেনাস ইত্যাদি প্রায়শঃই হয় না, তার কারণ এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য শারীরিক

প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, অত্যধিক পরিমাণ জীবাণুর সংক্রমণ ইত্যাদি প্রয়োজন। সামান্য সংখ্যক জীবাণুর আক্রমণকে সুস্থ যে কোন ব্যক্তি নিজের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সাহায্যে প্রতিহত করতে পারেন। তবু রাস্তাঘাটে কেটে গেলে টিটেনাসের টীকা দেওয়া হয় তার কারণ বাস্তবে টিটেনাস খুবই কম ঘটলেও, যদি কারোর ঘটে তবে তা প্রাণঘাতী হতে পারে। তাই অবশ্যই সতর্কতা প্রয়োজন। যার শরীরে পেরেক ফোটান হচ্ছে তারও যদি শরীর দুর্বল বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম থাকে, তবে এ ধরনের ভয়াবহ জীবাণুসংক্রমণ ঘটতে পারে। কিন্তু প্রায়শঃই সুস্থসবল পরিশ্রমী ব্যক্তিরাই এভাবে শরীরে পেরেক ফোটান—তাই তাঁর ক্ষেত্রে এ ধরনের কিছু ঘটার সম্ভাবনা প্রায় থাকেই না। এছাড়া বারবার করার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শরীরে নিজস্ব কিছু প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিও হয়।

এইভাবেই বিশেষ কিছু শারীরবৃত্তীয়, বাস্তব কারণে পেরেক বিঁধিয়ে ঝোলার ফলে সম্ভাব্য বিপদগুলি প্রায় কোনক্ষেত্রেই ঘটে না। আরো নানা তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাপ্রসূত ঘটনাবলীর মত এ ব্যাপারটিকেও দেবমাহাত্ম্য বলে ভাবার সংস্কারটিও নেহাতই ভ্রান্ত।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (ESP) ও ক্ষমতা

বহু যুগ ধরেই—কোন সময় ওঝা-গুণিন-পুরোহিত সম্প্রদায়, কখনো বা কোন তথাকথিত অবতার-গুরুজি-স্বামীজির দল, নিজেদের এই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করে চলেছে এবং এর সাহায্যে সরলবিশ্বাসী সাধারণ মানুষের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য আদায় করেছে বা অর্থোপার্জন করেছে! পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শারীরবৃত্তীয় নিয়মে বিভিন্ন অনুভূতি গ্রহণ করা হয়। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় এ সবের বাইরের কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অস্বাভাবিক ক্ষমতার দাবী করা হয়। এই ইন্দ্রিয়কে অনেকে ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলেন

এবং এটি মানসিক শক্তির একটি রূপ বলে বর্ণনা করেন। এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (Extra-sensory perception বা ESP) সাধারণতঃ ৪ ধরনের হতে পারে।

(১) ভবিষ্যৎ দৃষ্টি (Precognition)—এই শক্তির সাহায্যে ভবিষ্যতের কোন ঘটনাকে দেখতে পেয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করার ক্ষমতার অধিকারী বলে অনেকে দাবী করে। কার জীবনে কত বছর পরে কি ঘটবে, কোন দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা কি হবে, কোন্ মহান পুরুষ কবে জন্মগ্রহণ করবে ইত্যাকার নানা ঘটনাই এই সব দাবীদার ব্যক্তিরা নাকি তাদের অতীন্দ্রিয়, অলৌকিক ক্ষমতাবলে ধ্যানস্থ অবস্থায় বা অন্য কোনভাবে পরিষ্কার দেখতে পায়। বাস্তবে, এইভাবে এখনো না ঘটা কোন দৃশ্যকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। চোখের সামনে কোন ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট বস্তু, প্রাণী, ব্যক্তি ইত্যাদিদের আমরা দেখতে পাই। ঐ সমস্ত কিছু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চক্ষু গোলকের রেটিনা নামক অংশে পড়ে, সেখান থেকে চক্ষুর স্নায়ুর মারফৎ মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট অংশে যায় এবং আজন্ম সংগৃহীত স্মৃতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র তথা মস্তিষ্ক তার ব্যাখ্যা করে (কু-দৃষ্টি অংশ দ্রষ্টব্য)। আলোহীন, ঘোর অন্ধকারে কোন ঘটনা ঘটলে যেমন তা চোখে দেখা সম্ভব নয় একইভাবে যে ঘটনা আদৌ ঘটেনি তাও দেখা সম্ভব নয়—কারণ কোনটিরই সংশিষ্ট পরিবেশ থেকে আলোকরশ্মি চোখের ভেতর ঢোকে না। অনেকে আবার ব্যাপারটিকে মনশ্চক্ষুতে দেখা বলে গোঁজামিল দেয়। প্রকৃতপক্ষে আগের কিছু ধারণা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিতব্য কোন কিছুকে অনুমান করা হয়—যে কাজটিও করে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলিই। সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে এগুলির কিছু কিছু মিলে যেতেও পারে। কখনো বা স্বপ্নের মধ্যেও কোন ঘটনার আভাস পাওয়া যেতে পারে—যা আসলে ঘটে মস্তিষ্কে জমা থাকা পূর্ব অভিজ্ঞতার জটিল বিশ্লেষণের ফলেই। কিন্তু এগুলি ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ব্যাপার আদৌ নয় ; মনশ্চক্ষু কথাটি সম্পূর্ণই একটি রূপক, কাল্পনিক

ব্যাপার। মন যেহেতু মস্তিষ্কের ক্রিয়ারই ফল, তাই এর মধ্যে চোখের মত কোন বস্তুর অস্তিত্বটা হাস্যকর। আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেক গুরু-অবতারদের ঘিরে এই ক্ষমতার কথা প্রচার করা হয় উদাহরণ দিয়ে। বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানে দেখা যাবে আদৌ হয়তো সেটি তিনি বলেননি বা বলেছেন বাস্তব ঘটনার বিশ্লেষণ করে। শ্রীঅরবিন্দের এক অন্ধভক্ত, ডঃ কণকরত্নম নামে একজন এইভাবে প্রচার করেছিলেন যে, ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ঠিক একবছর পরে ভারত 'স্বাধীন' হবে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেল—অরবিন্দ আশ্রমের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এম. পি. পণ্ডিতই স্বীকার করেছিলেন যে, এধরনের কোন ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারটি তিনি শোনেননি। ব্যাপারটি অন্ধ ভক্তের মিথ্যা প্রচারই। অথচ অনুসন্ধান না করা হলে ঘটনাটি 'ভবিষ্যৎ দৃষ্টিশক্তির' একটি সফল উদাহরণ হিসেবে চালু হয়ে যেত।

(২) দূরচিন্তা (telepathy) (tele-দূর ; pathos- অনুভূতি)—এই ক্ষমতার সাহায্যে নাকি দূরের কারোর চিন্তাভাবনা-অনুভূতিকে অনুভব করা যায়। অর্থাৎ এখানে বসে কয়েক মাইল দূরে কোন বিশেষ ব্যক্তি কি ভাবছে তা নাকি জেনে ফেলা সম্ভব, এমন কি কয়েকশত মাইল দূরের ব্যক্তির চিন্তাও পড়তে পারা যায়। অনেকে একে আরো বিস্তৃত করে বলেন, অদূর ভবিষ্যতে এর সাহায্যে মহাকাশে ভ্রাম্যমান রকেট বা উপগ্রহের নভশ্চরদের সাথেও যোগাযোগ করা সম্ভব হবে। প্রাচীন ভারতীয় মুনি-ঋষিরা নাকি এই ক্ষমতার সাহায্যে—ধ্যান করে,—দূরের কে কি ভাবছে তা জানতে পারতেন। বাস্তবে এইভাবে কারোর চিন্তাকে জানা সম্ভব নয়। অনেকে এর বৈজ্ঞানিক (?) সম্ভাব্যতা এইভাবেও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। চিন্তা করার সময় মস্তিষ্ক থেকে যদি চিন্তাতরঙ্গ জাতীয় কিছু বেরোয় এবং গভীর মনঃসংযোগের মাধ্যমে কেউ যদি নিজের মস্তিষ্কের চিন্তাতরঙ্গের সাথে ঐ তরঙ্গকে মেশাতে পারে.

তাহলে রেডিও টিউনিং-এর মত, এই ব্যক্তির মস্তিষ্কে অন্য ব্যক্তির মস্তিষ্কের চিন্তা ধরা পড়বে। প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্ক থেকে বেরোতে পারে এই ধরনের কোন চিন্তাতরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণিত নয়, তা সম্ভবও নয়। শব্দ, আলো ইত্যাদি এক একটি শক্তি, এরা অন্য যে কোন শক্তির মত কিছু কাজ করতে পারে। তরঙ্গের আকারে নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক, মাত্রা ও গতিতে এগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ পদ্ধতিতে রেডিও বা টেলিভিসনে এদের তরঙ্গকে গ্রহণ করে শব্দ বা দৃশ্য উপস্থাপিত করা হয়। তাই বহু দূরে কোন শব্দ বা দৃশ্যকে ঘরে বসে শোনা বা দেখা যায়। কিন্তু চিন্তা এই ধরনের একটি শক্তি নয়। এটি স্নায়ুর ক্রিয়ারই একটি ফল। মস্তিষ্কের সামনের দিকে থাকা প্রিফ্রন্ট্যাল লোব (prefrontal lobe) নামক অংশটি মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সাথে স্বাভাবিক ও জটিল যোগাযোগের মাধ্যমে প্রাণীর তথা মানুষের চিন্তাবৃত্তি, বুদ্ধি, মেধা, বিচারবুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির জন্য মূলতঃ দায়ী—তাই একে 'Organ of mind' বলা হয়। পুষ্টির অভাব, আঘাত, জীবাণু আক্রমণ, টিউমার ইত্যাদি নানা কারণে এই অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষের চিন্তা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদিও বিভিন্ন মাত্রায় অস্বাভাভাবিক হয়ে পড়ে। কিছু মনে রাখতে না পারা, অত্যধিক আনন্দ বা দুঃখ, ইত্যাদি নানা ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মস্তিষ্কের জটিল ক্রিয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান এখনো মানুষ অর্জন করতে পারেনি। অন্যদিকে মানুষ বহুবিধ তরঙ্গ সম্পর্কে বহু বিস্তারিত তথ্য জানতে পেরেছে এবং এই তরঙ্গ গ্রহণের জন্য বহু সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি আবিষ্কার করেছে। কিন্তু কোনভাবেই কোন চিন্তাতরঙ্গের অস্তিত্ব এই সব যন্ত্রে ধরা পড়েনি।

এবং সত্যি কথা বলতে কি, টেলিপ্যাথির কোন ঘটনাও কোন দিন ঘটেছে বলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত হয় নি। প্রাচীন কাব্য-পুরাণে এধরনের ঘটনার উল্লেখ কবিকল্পনা ও দৈবীশক্তির মাহাত্ম্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই—বাস্তবে বর্তমানে ঐগুলোর সত্যতা বা ভ্রান্তি কোনটিই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে সাম্প্রতিক যারা

টেলিপ্যাথির সপক্ষে নানা ঘটনার উল্লেখ করেন সেগুলিকে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা যাবে তাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। যেমন, ১৯৫৯ সালে টেলিপ্যাথির সাফল্য সম্পর্কে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। এতে বলা হয়েছিল, ২৫ জুলাই তারিখে (!) পরামনোবিজ্ঞানী (!) অধ্যাপক জে বি রাইনের পরিচালনায় নর্থ ক্যারোলিনার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, টেলিপ্যাথির সাহায্যে ১২০০ মাইল দূরে সমুদ্রের কয়েকশ' ফুট নীচে ডুবে থাকা 'নটিলাস' নামে এক আণবিক ডুবো জাহাজে সাফল্যের সঙ্গে সংবাদ প্রেরণ করা হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার একটি পত্রিকা 'দিস উইক' এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে এবং জানা যায় যে, একদা চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী এই তথাকথিত ঘটনাটি আদৌ ঘটেনি, সম্পূর্ণ সাজান একটি ব্যাপার। নটিলাসের তখনকার ক্যাপটেন উইলিয়াম অ্যাণ্ডারসন জানান, 'নটিলাসে টেলিপ্যাথি সম্পর্কে কোন কাজ করা হয় না। টেলিপ্যাথি সম্পর্কিত ঐ রিপোর্টটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আসলে ঐ সময় নটিলাস ছিল পোর্টসমাউথের ডকের উপর, ওটিকে তখন সারান হচ্ছিল।" সোভিয়েত রাশিয়ার জনৈক অধ্যাপক লিওনিভ ভ্যাসিলিয়েভও এই টেলিপ্যাথির সপক্ষে প্রচার করেন এবং তিনি 'নটিলাস'-এর ঘটনাকে সত্যি বলেই ধরে ছিলেন। অধ্যাপক রাইনে বা ভ্যাসিলিয়েভের মত ব্যক্তিদের এই ধরনের প্রচারকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে অনুসন্ধান করলে তাদের অভ্যন্তরীণ ধোঁকাবাজিটা এইভাবে ধরা পড়বে। ইজরায়েলের ইউরি গেলারেরও দাবী ছিল তার টেলিপ্যাথির ক্ষমতা রয়েছে—তারও চালাকি ধরা পড়েছে। ফাঁস করেছে তারই সহকারী ইয়াসা কাৎস ও শিপি স্ট্র্যাং—এরা নানা খবর সংগ্রহ করে ইউরিকে কৌশলে জানাত। এছাড়া বহু যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়েও ইউরি সবার অলক্ষ্যে তথ্যসংগ্রহ করে সবাইকে ধোঁকা দিত।

(৩) অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি (clairvoyance)—এই শারীরিক ক্ষমতার সাহায্যে নাকি বহু দূরের কোন ঘটনাকে দেখা যায়। যেমন

আমেরিকায় বসে ভারতে কারোর মৃত্যুদৃশ্য দেখা এবং এমন কি পৃথিবীতে বসে, মহাকাশযানের দৃশ্য দেখা। দূরদর্শন (televison) যন্ত্রের সাহায্যে এইভাবে দেখা সম্ভবও। কিন্তু এ ধরনের কোন বাস্তব ব্যবস্থা ছাড়া শুধুমাত্র 'মানসিক শক্তির' সাহায্যে দূরকে দর্শন করা সম্ভব নয়। দেখার জন্য আলোক রশ্মিকে সুস্থ ব্যক্তির চোখে ঢুকতে হবে। এটি না হলে দেখা সম্ভব নয়। এবং আলোকরশ্মি সরল-রেখায় সঞ্চালিত হয় বলে অস্বচ্ছ কোন কিছুর আড়ালের কোন বস্তু বা দৃশ্যকে খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। যারা দাবী করে যে, কোন যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে তারা নানা কিছু দেখতে পায় তাদের দাবীকেও বিজ্ঞান সম্মত অনুসন্ধানে ভ্রান্ত বলেই প্রমাণ করা যাবে। ডঃ আব্রাহাম কোভুর সারা জীবন এই ধরনের অপবৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধ্যারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। ১৯৬৩ সালের ২৩শে এপ্রিল সিংহলের 'সিলোন ডেলি নিউজ' সংবাদপত্রে খবর বেরোয়, 'প্রফেসর পাপ্পু' নামে 'অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন' জনৈক ব্যক্তি নাকি একটি কিডন্যাপ করা মেয়েকে খুঁজে দিয়েছিল—যে গাড়ীটি করে তাকে নিয়ে পালান হচ্ছিল তার নাম্বার জেনে দিয়ে। পরে অনুসন্ধানে জানা যায় আদৌ সে এটি করেনি। মেয়েটির বাবাই জানালেন, যে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যাপারটি প্রচার করা হয়েছিল। 'প্রফেসর পাপ্পু' আরো দাবী করত যে, বন্ধ বাক্সের ভেতরে রাখা একটি টাকার নোটের নম্বর সে পড়ে দিতে পারে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে। কোন চালাকি করার সুযোগ থাকবে না, এরকমভাবে ডঃ কোভুর পরীক্ষা করে দেখেন, সে সম্পূর্ণ ভুল নাম্বার বলেছে।

(৪) মানসিক শক্তি (psychokinesis)—এই গালভরা কথাটি প্রায়শঃই শোনা যায়, এর সাহায্যে নানা কাজও নাকি করা সম্ভব হয়। বিদ্যুৎ, তাপ, আলো, শব্দ, চৌম্বক ইত্যাদি নানা ধরনের শক্তি (energy)-র সাহায্যে নানা কাজ করা যায় এবং কোন ধরনের শক্তি ছাড়া কোন কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু মন বা চিন্তা হল

মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়ারই ফল। এটি আলাদা কোন শক্তি নয়। মন বা চিন্তার ফলে নানা শারীরিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন সম্মোহিত অবস্থায় বিশেষ কিছু নির্দেশের ফলে অববা কোন উত্তেজক কিছুর চিন্তা করলে হৃদপিণ্ডের গতি বৃদ্ধি পায়; যৌন উত্তেজক কিছু চিন্তা করলে পুরুষদের লিঙ্গ শক্ত হয় বা মেয়েদের যোনিপথে বিশেষ জলীয় পদার্থের নিঃসরণ ঘটে ইত্যাদি। কিন্তু এ সব কিছুই ঘটে স্নায়ুর মাধ্যমে—চিন্তা করার মানসিক প্রক্রিয়ায় যে সব স্নায়ু সংশ্লিষ্ট থাকে তাদের সাথে মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশের বিশেষ স্নায়ুসমষ্টির জটিল যোগাযোগের মাধ্যমে—কিন্তু চিন্তাশক্তির দ্বারা আদৌ নয়, তার সহজ কারণ এ ধরনের কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই। অথচ প্রাচীন কাল থেকেই এই ধরনের শক্তির অধিকারী বলে অনেকে দাবী করে আসছে এবং এই শক্তির ভয় দেখিয়ে অন্যদের উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করছে। আসলে এই মানসিক শক্তির প্রকাশ হিসেবে তারা যে সব কাজ ক'রে অন্যদের চমৎকৃত করে তার মধ্যে থাকে স্রেফ চালাকি এবং বাস্তব কিছু কারণ অর্থাৎ অন্য কোন ধরনের শক্তির প্রয়োগ। কখনো বা দর্শকদের সম্মোহিত করে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটান হয়। যেমন ইজরায়েলের ইউরি গেলার নামে একজন ব্যক্তি এইভাবে কিছু কাজ করে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। তার প্রিয় একটি খেলা ছিল স্টেজে ঝোলান একটি লোহার চামচের দিকে একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাকে বাঁকিয়ে দেওয়া যেন তার মনঃসংযোগের ফলে 'মানসিক শক্তিবলে' সেটি বেঁকে গেল। আসলে ব্যাপারটি পদার্থবিজ্ঞানের একটি নিয়মকে কাজে লাগিয়ে করা যায়। প্রতিটি ধাতুই তাপপ্রয়োগের ফলে নির্দিষ্ট হারে প্রসারিত হয়। দুটি বিভিন্ন ধাতুর তৈরি পাতের প্রসারণাঙ্ক ভিন্ন। এইভাবে দুটি ভিন্ন ধাতুর পাতকে পরস্পরের সঙ্গে আটকে তাপ প্রয়োগ করলে তাদের প্রসারণের হার ভিন্ন হওয়ায় যে ধাতুর প্রসারণাঙ্ক কম সেই ধাতুর পাতের দিকে ঐ সংযুক্ত পাতটি আস্তে আস্তে বেঁকে যায়। ইউরি গেলার

স্টেজে চামচ ঝুলিয়ে তার উপর তীব্র আলো ফেলত—বলা হত, এই আলো ফেলা হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটির মধ্যে যে, কোন ধরনের চালাকি নেই সেটি সম্পর্কে দর্শকরা যাতে নিশ্চিত হতে পারেন তার জন্য। আসলে এই তীব্র আলোক রশ্মির মাধ্যমেই তাপপ্রয়োগ করা হত এবং চামচটি আসলে ছুটি ভিন্ন ধাতুর পাৎলা পাতকে পরস্পরের সঙ্গে আটকে বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয়। তাই কিছুক্ষণ চামচটির উপর এইভাবে আলোকরশ্মি তথা তাপ প্রয়োগ করার পর, বিজ্ঞানের নিয়মেই চামচটি আস্তে আস্তে বাঁকত। না ছুঁয়ে, শুধু মানসিক শক্তিতে চাবি-চামচ বাঁকানর কথা বল্লেও, অনেক সময় ইউরি গেলার অতি সামান্য সময়ের জন্যও ওগুলি ছুঁত। ঐ সময় একটি বিশেষ কায়দায় ও অবিশ্বাস্য দক্ষতায় সে ঐগুলি হাত দিয়েই বাঁকাত যা পরে ধরা পড়েছে। সব মিলিয়ে মাঝখান থেকে প্রতিষ্ঠিত হত তথাকথিত মানসিক শক্তির মাহাত্ম্য।

নানা পদ্ধতির সাহায্যে পৃথিবীর বিখ্যাত সৎ ম্যাজিসিয়ানরা ম্যাজিক দেখান। কিন্তু তাঁরা কখনোই তাঁদের এইসব খেলাকে অতীন্দ্রিয় শক্তি ইত্যাদির ব্যাপার বলেন না। কিন্তু ইউরি গেলারের মত ব্যক্তিরা বা কিছু সন্ন্যাসী-অবতার বাবারা এই মিথ্যাচার করে এবং সরলবিশ্বাসী মানুষকে বিভ্রান্ত করে। পূর্বোক্ত ডঃ আব্রাহাম কোভুরও ইউরি গেলারের তথাকথিত অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাপ্রসূত নানা কাজ করে দেখাতেন এবং ব্যাখ্যা করতেন কিভাবে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সেগুলি করা সম্ভব।

৪

প্রাণরহস্য ও শিশুর জন্ম

প্রকৃতির অজস্র জড় পদার্থের মাঝে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী-উদ্ভিদের জীবনধারণ করার মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি মানুষের কাছে এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত ছিল। এখনও এই রহস্যের পর্দা পুরোপুরি ওঠেনি, কিন্তু প্রাথমিক অনেক কিছু ব্যাপারই জানা গেছে। চিন্তা করার প্রবল ক্ষমতার অধিকারী মানুষ এই প্রাণ রহস্যের ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেছে আদিকাল থেকেই, সৃষ্টি করেছে নানা ধরনের তত্ত্ব ও ধারণা।

আত্মা

এই আত্মার সর্বব্যাপী ধারণাটি অতি প্রাচীন। পৃথিবীর প্রায় সব-প্রান্তেরই মানুষ বহু সহস্র বছর ধরে এই ধারণাটিকে লালিত করে আসছে। সাধারণ ভাবে এটিই বলা হয় যে, মানুষের প্রাণের পেছনে রয়েছে এই আত্মা নামের জিনিষটি, এটি যতক্ষণ কারোর শরীরে থাকে ততক্ষণ সে জীবিত থাকে; মৃত্যুর মুহূর্তে এই আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায় আর অনুপ্রবেশ করে অন্য কারোর শরীরে—সে পায় জীবন। কোন কোন মানবগোষ্ঠী মনে করে মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর আত্মা নেই। কেউ আবার মনে করে, নিকৃষ্টতর প্রাণীদেরও নিকৃষ্ট ধরনের আত্মা থাকে। কারোর আবার ধারণা, মানুষের আত্মা মৃত্যুর পর নিকৃষ্টতর প্রাণীর শরীরে কিছুদিন থাকে—যেমন পোকামাকড় ইত্যাদিতে, তারপর কোন নবজাত শিশুর শরীরে ঢুকে যায়। প্রকৃতির নানা জড় বস্তুর মধ্যেও এক ধরনের আত্মা বা অতীন্দ্রিয় শক্তি আছে বলে অনেকে বিশ্বাস করে যেমন কোন পাহাড়, পাথর ইত্যাদিতে আর এই শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য এদের পূজা করা হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপা-

ঞ্চলের মেলানেশীয় ও পলিনেশীয় আদিম উপজাতিদেব মধ্যে আবার 'মানা' (mana) নামে একটি ধারণার কথা জানা যায়। এতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপি একটি নিগূঢ় অতীন্দ্রিয় শক্তিকে কল্পনা করা হয় —তবে এটি পুরোপুরি আত্মার ধারণার সাথে মেলে না। হিন্দুধর্ম সহ অনেক ধর্মেই কল্পনা করা হয় এক পরমাত্মার কথা, যার থেকে— সমস্ত মানুষ ও প্রাণীর আত্মা নাকি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। প্রাচীন সব ধর্ম ও দর্শনেরই মূল ভিত্তি ছিল এই আত্মা-পরমাত্মার ধারণা। বুদ্ধদেব (জন্ম ঃ ৫৬৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মে অবশ্য আত্মার অস্তিত্বহীনতার কথা বলা হয়।

যাই হোক প্রাণশক্তির পেছনকার এই আত্মার কল্পনা থেকে নতুনতর আরো কিছু ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, জন্মান্তর ও পুনর্জন্মবাদ, শ্রাদ্ধ শান্তি, ভূত-পেত্নি বা প্রেতাত্মা, ইত্যাদি।

অতি আদিমকালে মানুষের মধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও পৃথিবীর সৃষ্টি, পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশ, জীব জগতের বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কিত কোন বৈজ্ঞানিক ধারণাই ছিল না। এসব সম্পর্কে চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ জ্ঞান এখনো মানুষ আয়ত্ত না করতে পারলেও, যতটুকু জানা গেছে তা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে, পর্যবেক্ষণ, বাস্তব পরীক্ষা-নিরিক্ষা ও প্রয়োগ-এর ভিত্তিতেই জানা গেছে। আর এই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানগুলিই প্রাচীন কল্পনার ভিতকে নাড়িয়ে দিচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন এখন থেকে প্রায় ৪৭০ কোটি বছর আগে সূর্য নামক জ্বলন্ত নক্ষত্রের একটি অংশ কোন দুর্ঘটনায় বা শক্তিশালী অন্য কোন নক্ষত্রের আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্ন অংশই পরবর্তী কালে জমাট বেঁধে নানা গ্রহের ও গ্রহাণুপুঞ্জের সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর এই জমাট বাঁধার সময়টা ২০০ কোটি বছর আগে বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। এরও বেশ কয়েক কোটি বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি। পৃথিবীর মধ্যেকার নানা মৌলিক পদার্থ সমূহ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানা মিলন ও বিচ্ছেদ, ভাঙ্গা-গড়ার

মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছে বহু নতুন নতুন যৌথ পদার্থের। এগুলি আবার পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটিয়েছে। আর এই ভাবেই আকস্মিকভাবে এক সময় সৃষ্টি হয়েছে প্রাণী ও জীবদেহের প্রাথমিক পদার্থের কণিকাগুলি। পারিপার্শ্বিক চাপ-তাপ-আলোক তথা সামগ্রিক আবহাওয়ায় মধ্যে এই জৈবরাসায়নিক পদার্থের কণিকাগুলি মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে প্রাথমিক এককোষী প্রাণী অ্যামিবা। একদিকে যেমন সৃষ্টি হয়েছে জলপূর্ণ সমুদ্র অন্যদিকে এসেছে স্পঞ্জ ও সামুদ্রিক আগাছা জাতীয় উদ্ভিদ এই সৃষ্টির সময়টা আনুমানিক ১২০ কোটি বছর আছে। এরপর জৈব বিবর্তনের মাধ্যমে পুরাজীবীয় (paleozoic) যুগে জন্ম নিয়েছে অমেরুদণ্ডী প্রাণী, মাছ ও উভচর প্রাণীরা ও প্রাথমিক অন্যান্য উদ্ভিদ। তারপর সরীসৃপ, সপুষ্পক উদ্ভিদ, পাখী, স্তন্যপায়ী প্রাণী, মনুষ্যেতর প্রাণী ও সব শেষে মানুষ (Homo sapien)—মাত্র এই ২৫-৩০ হাজার বছর আগে। ১০,০০০ বছর আগে ছিল নব্য প্রস্তর (neolithic) যুগের মানুষ। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে এখন অব্দি—এই প্রায় ৪৭০ কোটি বছরকে যদি একটি বছরের সাথে তুলনা করা হয়, তবে হাত-ওয়ালা মানুষের জন্ম হয়েছে ৩১শে ডিসেম্বর অর্থাৎ বছরের শেষ দিনে, রাত্রি প্রায় ৮-৩৫ মিনিটে। আগের এই সুদীর্ঘ সময় গেছে নানাপদার্থের ভাঙ্গাগড়া ও অন্যান্য প্রাণীর বিবর্তনে। প্রকৃতির সাথে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের সভ্যতাও বিকশিত হয়েছে।

এইভাবে মানুষ তথা প্রাণের সৃষ্টি জড় পদার্থ থেকেই। জড় মৌলিক পদার্থের কণিকাগুলি একদিকে তৈরী করেছে তামা ও সালফিউরিক অ্যাসিড বা এই ধরনের বহু পদার্থ ; এদের রয়েছে নির্দিষ্ট গুণ ও বৈশিষ্ট্য ; যেমন, তামা সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে কপার সালফেট বা তুঁতে তৈরি করে। আর একইভাবে সৃষ্টি হয়েছে নানা জৈব কণিকা ও পদার্থ—এদেরও রয়েছে নির্দিষ্ট গুণ ও বৈশিষ্ট্য। কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন,

সালফার, হাইড্রোজেন ইত্যাদি বহু মৌলিক পদার্থের সমন্বয়েই এই জৈব পদার্থসমূহ তথা জীবদেহ তৈরি। একজন মানুষের শরীরে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ এইভাবে থাকে—অক্সিজেন ৬৫%, কার্বন ১৮%, হাইড্রোজেন ১০%, নাইট্রোজেন ৩%, ক্যালসিয়াম ১.২৫%, ফসফরাস ১%, পটাসিয়াম ০.৩৫%, সালফার ০.২৫%, সোডিয়াম ০.১৫%, ক্লোরিন ০.১৫%, ম্যাগনেসিয়াম ০.০৫%, লোহা ০.০০৪%, আয়োডিন ০.০০০০৪% ইত্যাদি। এছাড়া সামান্য পরিমাণে থাকে ম্যাঙ্গানিজ, তামা, দস্তা, ফ্লোরিন, সিলিকন, কোবাল্ট, মলিবডেনাম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থগুলি। মানুষসহ কোন একটি প্রাণী বা উদ্ভিদের বিশ্লেষণে এই ধরনের নানা পদার্থই পাওয়া যায় বিভিন্ন পরিমাণে; কিন্তু, আত্মা নামক কোন পদার্থ নয়।

পেপসিন নামে জৈব-রাসায়নিক পদার্থ তথা উৎসেচকটি যেমন প্রোটিন জাতীয় জৈব পদার্থকে ভেঙ্গে ফেলার ক্ষমতা অর্জন করেছে তেমনি আরো জটিল জৈব-রাসায়নিক বিন্যাসের ফলে সৃষ্টি হওয়া প্রাণীদেহও পেয়েছে তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য; পুষ্টিগ্রহণ করে তার বৃদ্ধি বা কোষ-বিভাজন ঘটে, নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় তার বংশবৃদ্ধি হয়, স্নায়ুযুক্ত প্রাণী চিন্তা করতে পারে, নির্দিষ্ট সময়ের পরে সুনির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় তার ক্ষয় ঘটে, এক সময় তার মৃত্যু হয় ইত্যাদি। কয়েক কোটি বছর আগে প্রথম প্রাণ সৃষ্টির সময় যেমন কোন পরমাত্মা বা আত্মার ভূমিকা ছিল না, তেমনি বহু কোটি বছরের বিবর্তণের ফলে সৃষ্টি হওয়া মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী-উদ্ভিদের প্রাণের পেছনে এখনো নেই আত্মা-পরমাত্মার লীলা। রয়েছে জড় পদার্থের ভূমিকাই। ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত ইত্যাদি রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস প্রাণ ও অপ্রাণ বা জড়ের মধ্যকার যোগসূত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যদিও জটিল তবু এর সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন জানা গেছে এবং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ছাড়া সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রে একে দেখা যায় না। আশেপাশের পদার্থগুলিকে নিজেরই মত

পদার্থে রূপান্তরিত করার অসাধারণ ক্ষমতা এদের রয়েছে এবং এটিকে কাজে লাগিয়ে এরা বংশবৃদ্ধি করে।

স্ত্রী ও পুরুষের যৌনমিলনের পর তাদের এক একটি জননকোষের মিলন ও নিষিক্ত হওয়ার ফলে যে প্রাথমিক কোষটি তৈরি হয়, সেটিই সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় মায়ের জরায়ুতে বিভাজিত হতে হতে একটি শিশুর সৃষ্টি করে এবং এক সময় একটি মানবশিশু মায়ের জরায়ু থেকে জন্মগ্রহণ করে। জননকোষ দুইটির মিলনের সময়, কিংবা শিশুর ভূমিষ্ঠ গ্রহণের সময়, কোন আত্মা ঐ কোষের বা শিশুটির মধ্যে ঢুকে যায় না। একইভাবে শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে কোন আত্মা বেরিয়ে যায় না, বেরোয় কার্বনডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প ইত্যাদিই ; এই মৃত্যুর সময় কোন আত্মা দেহত্যাগ করে না, তার একটিই কারণ এই ধরনের কোন আত্মার অস্তিত্ব নেই।

আত্মার কল্পনাও মানুষ একদিনে করেনি। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মানুষ বহু যুগের নানা অনুমান ও কল্পনাকে মিশিয়ে এ ধরনের একটি চিন্তার জন্ম দিয়েছে। গবেষকদের মতে মানুষের মধ্যে প্রথমে আসে সর্বপ্রাণবাদ (animatism)-এর ধারণা। এই ধারণা অনুযায়ী মানুষের নিজেরই মত এই প্রকৃতি জগতের সবকিছুই জীবন্ত ও সংবেদনশীল। এর ফলে মানুষ একদিকে পাহাড়, নদী, সমুদ্র ইত্যাদিকে কোন বিশেষ শক্তির অধিকারী, বিশেষ ধরনের প্রাণবান জিনিষ বলে মনে করেছে, এর থেকে সৃষ্টি হয়েছে এদের পূজা, দেব-দেবী হিসেবে এদের কল্পনা করা ইত্যাদি। অন্যদিকে ঝড়, ভূমিকম্প, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকেও দেবতা বা আরাধনা করে সন্তুষ্ট করার যোগ্য শক্তি হিসেবে কল্পনা করেছে। সর্বপ্রাণবাদের ধারণার পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের চিন্তাভাবনা সমস্ত জড় বিশ্বের উপর সুবিস্তৃত হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের সর্বপ্রাণবাদ বা জড়াত্মবাদের (animism) সৃষ্টি করেছে। এই দুই চিন্তার উদ্ভবের প্রক্রিয়া ও কাল সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে কিছু কিছু মতপার্থক্য

থাকলেও মানুষের চিন্তাভাবনা যে এই ভাবেই বিকশিত হয়েছে এবং প্রকৃতি জগতের সবকিছুকে, নিজের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা, বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে তা ঠিক। এই ধরনের ধারণাগুলিই পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মমতগুলির মূল ভিত্তি; সৃষ্টি হয়েছে যজ্ঞ, প্রার্থনা, দেবদেবীর পূজা ইত্যাদি। জীবন ও মৃত্যু, জাগরণ ও নিদ্রা এবং নিদ্রার সাথে স্বপ্ন, রোগ ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি—জীবনে নানা ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা না জানা থাকায় এই আত্মা ও দেবদেবীর ধারণার দ্বারা এগুলোর ব্যাখ্যা মনগড়া করা হয়েছে; আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মৃত্যু ও রোগের মত অপ্রীতিকর ও অনাকাঙ্খিত নানা ঘটনার থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টাও করা হয়েছে এই সব ধারণাকে কাজে লাগিয়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন ধর্মে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন ভাবে! আর এখন বহু শত বছরের অভ্যস্ত বিশ্বাসের ফলে মানুষের মনে এসবের প্রতি একটি অন্ধ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে মানুষের সমাজব্যবস্থার বিবর্তনের একটি পর্যায়ে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হল, সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সুকৌশলে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে প্রতারিত করে ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়ান ও অন্যদের উপর নেতৃত্ব দেওয়ার কৌশল অর্জন করল, সৃষ্টি হল রাজা ও পুরোহিত সম্প্রদায়,—তখন এই শাসকগোষ্ঠী তাদের শোষণ ও শাসনের সুবিধার জন্য এই আত্মা-পরমাত্মার ধারণাটি, এবং এসব থেকে সৃষ্টি হওয়া পুনর্জন্ম, পূর্বজন্মের কর্মফল, আত্মার বিকাশ সাধন করা ইত্যাকার ধারণাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করল। কারণ তারা বুঝতে পারল যে, এর ফলে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে বোঝান সম্ভব হচ্ছে যে, দারিদ্র্যের পেছনে পূর্বজন্মের আত্মার ক্রিয়াকর্মই দায়ী—রাজা-পুরোহিতের শাসন-শোষণ নয়; সামাজিক নানা বৈষম্য ও দুর্দশার জন্য পরমাত্মার ইচ্ছাই দায়ী—সমাজব্যবস্থা নয়।

অন্যদিকে, সমস্ত মানুষের মধ্যেই আত্মার কল্পনাটির একটি বাস্তব উপযোগিতাও আছে। আমি মারা গেলে আমার আর কিছুই

থাকবে না—এ কল্পনা মানুষকে আতংকিত করে। স্বাভাবিক ভাবে, এই নশ্বর দেহ লোপ পেলেও আমার আত্মাটি থাকবে, তা অবিনশ্বর এবং অন্যভাবে জন্মগ্রহণ করবে—এ চিন্তাটি এই আতংককে কমিয়ে দেয়। অন্যদিকে প্রিয়জন কেউ মারা গেলে, সে একেবারে চলে যায় নি, তার আত্মা রয়েছে, আত্মাটি শুধু 'জড়দেহরূপ খাঁচাটি ছেড়ে গেল'—এ ধরনের চিন্তা শোকার্ত অসহায় মানুষকে শোকলাঘবে সাহায্য করে। নিজের দারিদ্র্য, সামাজিক নির্যাতন ইত্যাদির পেছনে আত্মার সুকৃতি, পূর্বজন্মের কর্মফল, পরমাত্মার ইচ্ছা ইত্যাদি হিসেবে ভেবে শাসক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে কষ্টকর সংগ্রামকে এড়ানও যায়। শাসকশ্রেণীও বিপুল সংখ্যক সাধারণ শোষিত মানুষকে এইভাবে বিভ্রান্ত করার জন্য আত্মার ধারণা তথা নেশাটি তাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ও এই ধারণাকে কাজে লাগায়। এখনো শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহীরা ধূর্ত ও সচেতনভাবে অথবা হয়তো অসচেতনভাবেই এ কাজ করে চলেছে নানাভাবে।

স্বামী অভেদানন্দ নামে এক জনের **'Life Beyond Death'** নামক বইটির কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়। বাংলায় বইটির অনুবাদ 'মরনের পারে' নামে বেশ বিক্রি হয় এবং সাধারণ মানুষ ও আত্মায় অন্ধবিশ্বাসীরা বইটির নানা উক্তিকে আত্মার অস্তিত্বের সপক্ষে দাঁড় করায়। এই বইতে বলা হয়েছে, "একটি মুরগীর মাথা কেটে ফেলে তার হৃদযন্ত্র বার করলে দেখা যাবে মরনের পরও অনেকক্ষণ সেটা বেঁচে থাকে। এ থেকে বোঝা যায়, দেহের অংশগুলির স্বতন্ত্র সত্তা আছে, দেহের মৃত্যুর পরও সেগুলি বেঁচে থাকতে পারে। ব্যক্তির মৃত্যু হলেও তার সত্তা থেকে যায়।" (মরনের পারে ; শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত ১০ম সংস্করণ ; পৌষ, ১৩৮৭) কি অদ্ভূতভাবে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করে উদ্ভট সিদ্ধান্তে চলে আসা হল ! শরীর-বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোষগুলি পুষ্টির যোগান, উপযুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি পেলে বেশ কিছুক্ষণ তার কাজ চালাতে পারে। হিমায়নের সাহায্যে এগুলিকে দীর্ঘদিন

বাঁচিয়েও রাখা যায়। কিন্তু এর সাথে তার 'সত্তা-র' সম্পর্কটি কোথায়? যারা এই সব বিশ্বাস আগে থেকেই করে আসছে তারা—এধরনের কথাকে কোন প্রশ্ন না তুলে বা যাচাই না করেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এ ধরনের লোকের সংখ্যা এখনো অনেক বেশী। আর একারণেই এধরনের গাঁজাখুরি মিথ্যে কথাবার্তাকে পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি।

একইভাবে বলা হয়েছে, মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার করে মন বা আত্মা নামক কোন বস্তুকে খুঁজে না পেলেই এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না "কেন না তুমি যা জানছো মনের বা আত্মার সত্তা নেই—তাও জানছো মন দিয়ে এবং সেই মন নিশ্চয়ই আর একট কিছু জিনিস; অর্থাৎ সেই মন যে মস্তিষ্ককে অস্ত্রোপ্রচার করছে তার মন। যদি বলো যে, মনের বা আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই, তবে সেটা কেমন—যেমন এখুনি যদি বলো যে, তোমার জিহ্বা নেই।" (পৃঃ ১০১) এখানেও কি সুকৌশলে, কথার মারপ্যাচে মন ও আত্মাকে এক করে দিয়ে একটি গোঁজামিল দেওয়া হল! চিন্তার ও মনের অস্তিত্ব রয়েছে—এটি স্নায়ুর ক্রিয়ার ফল; আরশুলা কি মানুষ—যারই স্নায়ু রয়েছে সে-ই চিন্তা করতে পারে, তা যে ভাবেই হোক না কেন। প্রাণীজগতেমানুষের স্নায়ুতন্ত্র তথা মস্তিষ্কের ক্রিয়া সর্বোন্নত বলে তার চিন্তা করার ক্ষমতাও সবচেয়ে বেশী ও উন্নত। কিন্তু মস্তিষ্ক কেটে যে 'মন' নামক কোন বস্তুকে দেখতে পাওয়া যাবে না—তা-ই স্বাভাবিক। পুষ্টি, আঘাত, বংশগতি ইত্যাদি নানা কারণে মস্তিষ্কের উপযুক্ত বিকশ না ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চিন্তা করার ক্ষমতাও উপযুক্ত ভাবে বিকশিত হয় না—মস্তিষ্কের grey matter, বিশেষত frontal lobe-এর grey matter এই চিন্তা, মেধা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির জন্য দায়ী। তাই এই অংশকে মনন অংগ (organ of mind) বলা যায়। কিন্তু যেহেতু স্নায়ুর ক্রিয়ারই ফল মন তথা চিন্তা, তাই একে কেটে এই মন বা চিন্তাকে দেখতে পাওয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। একই ভাবে একটি তামার টুকরোকে কেটে 'তু'তে তৈরী

করতে পারার ক্ষমতা' নামক কোন বস্তুকে দেখতে পাওয়া যাবে না, যদিও তামার ঐ টুকরোটি সালফিউরিক এ্যাসিডের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তুঁতে তৈরি করতে সক্ষম।

স্বামী অভেদানন্দ আরো বলেছেন, বিশেষ সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে আত্মাকে (অর্থাৎ মনকে) নাকি ওজন করা যায়। "তার ওজন প্রায় অর্ধেক আউন্স বা এক আউন্সের তিনভাগ" (ঐ, পৃঃ ২৮)। এ সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত কোন গবেষণাপত্র নেই। এটি একেবারে অসম্ভবও, কারণ মন কোন বস্তু নয়—মস্তিষ্ক তথা বস্তুর একটি গুণ মাত্র। মৃত্যুর আগে ও বেশ কিছুক্ষণ পর শরীরের ওজনের সামান্য তারতম্য ঘটে—কিন্তু এটি হয় জলীয়বাষ্প নির্গমনের জন্য। স্বামীজি বলেননি, বিশালবপু ব্যক্তির আত্মা ও ক্ষুদ্র শিশু বা রুগ্ন ব্যক্তির আত্মার ওজনের তারতম্য হয় কিনা। দুর্ঘটনায় কারো হাত-পা কাটা গেলে আনুপাতিক হারে আত্মার কতটা চলে যায় তার হিসেবও তিনি দেননি। ব্যাপারটি হাস্যকর-ভাবেই অসম্ভব।

তিনি আরো বলেছেন, মৃত্যুর সময় কুয়াশার আকারে একটি পদার্থ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়—এটিই আত্মা। লস এঞ্জেলস্-এর একটি বাচ্চা মেয়ে তার ভাইয়ের মৃতদেহ থেকে এধরনের কুয়াশা বেরিয়ে যেতে দেখেছিল, অবশ্যি ওর মা বা অন্য কেউ তা দেখেননি। স্বামীজিও প্ল্যানচেটের আসরে দু'একবার নাকি ব্যাপারটা দেখেছেন। (পৃঃ ২৮) এ ব্যাপারটিও অসম্ভব। মৃত্যুর সময় কুয়াশার মত কিছু বেরিয়ে গেলে ক্যামেরায় তা ধরা পড়ার কথা, কোন দুর্ঘটনায় যখন কয়েকশত ব্যক্তি একসাথে মারা যান, তখন চারদিক কুয়াশায় ছেয়ে যাওয়ার কথা। কোনটিই হয় না, তার একটিই কারণ এই ধরনের আত্মার বা কুয়াশাকার আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। কল্পনাপ্রবণ শিশু বা অন্ধবিশ্বাসী স্বামীজিরাই এটি দেখতে পাচ্ছেন বলে ভুল করেন—যা প্রকৃতপক্ষে মতিভ্রম (**hallucination**) অথবা তাঁরা ইচ্ছে করেই মিথ্যে কথা বলেন।

এই ভাবে আরো অজস্র মিথ্যে, গাঁজাখুরি বা ভ্রান্ত অনুভূতিজনিত নানা তথ্য দিয়ে বইটিতে আত্মার অস্তিত্বের সপক্ষে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। আত্মার তথা এই ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাসের সপক্ষে এই ধরনের নানা অপযুক্তিই হাজির করা হয়। আর এই ভাববাদী চিন্তা কিভাবে শাসকশ্রেণীর স্বার্থপুষ্টকরে তা স্বামী অভেদানন্দের এই মন্তব্য থেকে বোঝা যাবে। তিনি বলেছেন, "আমরা মনে করি যে, জন্মের সময় আমাদের আত্মা পরমেশ্বর থেকে বিচ্ছুরিত হয়,···সুখ-দুঃখ আমাদের অতীত জীবনেরই ফলস্বরূপ।" (ঐ, পৃঃ ১৮৪) অর্থাৎ কোন ধূর্ত জননেতা বা অসৎ ব্যবসায়ী অন্যকে প্রতারিত করে সম্পদ-সুখ-সম্ভোগ অর্জন করলে তার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয় বা যে সমাজব্যবস্থা এর সুযোগ করে দেয়, ঐ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই—কারণ ব্যক্তিটির পূর্বজন্মেই ঠিক হয়ে গেছে সে এই সম্পদের অধিকারী হবে অথবা একইভাবে তার হাতের রেখায় লেখা রয়েছে, তার কুষ্ঠিতে আছে ইত্যাদি। আবার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও যে ব্যক্তি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করার মত সম্পদ পায় না, তারও পেছনে সামাজিক বৈষম্য, শাসকশ্রেণীর ভূমিকা দায়ী নয়, দায়ী তার পূর্বজন্মের আত্মার ক্রিয়াকলাপ। অতএব ব্যক্তি নিমিত্ত মাত্র। ভূমিদাসত্ব বা ক্রীতদাসত্বও তাই পূর্বজন্মের লিখন। এই ভাবেই ব্যাপক মানুষকে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, দর্শন ইত্যাদির নাম করে ঠকিয়ে শাসকশ্রেণীরা নিজেদের স্বার্থকে বজায় রাখে।

আত্মার যেহেতু কোন অস্তিত্ব নেই, তাই পুনর্জন্ম, জন্মান্তর, আত্মার শান্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি করা বা প্রার্থনা করা, প্রেতাত্মা ইত্যাদি ধরনের যে সব বিশ্বাস আত্মার ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সে সবই ভ্রান্ত।

মৃত্যু ও মৃতদেহ

হিন্দুদের বাড়ীর কেউ মারা গেলে জ্ঞাতিদের অশৌচ পালন করতে হয়। এই সময় আমিষ জাতীয় খাদ্য খাওয়া বারণ।

এছাড়া এই সময় কোন পূজা-অনুষ্ঠান না করার মত অনেক নিয়মও পালন করতে হয়। আর যে বা যিনি মারা গেছেন তাঁর পিণ্ড যে দেবে অর্থাৎ প্রেত-কাজ যে করবে তাকে আরো অনেক নিয়ম মানতে হয়। যেমন—জুতো, সেলাইকরা জামাকাপড় ইত্যাদি না পরা, দাড়ি গোঁফ চুল না কাটা, ছাতা-তেল ইত্যাদি ব্যবহার না করা, যৌন সংসর্গ না করা, ইত্যাদি। বর্ণাশ্রম ভাগ অনুযায়ী ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র ইত্যাদিদের ক্ষেত্রে কতদিন ধরে এসব নিয়ম পালন করতে হবে তা ভিন্ন (ব্রাহ্মণদের ১০ দিন, শূদ্রদের ১ মাস)। খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে কয়েকদিন ধরে প্রার্থনা করা হয়—উদ্দেশ্য মৃতের আত্মার শান্তি সাধন করা। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও কোরাণখানি করা হয়। মৃত-দেহটিকেও কিভাবে সৎকার করা হবে তা বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে বিভিন্ন। হিন্দুরা মৃতদেহকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে পোড়ায়। কেউ কেউ আবার এই কাপড়ে যেন গাঁট না দেওয়া হয় তা খেয়াল করে, বিশ্বাস এই গাঁট 'ইহ জগতের' সাথে মৃতব্যক্তিকে বন্ধন করে রাখবে, ফলে মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তি হবে না। খ্রীষ্টান ও মুসলমানরা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাতে বা কফিনে পুরে মৃতদেহ শুইয়ে কবর দেয়। বৈষ্ণব বা কিছু কিছু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃতদেহকে বসিয়ে কবর দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। কেউ কেউ আবার সলিল সমাধি অর্থাৎ জলে, বিশেষত গঙ্গাজলে মৃতদেহকে ভাসিয়ে দেয়,—আশা করা হয়, পুণ্যসলিলা গঙ্গায় মৃতব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি হবে। অনেক হিন্দু সম্প্রদায় আবার মৃতব্যক্তিকে নগ্ন অবস্থায় দাহ করে—মানুষ নগ্ন অবস্থায় পৃথিবীতে 'এসেছে', ঐ নগ্ন অবস্থাতেই যাওয়া উচিত, এটিই বিশ্বাস।

পৃথিবীর নানা গোষ্ঠীর মধ্যে এইভাবে মৃত্যুকে ঘিরে হাজারো সংস্কার চালু রয়েছে। তবে প্রায় সব গোষ্ঠীরই বিশ্বাস মৃত্যুর সময় আত্মা বা এই ধরনের শক্তি দেহ ছেড়ে চলে যায়। সে অবিনশ্বর,— 'পৃথিবী বা মর্ত্যলোক ছেড়ে সে উর্দ্ধে চলে যায়' স্বর্গলোকে কিংবা

নরকে। আর শ্রাদ্ধ, প্রার্থনা ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান করে ঐ আত্মার তৃপ্তি ও মুক্তির চেষ্টা করা হয়। স্পষ্টতঃই অস্তিত্বহীন আত্মার জন্য এই ধরনের হাস্যকর প্রচেষ্টাগুলি করার কোন যুক্তি নেই।

আর অশৌচপালনের ব্যাপারটিকে অনেকে প্রিয়জনবিরহে শোকপালনের অংগ হিসেবেই দেখেন। প্রিয়জন মারা যাওয়ার পর অন্ততঃ কিছুদিন সুখাদ্য না খেয়ে, সাজগোজ না করে কৃচ্ছ্র সাধন করা দরকার—এটিই একটি মানবিক চিন্তা। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিবেশে এ বিভিন্ন রূপ পেয়েছে, বিভিন্ন বিধিনিষেধের সৃষ্টি করেছে। এই শোকপালনের ব্যাপারটির মধ্যে অবশ্যই একটি মানবিক অনুভূতি কাজ করে, কিন্তু অশৌচের হাজারো আগড়ুম বাগড়ুম প্রায়শঃই একটি যান্ত্রিক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। কয়েক শতবছর আগে যেসব ধারণা থেকে এগুলির সৃষ্টি, মানুষের জ্ঞানের বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনের পরেও সেগুলিকে আঁকড়ে রাখা পিছিয়ে পড়া চিন্তারই পরিচয় বহন করে। মৃতব্যক্তিকে নিশ্চয়ই স্মরণ করা উচিত, সমাজে তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত, তাঁর ভাল কাজগুলি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত, ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি করে বা না করে মাটিতে শোওয়া, দাড়ি-গোঁফ না কাটা ইত্যাদির মধ্যে মৃতব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানান বা স্মরণ করার ক্ষেত্রে আলাদা কোন তাৎপর্য নেই। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে অনেকে এসব করতেও পারেন না, এর জন্য তাঁর উপর মৃতব্যক্তির কোন আত্মার কোন উৎপাতও হয় না, তাঁর নিজেরও কোন ক্ষতি হয় না,—যদি না অন্ধ বিশ্বাসের জন্য না-করতে পারার অপরাধবোধ মানসিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে।

কেউ মারা যাওয়ার পর ধারণা করা হয়, তার পরিবার ও জ্ঞাতিরা আর শুচি থাকলেন না। এ থেকেই অশৌচের ধারণা। শোক ও শুচিতা—এই দুটি আলাদা ধারণা একসময় মিলেমিশে গেছে। মৃতদেহকেও অশুচি ভাবা হয়, মৃতদেহ ছুঁলে স্নান করা,

কাপড় পাল্টান ইত্যাদি করতে হয়। এর একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি হল, যদি কোন সংক্রামক বা তীব্র জীবাণু আক্রমণ-জনিত কোন রোগে মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে মৃতদেহ ছুঁলে বা কাপড়-চোপড় মৃতদেহের সংস্পর্শে এলে এই রোগ বা জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে, তাই তার পরে শরীর পরিষ্কার করা ইত্যাদি দরকার। কিন্তু আরো অনেক সংস্কারের মত এটিও নিছক সংস্কারেই পরিণত হয়েছে, তার বাস্তব উপযোগিতাকে আর মাথায় রাখা হয় না। সংক্রামক বা জীবাণু আক্রমণজনিত কোন রোগে না ভুগেও যে মারা গেছে তার মৃতদেহ ছুঁলেও একই সংস্কার অনুসরণ করা হয়, যেমন হার্ট এ্যাটাক বা স্ট্রোকে মারা যাওয়া লোকের ক্ষেত্রে। আবার সংক্রামক রোগে ভোগা কোন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে আত্মীয় স্বজনরা বিনাদ্বিধায় প্রণাম করে যান, কোন সাবধানতা না দিয়েই ; কিন্তু যেই তিনি মারা গেলেন অমনি ঐ মৃতদেহ ছোঁয়ার জন্য নানা বিধিনিষেধ বা কাজকর্ম—যা হয়তো সাবধানতারই লক্ষণ—করা হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শরীরে প্রাণের অনস্তিত্বছাড়া অন্য কোন ভয়ংকর পরিবর্তন ঘটে না যে, তার জন্য মৃতদেহ ছুঁলেই স্নান করতে হবে বা জামাকাপড় ছাড়তে হবে। তবে মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা পরে মৃতদেহের জৈব পদার্থের পচন ঘটতে পারে, জীবাণুর সংক্রমণও হতে পারে। তখন ঐ মৃতদেহকে ছুঁলে বা নাড়াচাড়া করলে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। মৃতদেহ কবর দিয়ে বা শ্মশান থেকে মড়া পুড়িয়ে ফিরলে বা মৃতদেহ ছুঁলেও নিমপাতা দাঁতে কাটার প্রথা অনেক জায়গায় আছে। এও আসলে হয়তো জীবাণু সংক্রমণের বিরুদ্ধে সাবধানতা। নিমপাতা, নিমগাছের বাকল ইত্যাদির মধ্যে মার্গারিক এ্যাসিড (হেপটাডেকানোইক অ্যাসিড) সহ কিছু পদার্থ থাকে যা রোগ জীবাণুকে প্রতিরোধ করে। আগে হয়তো শ্মশান বা মৃতদেহের সংস্পর্শ থেকে এসে নিমপাতা বেশ কয়েকটা চিবিয়ে খাওয়ার ও নিমগাছের ছাল-পাতা সেদ্ধ জল দিয়ে স্নান করার প্রথা ছিল। আসলে এভাবেই রোগ-জীবাণুর প্রতিরোধ

করা বা ধ্বংস করা সম্ভব। পরে ধীরে ধীরে ব্যাপারটি তার বাস্তব উপযোগিতা হারিয়ে শুধু নিমপাতা দাঁতে কেটে ফেলে দেওয়ার সংস্কারে পরিণত হয়েছে—যদিও এতে রোগজীবাণু যদি কিছু এসে থাকেও তবে তা ধ্বংস হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আর যাঁরা নিমপাতা ছাড়া, রোগজীবাণুনাশক সাবান ও লোশন ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন, তাঁরা নিমপাতার ব্যবহার নাও করতে পারেন। যাঁরা এই সাবান ইত্যাদিকে ব্যবহার করতে পারেন না, তাঁরা প্রয়োজন হলে নিমপাতা বা এই জাতীয় গাছগাছড়াকে পূর্বোক্তভাবে ব্যবহার করতে পারেন, শুধু একটি পাতা নিয়ে দাঁতে কেটে ফেলে দিয়ে নয়।

মৃত্যুর পরে মানুষ পৃথিবী ছেড়ে অন্য লোকে যায়, সেখানেও তার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দরকার হবে,—এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মৃতদেহের সংগে কিছু জিনিষপত্র দিয়ে দেওয়া হয়। যেমন বৈষ্ণবদের সমাধি দেওয়ার সময় তার ভিক্ষার ঝোলাও সঙ্গে দেওয়া হয়। হিন্দুদের মধ্যে মৃতদেহের মুখের সামনে চালকলা মেখে পিণ্ড করে ধরা হয়, যেন দেহটি পুড়ে যাওয়ার আগের শেষ খাবার। বলা বাহুল্য এই খাবার মৃতদেহ বা তার অস্তিত্বহীন আত্মা খায় না, খাবারটি গুণগত ও পরিমাণগত—উভয় দিকেই অপরিবর্তিত থাকে ; ফেলে দিলে বেড়াল-কুকুরও খায়। আবার বৈতরণী নদীর ধারণা থেকে মৃতদেহের সাথে বা হাঁড়িতে ঝুলিয়ে সোনারূপা বা মুদ্রা দিয়ে দেওয়া হয়—বৈতরণী নদী পেরুনর সময় শেষ পারানির কড়ি হিসেবে, মাঝিকে তার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য। বলাবাহুল্য এটিও হাঁড়ি ভেঙ্গে সংগ্রহ করে ডানপিটে ছেলেরা বা কুড়িয়ে নেয় ভিখিরিরা। গ্রীকরাও এ ধরনের একটি নদী স্টিক্স (Styx)-এর কল্পনা করত। মিশরের রাজারা মারা যাওয়ার পর তাঁদের কবরেও দামী বাসনকোসন, এমনকি জ্যান্ত দাস-দাসীদের কবর দেওয়া হত। কয়েক শত বছর পরে কবর খুঁড়ে ঐসব জিনিষপত্র ও দাসদাসীদের কংকাল পাওয়া গেছে, এরা যে রাজার আত্মার সঙ্গে স্বর্গে যায় নি

তা স্পষ্ট। যেতে পারেও না, কারণ স্বর্গ বা নরক নামে আত্মার যাওয়ার মত কোন স্থানের অস্তিত্ব নেই, আর আত্মারও অস্তিত্ব নেই। একইভাবে চীনে তাং রাজবংশের (প্রায় ৬১৮-৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ) সম্রাটদের, আসামের অহোম রাজাদের, মোগল বাদশাহের, মিশর ও গ্রীসের রাজাদের—পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ব্যক্তির কবরেই এ ধরনের বহু জিনিষপত্র পাওয়া গেছে,—উদ্দেশ্য একই।

মাতা-পিতার মৃত্যুকে বলা হয় 'মহাগুরু নিপাত'। সংস্কার আছে এর একবছরের মধ্যে বাড়ীর, বিশেষতঃ সন্তানদের কোন ক্ষতির, এমনকি মৃত্যুরও সম্ভাবনা থাকে। তাই মহাগুরু নিপাতের পর একবছর খুব সাবধানে থাকতে হয়। আসলে সন্তানের জন্মের জন্য পৃথিবীতে এত লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে একমাত্র মা-বাবাই দায়ী। তাই তাঁদের মৃত্যুকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার জন্য এই ধরনের গালভরা নাম। এছাড়া সাধারণ ভবে যে কারোর সঙ্গে তার বাবা-মায়ের সম্পর্কই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও সরাসরি বংশগতি (heredity)-র মাধ্যমে শারীরিক-মানসিক সম্পর্ক থাকে। বাবা-মায়ের মৃত্যু সন্তানের মধ্যে যে প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে বা করা উচিত, তার থেকে তাকে সতর্ক করার জন্যই এ ধরনের নির্দেশ, কারণ বাবা-মায়ের অভাবে সাংসারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁদের জন্য মানসিক অস্থিরতা নানা ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটাতে পারে।

মৃত্যুর নির্দেশক হিসাবে কুকুর, বেড়াল, শকুন, কাক, পেঁচা ইত্যাদি জীবজন্তু ও পাখি কিছু ভূমিকা পালন করে বলে সংস্কার আছে। বাড়ীতে কেউ অসুস্থ থাকা অবস্থায় বেড়াল বা কুকুর কাঁদলে মৃত্যু আসন্ন বলে আশংকা করা হয়। শকুনি ঘরের আশে-পাশে উড়লেও এধরনের ভয় করা হয়। আসলে শকুনির খাদ্য যেহেতু জীবজন্তুর মৃতদেহ তাই এধরনের সংস্কার। একইভাবে কাক বা পেঁচার ডাকও মৃত্যুর নির্দেশ দেয় বলে বিশ্বাস। ঋগ্বেদেও আছে "যদুলূকো বদতি মোঘমেতদ্ যৎ কপোতঃ পদমগ্নৌকৃনোতি। যস্যদূতঃ

প্রহিত এষ এতৎ তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে।” (১০।১৬৫।৪) অর্থাৎ ‘এই পেঁচা যা বলছে তা মিথ্যে হোক! এই কপোত তার পা রেখেছে অগ্নিকোণে। এ যমের দূত—সেই যম, সেই মৃত্যুকে নমস্কার।’ ৩০০০ বছরের আগে থেকেও যে এ ধরনের বিশ্বাস চালু ছিল তা এ থেকে বোঝা যায়। জ্বলজ্বলে গোল চোখ দুটি সহ পেঁচার বিদ্‌ঘুটে চেহারা ও তার কর্কশ ডাক-ই যথাসম্ভব তাকে মৃত্যু বা এই ধরনের বিপদের সম্ভাবনার সাথে যুক্ত করেছে। হিমালয়ের কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বাস আছে, বাঘমারি নামে শেয়ালের মত দেখতে একটি জন্তু যদি বাড়ীর পাশে তিনবার করুণ সুরে ডাকে তবে বাড়ীর কারোর মৃত্যু আসন্ন। অনেকে ঐসব সংস্কারকে নানা ধরনের ব্যাখ্যা দেন। কারোর মতে এই সব জীবজন্তুর কিছু অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে, যার সাহায্যে ওরা এই ধরনের বিপদের অগ্রিম আভাস পায়। যতদূর দেখা গেছে, এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। বছরের বিশেষ ঋতুতে কুকুর-বেড়াল জাতীয় প্রাণীর যৌন উত্তেজনা তথা সন্তান-ধারণের স্পৃহা বাড়ে; এটি অনুকূল আবহাওয়া, তাপমাত্রা ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক যুক্ত। এই সময় এই জাতীয় প্রাণীরা অস্বাভাবিক কিছু শব্দ করে, যাকে কান্না বলে ভুল করা হয়। আর এই ধরনের অস্বাভাবিক শব্দের সাথে পরিবারের উদ্বেগ ও আশংকা মিশে আতংকের সৃষ্টি করাটা অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে বেড়াল, কুকুর, ঘোড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশু দীর্ঘদিন বাড়ীতে থাকতে থাকতে বাড়ীর লোকেদের সাথে অনেক ব্যাপারেই একাত্ম হয়, অনেক কিছু অনুভব করতে পারে—কারণ নিম্নস্তরের হলেও তারাও মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী, তাদেরও রয়েছে আবেগ ও চিন্তাকরার ক্ষমতা। এই কারণে প্রভুর আসন্ন বিপদ বা পরিবারের দুশ্চিন্তাকে তথা অস্বাভাবিক পরিবেশকে তারা অনুভব করতে পারে। এ সবের জন্যও তাদের মধ্যে অস্থিরতা, অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য ইত্যাদি দেখা দেয়। তবে অনেকে এধরনের ব্যাখ্যাও দেন যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির আত্মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অদৃশ্য

অবস্থায় যমদূত ইত্যাদিরা বাড়ীর আশেপাশে ঘোরাফেরা করে—এই সব জীবজন্তুরা তাদের দেখতে পায় ও তাই কান্নাকাটি করে। এ ব্যাপারটি নিছকই গ্যাঁজা। এর প্রধান কারণ এই ধরনের যমদূত বা যমরাজার কোন অস্তিত্ব নেই। তাই তাদের দেখতে পাওয়া বা অনুভব করতে পারারও প্রশ্ন ওঠে না।

মৃত্যু সম্পূর্ণই একটি জৈব প্রক্রিয়া। প্রাণবান শরীরের মধ্যে অসংখ্য জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা-ই শরীরকে প্রাণচঞ্চল রাখে ও নানাবিধ কাজকর্মের জন্য শক্তি জোগায়। মৃত্যুর ফলে এই রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে শক্তির সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। একটি জ্বলন্ত মোমবাতির মোমের সাথে বাতাসের অক্সিজেন-এর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যেমন কার্বনডাই অক্সাইড ও তাপশক্তি নির্গত হয়, এবং মোমবাতি নিবিয়ে দিলে তার থেকে যেমন কোন আত্মা বেরিয়ে যায় না, এই রাসায়নিক ক্রিয়াটিই বন্ধ হয়ে যায়, তেমনিই জীবন্ত শরীরের মৃত্যুর সময়ও একই ব্যাপার ঘটে—যদিও আরো জটিলভাবে। নিবিয়ে দেওয়া মোমবাতি যেমন অশুচি হয় না, মৃতদেহও তেমনি অশুচি নয়। মোমবাতি জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হওয়ার আগের মুহূর্তে যেমন কোন অস্তিত্বহীন যমদূত তার চারপারে ঘোরাঘুরি করে না, তেমনি মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্যও এ ধরনের কেউ আসে না। মোমবাতির কোন স্নায়ু নেই, মস্তিষ্ক নেই—সে কোন চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু মানুষের তা আছে। আর তার কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই। তাই একে ঘিরে সে অবিনশ্বর আত্মাসহ হাজারো কল্পনা ও সংস্কারের সৃষ্টি করেছে—মৃত্যুর পর তার কিছুই থাকবে না—এ ধরনের ভয়াবহ অবস্থা থেকে মানসিক মুক্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু সত্যিই মৃত্যুর পর একজনের শরীর ও প্রাণের কিছুই থাকে না। সমাজে অন্যদের মধ্যে টিকে থাকে শুধু তার সামাজিক অবদানটুকু। তাই আত্মার উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম নয়—সমাজপ্রগতির জন্য সঠিকভাবে কাজ করার চেষ্টার মধ্যেই একজন মানুষ বহু মানুষের মধ্যে বহুদিন ধরে বেঁচে থাকতে পারেন।

গর্ভাবস্থা

মায়ের পেটে শিশুটি থাকে মূত্রথলি ও মলাশয়ের মধ্যবর্তী জরায়ুর মধ্যে। যৌনসঙ্গমের পরে নারীর ডিম্বকোষ ও পুরুষের পুংজনন-কোষের নিষিক্তকরণ (fertilisation) ঘটলে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়—প্রথমে এটি থাকে একটি মাত্র কোষ। পরে মায়ের জরায়ুতে এটিই বিভক্ত হতে হতে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুর সৃষ্টি হয়। সাধারণত ২৮০ দিন পরে (১০ চান্দ্র মাস) এই শিশু জরায়ু থেকে ভূমিষ্ঠ হয়। এই ২৮০ দিনের সময়টিই গর্ভাবস্থার সময়।

মূলতঃ গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করার জন্যই নানা ধরনের বিধিনিষেধ ও সংস্কার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ অনুসরণ করে। বলা হয় গর্ভবতী রমণী ভরদুপুরে বা সন্ধ্যেবেলা বাড়ীর বাইরে বেরোলে খোলাচুলে একটা গিঁট দিয়ে নেবে এবং সঙ্গে রাখবে একটি লোহার টুকরো বা সর্ষে ইত্যাদি। পাঞ্জাবে নিয়ম আছে এসময় হাতে-পায়ে মেহেদি লাগাবে না এবং আঁচলে হিং বেঁধে রাখবে। এই ধরনের অজস্র সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে প্রেতাত্মা বা অপদেবতার ধারণা থেকে। যেহেতু একটি নতুন প্রাণ সৃষ্টি হচ্ছে তাই এই নতুন শরীরে বদ্ কোন আত্মা ভর করতে পারে—এই ধরনের ভয় করা হয়। তাই লোহা বা সর্ষের বিধান। যেহেতু আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই, তাই প্রেতাত্মা ইত্যাদিরও অস্তিত্ব নেই, আর গর্ভস্থ শিশুর উপর তার ভর করারও কোন সম্ভাবনা নেই।

হিস্টেরিয়া ও মৃগীর যে ধরনের ফিট্ কে ভূতে ধরা হিসেবে ভাবা হয় গর্ভবতী রমণীও এই ধরনের ফিট বা খিঁচুনিতে আক্রান্ত হতে পারেন। যদিও ব্যাপারটি কম মহিলার ক্ষেত্রেই হয়, তবু, দু'চারটি উদাহরণ থেকেই এই ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে যে গর্ভবতী মহিলার উপরও ভূত-প্রেত ভর করে। আসলে ব্যাপারটি 'এক্ল্যাম্পসিয়া' নামে একটি ভয়াবহ রোগ। অনেক গর্ভবতী মহিলার রক্তচাপ বেড়ে যায়, পা-ফুলতে থাকে এবং রক্তের মধ্যে এক ধরনের বিষাক্ত জৈব-রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি ঘটে। এর ফলে খিঁচুনি, অজ্ঞান

হয়ে যাওয়া ইত্যাদি হয়। ব্যাপারটি মা ও শিশু—উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক হতে পারে। এক্ল্যাম্পসিয়ার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ রোগিনীই হন যে মহিলা প্রথম গর্ভবতী হয়েছেন তিনি। সম্পূর্ণ বিশ্রাম, মস্তিষ্কের উত্তেজনাকে স্তিমিত করা ও অন্যান্য ওষুধপত্রের সাহায্যে ব্যাপারটিকে সামাল দেওয়া সম্ভব। কিন্তু রোগটিকে ভূতে ধরা বলে ভেবে, ওঝা-গুণিন শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে সময় নষ্ট করলে মা ও শিশুকে মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেওয়া হবে মাত্র। বিরল ক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা না পাওয়া এই ধরনের কোন কোন রোগিনী ও তাঁর গর্ভস্থ শিশু প্রাণে বেঁচেও যেতে পারেন। কিন্তু যে শিশুর জন্ম হবে সে সাধারণতঃ জড়-বুদ্ধি হয়ে জন্মায়, হাত-পা ঠিকমত নাড়তে পারে না, মুখ দিয়ে লালা গড়ায়, ভালভাবে কথা বলতে পারে না, বুদ্ধির বিকাশও ঘটে না। এটিকেও আবার ভূতে ধরা শিশু বলে ভাবা হয়—যেহেতু সে যখন পেটে ছিল তখন তার মাকে 'ভূতে ধরেছিল'। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি ঘটে গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষতির কারণে (cerebral palsy)।

গর্ভাবস্থায় জোড়াকলা খেলে যমজসন্তান হবে—এ ধারণাটি বেশ ব্যাপক। এবং এতই ব্যাপক যে, কুমারী অবস্থা থেকেই মেয়েদের জোড়াকলা খাওয়ান হয় না। অথচ জোড়াকলা খাওয়ার সাথে জোড়া বাচ্চা হওয়ার বিজ্ঞানসম্মত কোন সম্পর্ক প্রমাণিত নয়। একজন ঋতুবতী নারীর প্রতি ঋতুচক্রে (সাধারণত ২৮ দিনের ; menstrual cyele) একটি মাত্র ডিম্বকোষ দুটি ডিম্বাশয়ের কোন একটি থেকে বেরোয়। যৌনসঙ্গমে পুরুষের বীর্যে থাকা বহু সহস্র পুংজনন কোষের মাত্র একটির সাথে এর মিলন বা নিষিক্তকরণ (fertilisation) হতে পারে এবং এর ফলে সৃষ্টি হয় একটি ভ্রূণ যা একটি সন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু যদি কোন কারণে একাধিক ডিম্বকোষ নির্গত ও নিষিক্ত হয় তবে ঐ সংখ্যক শিশুর জন্ম হতে পারে। আবার একটি ডিম্বকোষের সাথে একটি পুংজনন কোষের মিলনে যে একটি মাত্র ভ্রূণের সৃষ্টি হয় সেটি প্রাথমিক অবস্থায়

একাধিক স্বাধীন ভ্রূণে বিভক্ত হয়ে একাধিক শিশুর জন্ম দিতে পারে। এইভাবে ছুটি, তিনটি, চারটি বা তার বেশী শিশুর জন্ম হতে পারে। এর মধ্যে প্রথম ব্যাপারটিই তুলনামূলকভাবে বেশী ঘটে এবং এর পেছনে বংশগতি (heredity)-র একটি ভূমিকা আছে। একই বংশের মধ্যে এ ব্যাপারটি বেশী ঘটে। আর দ্বিতীয় কারণটির পেছনে প্রাথমিক ভ্রূণের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও হরমোনের প্রভাব কাজ করে। মস্তিষ্কের মধ্যে থাকা পিটুইটারী গ্রন্থি নিঃসৃত গোনাডোট্রোপিক হরমোন এই প্রভাব ফেলতে পারে বলে দেখা দেখা গেছে। একসাথে একাধিক শিশুর জন্মগ্রহণের ব্যাপারটায় ছুটি অর্থাৎ যমজ বাচ্চার ঘটনা ঘটে তুলনামূলক ভাবে বেশী—প্রায় প্রতি ৮০ জন গর্ভবতী নারীর মধ্যে একজনে, তিনটি বাচ্চার ঘটনা ঘটে আরো কম—মোটামুটি ৮০×৮০ জন গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রে একটি ; একসাথে ৪টি বাচ্চা হয় প্রায় প্রতি ৮০×৮০×৮০ টি প্রসবের মধ্যে একটিতে, ইত্যাদি। যখন একটি নিষিক্ত ডিম্বকোষ (fertilised ovum) থেকে যমজের জন্ম হয় তখন অবশ্যই ঐ যমজ শিশু ছুটিই হয় ছেলে বা মেয়ে হবে এবং চেহারা-আচরণ-মানসিকতার ক্ষেত্রেও প্রায় একই রকম হয়, এমনকি তাদের বিভিন্ন রোগ হওয়ার প্রবণতার ক্ষেত্রেও মিল থাকে। অন্যদিকে একাধিক ডিম্বকোষ নিষিক্ত হয়ে যমজ বা তার বেশী শিশুর জন্ম হলে শিশুগুলির কোনোটি ছেলে কোনোটি মেয়ে হতে পারে এবং তাদের মধ্যে আচার-আচরণ-মানসিকতার ততটা মিল থাকবে না। জোড়াকলা সৃষ্টি হওয়ার পেছনেও প্রায় এই ধরনের ব্যাপার ঘটে (পুং ও স্ত্রী জনন কোষের দিক থেকে) কিন্তু তার মধ্যে এমন কোন হরমোন বা পদার্থ থাকে না যা, কোন মেয়ে খেলে তার শরীরে গিয়ে ডিম্বকোষের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আর সব চেয়ে বড় কথা কলাগাছ ও মানুষের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া তথা ডিম্বকোষের নিঃসরণ, নিষিক্তকরণ ইত্যাদি গুণগতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ায় উদ্ভিদের কোন হরমোন (plant hormone) মানুষের

শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মকে প্রভাবিত করতে পারে না। একইভাবে মানুষের হরমোন কোন উদ্ভিদের শরীরে ইন্‌জেকশান করে দিলে চারাগাছটি মানুষের মত দেখতে আদৌ হবে না। তাই জোড়াকলা খেলে যমজ হবে এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল।

আসলে আরো বহু সংস্কারের মত এ-সংস্কারটিরও সৃষ্টির পেছনে সদৃশবিধান (homeopathic law)-এর মানসিকতা কাজ করেছে। অর্থাৎ এক ধরনের কাজ করলে ঐ ধরনেরই ফল হবে। মানুষের মত দেখতে কোন পুতুল বানিয়ে বা কল্পনা করে আঘাত করে ঐ মানুষের ক্ষতি-করার কথা ভাবা (অর্থাৎ বাণ মারা) বা কুমারী মেয়ে রাত্রে উলঙ্গ হয়ে মাঠে জলসিঞ্চন করলে বৃষ্টি হবে—এ ধরনের ধারণা এইভাবেই সৃষ্টি। একইভাবে জোড়াকলা খেলে যমজ বাচ্চা হবে এ ধরনের আশংকার সৃষ্টি হয়েছে।

আবার অনেক জায়গায় এরকম বিশ্বাস আছে যে, গর্ভের পঞ্চম মাসে দুটো হাঁসের ডিম খেলে বাচ্চার চোখ ডিমের মত বড় হবে। গর্ভাবস্থায় ডিম খাওয়া ভাল—কারণ এতে মায়ের তথা গর্ভস্থ শিশুর উপযুক্ত পুষ্টির যোগান হয়। কিন্তু এতে বাচ্চার চোখ আদৌ বড় হয় না। চক্ষুগোলকের আকার অস্বাভাবিকভাবে বেশী হলে বা চক্ষু কোটর থেকে চক্ষু গোলক বেরিয়ে এলে সেটি অসুস্থতারই লক্ষণ। সাধারণভাবে চোখের পাতার মধ্যবর্তী ফাঁক বেশী হলে চোখ বড় দেখায়। ব্যাপারটি চোখের পাতার আকার ও মাংসপেশীর অবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত—কিন্তু বাইরের একটি ডিমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

সদৃশবিধানের ধারণা থেকেই ভাবা হয় অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মাছ কাটলে বা তার স্বামী হাঁস, মোরগ, ছাগল ইত্যাদি কাটলে বাচ্চার ঠোঁট কাটা হবে। মায়ের জরায়ুর মধ্যে থাকা মানবশিশুর ভ্রূণের মধ্যরেখার দুই দিকের অংশের সুষ্ঠু সংযোগে অক্ষত ঠোঁট-এর সৃষ্টি হয়। এই সংযোগ বা জোড়া লাগার কাজটি ঠিকমত না হলে উপরের ঠোঁটে ফাঁক থেকে যায় (cleft lip)। সুতরাং এর সাথে

মাছকাটা বা স্বামীর মুরগি কাটার মত বাইরের ঘটনার সম্পর্ক কোথায় !

গর্ভাবস্থায় যৌনসঙ্গম আদৌ না করার সংস্কারও আছে। তবে বিশেষ সময়ে যৌনসঙ্গম না করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। যেমন, বিশেষতঃ প্রথম তিনমাসের মধ্যে অতিরিক্ত যৌনসঙ্গম গর্ভপাত ঘটাতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্যবতী, শক্ত সমর্থ ও গর্ভপাতের ইতিহাস যার নেই, এরকম মহিলা নিয়ন্ত্রিত ভাবে যৌনসঙ্গম করতে পারেন—এতে কোন ক্ষতি হয় না। আবার গর্ভাবস্থার শেষ ছয় সপ্তাহের সময় যৌনসঙ্গম না করাই ভাল—কারণ এতে যোনিপথের উপরের অংশে জীবাণু সংক্রমণ ও প্রসবের পরে স্থানীয় অংশে জীবাণু আক্রমণ জনিত প্রদাহের সৃষ্টি হতে পারে।

অন্তঃসত্বা অবস্থায় সুন্দর শিশুর ছবি দেখলে সুন্দর বাচ্চা হবে বা খারাপ কিছু দেখলে বাচ্চা খারাপ হবে—এ ধরনেরও বিশ্বাস আছে। বাচ্চার চেহারা সম্পূর্ণ নির্ভর করে মা-বাবাসহ পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া, বংশগতির মাধ্যমে, জিন (gene)-এর প্রভাবে এবং সাথে সাথে এই জিনের কিছু অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনে। মায়ের কিছু দেখা বা না দেখার উপর এটি নির্ভর করে না। তবে গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত উদ্বেগ. ধূমপান, মদ্যপান, হতাশা ইত্যাদি মায়ের রক্তে যে বিভিন্ন ধরনের হরমোন ও রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ ঘটায় সেটি গর্ভস্থ শিশুর শরীরে গিয়ে তার স্নায়ুতন্ত্রকে তথা তার মানসিকতাকে কিছুটা প্রভাবিত করে। কিন্তু, গর্ভবতী স্ত্রীলোক যদি ভাত খাওয়ার পর পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে তিনবার কুলকুচি করে তবে তার চাঁদের মত সুন্দর বাচ্চা হবে বা চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণ দেখলে বিকলাংগ বাচ্চা হবে—এ ধরনের বিশ্বাসের কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই। তবে এ সব অন্ধবিশ্বাসের জন্য মায়ের আনন্দ বা উদ্বেগ ভাবী শিশুর মানসিকতাকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে তা ভেবে দেখা যায়।

গর্ভাবস্থায় এটা করা, ওটা না করা—এইভাবে অজস্র সংস্কার

রয়েছে। এদের অধিকাংশেরই কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই, কোন কোনটি আবার হয়তো কিছুটা প্রয়োজনীয়। এদের সবগুলিকে আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। তবে প্রয়োজন যেটি তা হল স্বাভাবিক গর্ভাবস্থায় উপযুক্ত পুষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম বা সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করা, মানসিক সুস্থিতি, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (বিশেষতঃ টিটেনাসের বিরুদ্ধে) ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত পরিশ্রম যেমন ক্ষতিকর, তেমনি কোন কাজ না করাও ক্ষতির কারণ হতে পারে। অবশ্যি যে সব মহিলার ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার প্রথমের দিকে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ইতিহাস রয়েছে তাঁদের বিশ্রামেই থাকা উচিত। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা বা দুপুরবেলা বেরুনর উপর শিশু বা মায়ের কোন কিছু নির্ভর করে না।

গর্ভবতী রমণীর সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার,—এর মধ্যে প্রোটিন, ভিটামিন ও লৌহজাতীয় লবণের পরিমাণ যথেষ্ট হওয়া দরকার। কারণ শিশুর উপযুক্ত বিকাশের জন্য এ সময়-মায়ের শরীরে স্বাভাবিকের চেয়েও বেশীমাত্রায় প্রোটিন, ভিটামিন ও লৌহজাতীয় লবণের চাহিদা থাকে। দুধ, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি যেমন প্রোটিন-ভিটামিন-লৌহাদি লবণের উৎস (দুধে অবশ্য লৌহ ঘটিত লবণ থাকে না) তেমনি চাল, গম, টাটকা শাকসব্জি, এঁচড়, কাঁচাকলা, ডুমুর, মোচা, থোড় ইত্যাদি থেকেও প্রোটিন এবং ভিটামিন ও লৌহঘটিত লবণ ভাল পরিমাণে পাওয়া যায়।

যদিও ষষ্ঠী নামক কোন দেবীর কোন অস্তিত্ব নেই এবং মা ষষ্ঠীর কৃপায় সন্তানলাভ হয় না, হয় স্বামী-স্ত্রীর সফল যৌনমিলন-এর ফলেই, তবু অনেক গর্ভবতী মহিলাই ষষ্ঠী দেবীর পূজা ও উপবাস করেন তাঁকে সন্তুষ্ট করে সুসন্তান লাভের আশায়। কিন্তু এই অবস্থায় উপবাস শিশুর শরীরের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক, কারণ জরায়ুর মধ্যে প্রতিনিয়ত ভ্রূণকোষ বিভাজিত হচ্ছে, শিশুর মস্তিষ্ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সৃষ্টি হচ্ছে—এসময়

পুষ্টি খুবই দরকার। তাই সুসন্তান লাভের আশায় অতিরিক্ত উপবাস সুসন্তানের বদলে দুর্বল, জড়বুদ্ধি শিশুর সৃষ্টি করতে পারে।

গর্ভাবস্থার মাঝামাঝি বা তারপরে ধনুষ্টংকার বা টিটেনাস বিরোধী টীকা নেওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর প্রসবের সময় ও পরে এটি মা ও শিশুকে ধনুষ্টংকারের মত মারাত্মক রোগ থেকে মুক্ত রাখে। অবশ্য ভারতবর্ষের মত যে সব দেশে শতকরা আশিভাগ মা-ই যেখানে এই টীকা ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা দূরের কথা পুষ্টিকর খাবারদাবারই দুবেলা পেট পুরে পান না, সেখানে শুধুমাত্র বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিগুলি জানাই যথেষ্ট নয়, এসবের উপযুক্ত সুযোগও পাওয়া চাই যা আর্থসামাজিক রূপান্তর ছাড়া সম্ভব নয়। তবুও মিথ্যে সংস্কারকে আঁকড়ে রেখে নিজের ও ভবিষ্যৎ শিশুর সর্বনাশ না করে, যতটুকু পাওয়া যায় সেই সব সুযোগকেই কাজে লাগান উচিত, চেষ্টা করা উচিত বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার অর্জনের জন্য।

জন্মাশৌচ ও আঁতুড়ঘর

মৃতাশৌচের মত জন্মাশৌচও পালন করা হয়। পরিবারের কোন শিশুর জন্ম হলে সেই পরিবারটি অশুচি হয়ে গেল বলে বিশ্বাস। জন্মের পরবর্তী কয়েকটি দিন একারণে কোন পূজা অনুষ্ঠান বা অন্যান্য তথাকথিত শুভ কাজে অংশগ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

বলা বাহুল্য, নবজাত শিশুর জন্য অশৌচ পালনের বিশ্বাসটিও ভ্রান্ত। মৃতাশৌচের ব্যাপারটি ভ্রান্ত হলেও, মৃতদেহে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনার জন্য কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা ও সদ্যোমৃত ব্যক্তির জন্য শোকপ্রকাশ করার তবু কিছুটা গুরুত্ব থাকে। কিন্তু শিশুর জন্ম আনন্দেরই ব্যাপার—এর জন্য আনন্দ প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে অশৌচ পালনের ব্যাপারটির কোন উপযোগিতা নেই। তবে সাধারণভাবে শিশু মায়ের জরায়ু থেকে বেরোয় চটচটে আঠাল এ্যামনিয়টিক ফ্লুইডে ভেজা অবস্থায়। মায়ের জরায়ু থেকে রক্তক্ষরণও

হয়। সব ব্যাপারটিকেই নোংরা বা অশুচি বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। জরায়ুর মধ্যে শিশুটি একটি জলীয় পদার্থপূর্ণ থলির মধ্যে থাকে - এই জলীয় পদার্থকেই বলা হয় এ্যামনিয়টিক ফ্লুইড। এটি শিশুকে বিভিন্ন আঘাত থেকে রক্ষা করে—যেমন মায়ের পেটে ছোট-খাট আঘাত এর ফলে সরাসরি শিশুর উপর পড়ে না। তাপমাত্রার পরিবর্তন থেকেও এটি শিশুকে রক্ষা করে। জরায়ুস্থ শিশুর হাতপায়ের নাড়াচাড়াও এর ফলে সম্ভব হয় এবং শিশুর উপর বাইরের চাপ সুষম থাকে। এছাড়া এই চটচটে, আঠাল রসে ভেজা থাকার ফলে জন্মের সময় শিশু সহজে প্রসব হতে পারে। প্রতি ১০০ সি. সি. এ্যামনিয়টিক ফ্লুইডে প্রোটিন থাকে ১০০ ৫০০ গ্রাম, শর্করা জাতীয় পদার্থ থাকে ১০-৬০ গ্রাম, সাধারণ লবণ থাকে ৫৬০-৬৬০ গ্রাম, ইত্যাদি। কিন্তু কোন তথাকথিত নোংরা থাকে না বা কোন জীবাণুও থাকে না। এই সব পদার্থই শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং বাস্তবে এই জলীয় পদার্থটি শিশুর পুষ্টির ক্ষেত্রেও কিছুটা ভূমিকা পালন করে। শিশুর জন্মের পর এটিকে জীবাণুমুক্ত কাপড় দিয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার করাই যথেষ্ট। বড়জোর জীবাণুনাশক কোন পদার্থের দ্রবণের সাহায্যে বা পরিষ্কার জলে শিশুকে স্নান করিয়ে দেওয়া যায়। স্পষ্টতঃই এই জলীয় পদার্থটি জন্মের সময় শিশুকে অশুচি করেনা।

অন্যদিকে প্রসবের পরই মায়ের জননাঙ্গ থেকে প্রথমে প্রধানতঃ রক্ত (৩-৪ দিন) বেরোয়। এরপর ৩-৪ সপ্তাহ ধরে ক্রমশঃ পাৎলা রক্ত, ও সবশেষে জলীয় পদার্থের ক্ষরণ ঘটে। একে বলা হয় লোকিয়া (lochial discharge)। এটিও কোন নোংরা বা অশুচিকর ব্যাপার নয়, একটি স্বাভাবিক ঘটনাই।

কিন্তু তবু জন্মাশৌচের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করা হয়। এ ধরনের সংস্কারও আছে যে, জন্মের পর প্রায় ১০দিন শিশু সহ মা-কে আলাদা করে রাখতে হবে। এ সময় মাকে স্বাভাবিক খাবার-দাবারও দেওয়া হয় না। এটিও সম্পূর্ণ ভুল। প্রসবের ফলে মায়ের

যে রক্তক্ষরণ ও শারীরিক ক্ষয় হয়েছে এবং শিশুকে স্তন্যপান করানর জন্য, এসময় মায়ের পুষ্টি প্রয়োজন। মাকে স্বাভাবিকের চেয়েও অধিক ক্যালরিযুক্ত ও প্রোটিন-ভিটামিন-লৌহাদি লবণযুক্ত খাবার দেওয়া দরকার। গ্রামাঞ্চলে এখনো এ প্রথা চালু আছে যে, প্রসবের পর প্রথম কয়েকদিন প্রসূতিকে শুধু কাঁচকলা ভেজে খাওয়ান হয়। কাঁচকলায় লৌহঘটিত লবণ থাকে—এটি মায়ের রক্তক্ষরণের পরিপূরক হিসেবে কিছুটা কাজ করতে পারে, কিন্তু এর সাথে অবশ্যই অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দেওয়া উচিত, অন্যথায় স্তন্যদায়িণী মায়ের তথা মাতৃ স্তন্যপানরত শিশুর অপুষ্টি দেখা দেবে। তবে যতটা ভাবা হয়, কাঁচকলায় লৌহঘটিত লবণের পরিমাণ এমন কিছু বেশি নয়। (প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

প্রসবের পর মা ও শিশুকে আলাদা রাখার জন্য আঁতুড়ঘর নামে বিশেষ একটি অস্থায়ীঘর অনেক জায়গাতেই বানান হয়। কখনো এটি বাড়ীর বাইরে খড়ের তৈরী হয়, কখনো বাড়ীর মধ্যেই ঘেরা একটি জায়গা তৈরী করা হয়। এই সময়ে মা ও শিশুর উভয়ের পক্ষেই একান্ত প্রয়োজন উপযুক্ত পুষ্টির সাথে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণু আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। কিন্তু আঁতুড়ঘর অধিকাংশ স্থানেই হয় অপরিষ্কার এবং প্রায়শঃই মুক্ত আলো-হাওয়া বিহীন, প্রায় অন্ধকার ঘেরা একটি স্থান। এটি খুবই ক্ষতিকর। শীতের দিনে ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে, গরমের দিনে লু থেকে, বা বৃষ্টির দিনে জোলো হাওয়া থেকে উভয়কে রক্ষা করা যেমন দরকার তেমনি দরকার মুক্ত আলো-হাওয়ারও। অনেক স্থানেই নিয়ম আছে বদ্ধ আঁতুড়ঘরে সারারাত প্রদীপ বা আগুন জ্বালিয়ে রাখা। শিশুর জন্মের তিন দিনের মধ্যে বিধাতাপুরুষ (বা ফেরেস্তা) এসে শিশুর কপালে তার ভবিষ্যৎ লিখে যান, এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে ঐ বিধাতাপুরুষকে আলো দেখানর জন্য নাকি এ নিয়ম। কেউ আবার অপদেবতা যাতে অন্ধকারে প্রসূতি ও শিশুর কোন ক্ষতি না করতে পারে তাই আলো জ্বালিয়ে রাখে। এটিও ভ্রান্ত বিশ্বাস। আর

বদ্ধ আঁতুড়ঘরে সারারাত আগুন জ্বলার ফলে বিষাক্ত কার্বনডাই অক্সাইড ও কার্বন মনো অক্সাইড গ্যাস জমে—ফলে বিশেষ করে শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয় ; এইভাবে শিশুর মৃত্যু বা মা ও শিশু উভয়ের মৃত্যু, অনেক সময় ঘটে। অস্তিত্বহীন অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করার নির্বোধ আশায় অনেকে আবার মায়ের বালিশের নীচে দা, ছুরি বা লোহার কোন জিনিষ, এক মুঠো সর্ষে, কখনো বা আঁতুড়-ঘরের বাইরে কোন কাঁটা গাছ (যেমন হিমাচল প্রদেশে 'কড়ালী', বাংলাদেশে বিড়াল আঁচড় নামে একটি কাঁটাগাছের ডাল) ইত্যাদি রাখে। বলাবাহুল্য সবগুলিই অপ্রয়োজনীয়। তবে আঁতুড়-ঘরে কুকুর-বেড়াল বা শেয়াল ঢুকে পড়লে তাকে তাড়ানর জন্য কাঁটাগাছ, ছুরি বা দা'য়ের প্রয়োজন হতে পারে। আঁতুড় ঘরে শিশুর নাড়ী কাটা না হওয়া পর্যন্ত ছেলে কি মেয়ে বলা উচিত নয় বলে বিশ্বাস। বাচ্চাটি আদৌ বাঁচবে কিনা—এই ধরনের ভয় থেকেই হয়তো এর সৃষ্টি। কিন্তু ছেলে কি মেয়ে বলে দেওয়ার উপর শিশুর প্রাণ আদৌ নির্ভর করে না বা বল্লেও তার অন্য কোন ক্ষতি হয় না।

কোথাও নিয়ম আছে আঁতুড়-ঘরে সাতদিন পর্যন্ত প্রসূতি মাথায় ঘোমটা দেবে না। এও হয়তো ঘোমটার জন্য বাচ্চাটি যাতে মায়ের দৃষ্টির আড়ালে না পড়ে যায় তার চেষ্টা। সন্তান প্রসবের পর গর্ভপুষ্প (placenta) পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা উল্টে দিলে নাকি ঐ রমণীর আর সন্তান হবে না। এটি সম্পূর্ণ ই ভ্রান্ত একটি বিশ্বাস। শরীরের বাইরে পড়ে যাওয়া গর্ভপুষ্পের সোজা-উল্টো অবস্থানের উপর পরবর্তী শিশুর জন্ম আদৌ নির্ভর করে না। প্রসবের ৯-১১ দিন পর্যন্ত মা ও শিশু উভয়কেই অস্পৃশ্য করে রাখা হয়। এটিও যে ভ্রান্ত বিশ্বাস তা আগেই বলা হয়েছে। এই সময় রাত্রে কোন মেয়ে আঁতুড়ঘরের ভেতরে বা বাইরে শোবে—এ ধরনের নিয়মও আছে। প্রসবের পর মা বেশ কয়েকদিন অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্বল থাকে, তাই উভয়ের নিরাপত্তার জন্য একজনের থাকা দরকারই। এ কারণে স্থানান্তরে 'নয়ের কামান' বলে আর একটি প্রথা অবলম্বন করা হয়

যাতে স্বামীকে আঁতুড় ঘরের দরজার কাছে ন'দিন শুয়ে থাকতে হয়। আর আঁতুড় ঘরে জুতো পায়ে বা বাইরের লোকজনের না ঢোকা, ঢুকলে হাত পা সেঁকে নিয়ে ঢোকা, বাচ্চাকে বেশী না ছোঁওয়া, ইত্যাদিরও বাস্তব উপযোগিতা রয়েছে—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুসংক্রমণ রোধের জন্য।

প্রকৃতপক্ষে, হাসপাতালে যে সব শিশু জন্মায়, তাদের জন্মের সময় শাঁখ বাজে না, নানা আচার অনুষ্ঠানও করা হয় না, আঁতুড়ঘর বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার পালন করা হয় না। এই সব শিশুরা তুলনামূলক ভাবে বেশীই সুস্থ থাকে, কারণ প্রকৃত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা-গুলি গ্রহণ করা হয়। পূর্বোক্ত সংস্কারগুলির অনেকগুলিই যে, চিরন্তন ও অতি আবশ্যক নয়, তা এ থেকে বোঝা যায়।

বারবার মেয়ে—দোষ মায়ের ?

কোন স্বামী-স্ত্রীর হয়তো বারবার খালি মেয়েই হয়ে যাচ্ছে। নেহাত শিক্ষিত ও মুক্তমনা কিছু পরিবার ছাড়া অন্যান্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই দোষ পড়ে মায়ের ওপর। সেই-ই তো বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে। তাই, যেন তার কোন ত্রুটি রয়েছে বা তার ক্ষমতা নেই, তাই বারবার মেয়ে হচ্ছে, এধরনের ধারণা করা হয়। আর এ কারণে বাড়ীর লোকের গঞ্জনা ও বক্রোক্তির সীমা থাকে না। কখনো তা এমন অবস্থায় পৌঁছয় যে, এর জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ, স্বামীর আবার বিয়ে করা, মায়ের আত্মহত্যা, পাগল হয়ে যাওয়া ইত্যাদিও ঘটে। মা-ও মনে করতে থাকেন আমার বুঝি কোন ঘাটতি রয়েছে—তাই এ বিড়ম্বনা।

মেয়ে সন্তানের চেয়ে ছেলে কামনা করার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণের আলোচনার আগে ছেলে বা মেয়ে জন্মানর শারীরিক কারণ আলোচনা করলে দেখা যাবে, বারবার মেয়ে হওয়ার পেছনে মায়ের কোন ভূমিকা থাকে না। ব্যাপারটা উল্টোই—'ভূমিকা' থাকে বাবার। স্বাভাবিক সব মানুষের কোষে থাকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম—

এদের মধ্যে থাকে অসংখ্য জিন (gene) যা শরীরের বিভিন্ন অংশের গঠন, জন্ম সূত্রে পাওয়া বিভিন্ন শারীরিক দিকের নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করে। এদের ২২ জোড়াকে বলা হয় অটোজোম যা সাধারণ শারীরিক গুণাবলীর নির্ধারণ করে। বাকী এক জোড়া ক্রোমোজোমকে বলা হয় যৌন বা সেক্স ক্রোমোজোম—এটিই মানুষের যৌন গুণাবলীর নির্দেশক, এর কারণেই স্ত্রী আর পুরুষের শারীরিক বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়, একটি নবজাত শিশু ছেলে কি মেয়ে তা বোঝা রায়। যৌন ক্রোমোজোমজোড়া দুই ধরনের হয়—X ও Y; পুরুষের শরীরে যৌন ক্রোমোজোম থাকে X Y ; আর নারীর শরীরে থাকে X X ; আবার স্ত্রী-পুরুষের জনন কোষে থাকে ২৩ জোড়া নয়, মাত্র ২৩টি ক্রোমোজোম—এদের মধ্যে একটি যৌন ক্রোমোজোম, হয় X নয় Y। পুংজনন কোষ বা শুক্র কোষের ২৩টি আর স্ত্রী জননকোষ বা ডিম্বকোষের ২৩টি—উভয়ের মিলন বা নিষেক (fertisation)-এর সময় উভয়ে মিলিত হয়ে স্বাভাবিক ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমই দিচ্ছে অপত্য কোষকে। এই কোষই বিভাজিত হতে হতে বাচ্চার সৃষ্টি করছে। যদি ঐ অপত্য কোষে XX ক্রোমোজোম থেকে থাকে তবে বাচ্চা হবে মেয়ে আর X Y থাকলে ছেলে। কিন্তু মায়ের সবকোষেই থাকে X X ক্রোমোজোম, তাই সব স্ত্রী জনন কোষে বা ডিম্বকোষে X ছাড়া অন্য কোন যৌন ক্রোমোজাম থাকে না। কিন্তু পুং-জনন কোষে X বা Y যে কোন যৌন ক্রোমোজোম থাকতে পারে। তাই যৌন মিলনের পরে পুরুষের বীর্যের লক্ষ লক্ষ পুংজনন কোষ বা শুক্র কোষের, যে একটি মাত্র মায়ের একটি ডিম্বকোষের সঙ্গে (একটি মাসিক ঋতুচক্রে আর্থাৎ menstrual cycle-এ সাধারণভাবে একজন মহিলার দুটি ডিম্বাশয়ের যে কোনটি থেকে মাত্র একটি ডিম্বকোষই নি:সরিত হয়) মিলিত হয়, সেই শুক্রকোষে যদি X ক্রোমোজোম থাকে তবে স্পষ্টতঃই বাচ্চাটির থাকবে X X ক্রোমোজোম অর্থাৎ বাচ্চাটি হবে মেয়ে আর যদি ঐ শুক্রকোষে

Y ক্রোমোজোম থাকে তবে বাচ্চাটির থাকবে X Y ক্রোমোজোম অর্থাৎ বাচ্চাটি হবে ছেলে।

সব মিলিয়ে মায়ের থেকে X ক্রোমোজোম আসবেই, কিন্তু বাচ্চাটি ছেলে হবে কি মেয়ে হবে তা নির্ধারিত হচ্ছে পুরুষের থেকে আসা শুক্রকোষের উপরই। তাই বারবার মেয়ে হলে এ ক্ষেত্রে মায়ের কোন 'দোষ' বা ভূমিকাই নেই। বরং ভূমিকা রয়েছে বাবারই—তাই যদি 'দোষ' বা গঞ্জনা দিতে হয় তবে বাবাকেই দেওয়া যায়। তবে সত্যিকথা বলতে কি দোষ কারোরই নয়। সাধারণভাবে বল্লে, নেহাত কাকতালীয় ভাবেই পুরুষের বীর্যের অসংখ্য শুক্রকোষের কখনো X-যুক্ত কখনো বা Y-যুক্ত কোষটি স্ত্রীর X-যুক্ত ডিম্বকোষের সাথে মিলিত হয়। কোন স্বামী বা কোন স্ত্রী ইচ্ছে করলেই একে প্রভাবিত করতে পারেন না—কোন মন্ত্র জপে, চাঁদ দেখে, ওষুধ শিকড় বাকড় খেয়ে, পূজো আচ্চা করে—কোন ভাবেই নয়। তবুও অজ্ঞতাবশতঃ অনেকেই ছেলের আশায় এসব মিথ্যা ব্যবস্থার আশ্রয় নেন।

এবং কাকতালীয়ভাবে, সম্ভাব্যতার নিয়মে ব্যাপারটি ঘটার জন্য হাজার হাজার বছর ধরেই পৃথিবীতে নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। তবে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে মহিলাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছু বেশী এবং গড় আয়ু পুরুষের চেয়ে সামান্য বেশী হওয়ার জন্য সব জায়গায়ই মহিলার সংখ্যা সামান্য বেশী হওয়া উচিত। যেমন ১৯৭৬ সালে রাশিয়াতে প্রতি ১০০০ পুরুষ পিছু নারী ছিলেন ১১৬০ জন, আমেরিকায় ১০৫৪ জন, পোল্যাণ্ডে ১১২২, পশ্চিম জার্মানিতে ১০৯৬ ইত্যাদি। কিন্তু অন্যদিকে যেসব অনুন্নত দেশে নারীদের স্বাস্থ্য তথা জীবন সামগ্রিক ভাবে অবহেলিত এবং তাই মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে বেশী মারা যায়, সেসব দেশে মেয়েদের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। যেমন ভারতে প্রতি ১০০০ পুরুষ পিছু মহিলার সংখ্যা ৯২৫, ইরানে ৯৩৭, পেরুতে ৯৮৬, পাকিস্থানে ৮৮৬ ইত্যাদি। (U N Demographic Yearbook, 1976,

New York) তাই আমাদের দেশে কিছু পরিবারে বারবার মেয়ে হলে অনেকে যে ধারণা করেন দেশে মেয়ে বেড়ে যাচ্ছে, তা ভুলই। বরং আমাদের দেশে মেয়ের সংখ্যা কমই। এবং কোন দেশে পুরুষদের তুলনায় মহিলার আনুপাতিক সংখ্যা, ঐ দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম নির্দেশক।

যাই হোক মেয়েদের প্রতি অবহেলা আর তাচ্ছিল্যের মনোভাব এবং তারা আর্থিক ও পারিবারিক দায়িত্ব নিতে অক্ষম—এ ধরনের মানসিকতার জন্যই দম্পতির মধ্যে ছেলের প্রতি আগ্রহ থাকে বেশী। ব্যাপারটি এই বইতেই অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ-ভাবে বললে এ ধরনের মানসিকতা সৃষ্টির মুলে রয়েছে সামাজিক অবস্থা, যাতে মেয়েদের শারীরিক মানসিক বিকাশকে অবহেলা করা হয় ও বাধা দেওয়া হয়, মুখে স্ত্রী স্বাধীনতার কথা বলা হলেও সামগ্রিক ভাবে তাকে পদদলিত করার অবস্থা টিকিয়ে রাখা হয়। 'সমাজ ব্যবস্থা না পালটান অব্দি মেয়েদের জন্য কিছু করা যাবে না' বলে বসে না থেকে বাবা মায়েরা ব্যক্তিগত ভাবে অন্তত নিজেদের মেয়েকে বা শুধু মেয়ে থাকলে ঐ মেয়েকেই একজন ছেলের প্রতি করা সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্বের মানসিকতা অনুযায়ী বিকশিত করতে পারেন। পরিবারের আর্থিক-সামাজিক দায়িত্ব নেওরার উপযুক্ত করে মেয়েদের গড়েতোলা দরকার। শিক্ষা ও চাকরী—উভয় দিকেই তাকে স্বনির্ভর করে তোলা উচিত। আন্তরিক ভাবে তা করলে পণ প্রথা, বধু হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি অনেক সামাজিক বাধাই দূর করা যাবে, মেয়ে সন্তানের উপর নির্ভর না করার মানসিকতা তথা শুধু ছেলের প্রতি আগ্রহও কমবে। আর পুরুষরাও নিজেদের দোষ স্খালনের জন্য, নিজেদের প্রাধান্যের কারণে, স্ত্রীর উপর মেয়ের জন্মের জন্য দোষ চাপানর লজ্জাকর মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

পুনর্জন্ম ও জন্মান্তর

আত্মা অবিনশ্বর—এই ধারণা থেকেই জন্মান্তরবাদের সৃষ্টি। মনে করা হয়, মৃত্যুর সময় আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায় তারপর অন্য কোন শরীর আশ্রয় করে। একজনের আত্মা শারীরিক মৃত্যুর পর অন্য শরীরে পৃথিবীতে আসে অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির পুনর্জন্ম ঘটল বা জন্মান্তর হল বলে বলা হয়। একজন মানুষের জীবন তার পূর্বজন্মের কর্মফলের দ্বারা নির্ধারিত হয় বলেও ধারণা। কেউ কেউ তার পূর্বজন্মের স্মৃতিকেও মনে রাখতে পারে বলে প্রচার আছে—এদের বলা হয় জাতিস্মর। অপরিচিত বা অনাত্মীয় কারোর সাথে অস্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতা হলে সে পূর্বজন্মে মা ছিল, ভাই ছিল, এমনকি স্ত্রী ছিল—এ ধরনের ব্যাখ্যা দেয় অনেকেই।

যেহেতু এই প্রাণের জন্য দায়ী জড় কিছু মৌলিক পদার্থ যা পৃথিবীতে বহু লক্ষ বছরের ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে এমন ভাবে সংযুক্ত হয়েছে যে বিশেষ কিছু গুণের অধিকারী হয়েছে এবং কোন আত্মা অস্তিত্বহীন—তাই জন্মান্তর, পুনর্জন্ম, পূর্বজন্ম, জাতিস্মর ইত্যাদির ধারণাও ভ্রান্ত। চিন্তা ও স্মৃতি আমাদের মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুতন্ত্রের ফল। মা-বাবা সহ পূর্বপুরুষের কাছ থেকে বংশগতি (heredity)-র মাধ্যমে পাওয়া গুণাবলী একে প্রভাবিত করে। তাছাড়া জন্মের পর থেকেই অজস্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা স্নায়ুর উপর প্রভাব ফেলে। জীবন্ত স্নায়ু ছাড়া চিন্তা, মন বা স্মৃতির কোন অস্তিত্ব নেই। মানুষ সহ স্নায়ুযুক্ত সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেই এটি সত্য। এ ব্যাপারে স্নায়ুর সক্রিয়তার জন্য উপযুক্ত পুষ্টি, রক্ত সংবহন ও অন্যান্য স্নায়ুর সাথে যোগাযোগ ইত্যাদি প্রয়োজনীয়। মূলতঃ শর্করা জাতীয় পদার্থ ও ফসফোলিপিডের দহনের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় সেটি স্নায়ুকে শক্তির জোগান দেয়। স্নায়ুর সক্রিয়তার সময় এডেনোসিন ট্রাই-ফসফেট ও ক্রিয়েটিন ফসফেট নামক পদার্থ ভেঙ্গে যায় এবং স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবাহের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। এ প্রক্রিয়ায় বহু জটিল তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া সংযুক্ত, কিন্তু কোন

আত্মা নয়! মৃত্যুর পর স্নায়ু রক্তের মাধ্যমে পুষ্টি, অক্সিজেন ইত্যাদি পায় না,—তাই মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত স্নায়ু ও মস্তিষ্ক আর চিন্তা করতে পারে না বা স্মৃতির জাগরণ ঘটাতে পারে না। মৃত্যুর পর এই স্মৃতি বা চিন্তা হাওয়ায় ঘুরতে থাকে এবং এক সময় কোন নবজাতকের শরীরে ঢুকে যায়—এ চিন্তা ভুল। বয়স্ক কেউ ঝগড়া করতে করতে সেরিব্রাল হেমারেজ বা স্ট্রোক হয়ে মারা গেলে পরের জন্মে একটি নবজাত শিশু হিসাবে জন্মেই ঝগড়া করতে শুরু করবে এটি যেমন হাস্যকর, একইভাবে হাস্যকর কোন বিখ্যাত পদার্থবিদ পরের জন্মে গরু হয়ে জন্মালে, ঐ গরু পদার্থবিদ্যা আউড়াবে ও এ ধরনের গরু খুঁজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক করে দেওয়া যাবে। এর সহজ কারণ এই জন্মান্তর এবং এর ফলে পূর্ব-জন্মের স্মৃতিকে ধারণ করার ঘটনাটি আদৌ ঘটে না। জন্মান্তর ও জাতিস্মরের কথা প্রচার করা হলেও পৃথিবীর এত কোটি মানুষের সবার মধ্যে না হোক, অন্ততঃ বেশীর ভাগ লোকের ক্ষেত্রেই তা হয় না। ব্যাপারটি সত্যি ও বিজ্ঞানসম্মত হলে কিন্তু তা হওয়া উচিত ছিল। আচমকা যে দু' একজনের কথা বলা হয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে তাদের মধ্যকার ফাঁকি ও চালাকিটিই ধরা পড়ে। কখনো বা কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এসব প্রচার করে, কখনো বা পরামনোবিজ্ঞানী (parapsychologist) নাম নিয়ে কিছু অপবিজ্ঞানী আত্মপ্রচার করা ও বাহাদুরি নেওয়ার জন্য অথবা আত্মা ও জন্মান্তরবাদে নিজেদের অন্ধবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মনগড়াভাবে পুরো ব্যাপারটিকে সাজিয়ে হাজির করে। সাধারণ মানুষ এতসব কিছু তলিয়ে না দেখে জন্মান্তরবাদে তাদের পুরনো বিশ্বাসকে আরো শক্ত (যদিও মিথ্যা) খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠা করে। ডঃ আব্রাহাম কোভুর, পল কুরৎজ, জেমস র‍্যাণ্ডি বা এই ধরনের আরো যাঁরা কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে কাজ করেছেন তাঁরা তথাকথিত জাতিস্মর ও জন্মান্তরের বহুল প্রচারিত নানা ঘটনার ভেতরের চালাকি ও ভ্রান্তিকে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন।

বন্ধ্যাত্ব

বন্ধ্যা রমণীর মুখদর্শন নাকি অশুভ। পূজা বা তথাকথিত অন্যান্য শুভকাজে এঁদের উপস্থিতি কাম্য নয়। বাঁজা, আঁটকুড়ে ইত্যাদি নামে এঁদের অভিহিত করা হয়। যে সব দম্পতির সন্তান হয় না, তাঁদের ক্ষেত্রে সাধারণত দোষ দেওয়া হয় মহিলাকেই—এর সহজ কারণ প্রত্যক্ষভাবে তিনিই গর্ভধারণ করেন ও সন্তানের জন্ম দেন। তাছাড়া পুরুষ প্রধান সমাজে মেয়েদের উপর যাবতীয় দোষ চাপানর মানসিকতা থেকেও এই দোষারোপ করা হয়। সন্তান কামনায় তাবিজ মাদুলি, গ্রহরত্ন ধারণ, ষষ্ঠী পূজো দেওয়া, ঠাকুরের থানে মানত করা বা হত্যা দেওয়া, ইত্যাদি নানা পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রথা চালু রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে নানা টোটকাও অনুসরণ করা হয়। কেউ গোলমরিচ আদাপোড়া খায়। কোথাও আবার একটি বট ও পাকুড় গাছের চারা তুলে এনে তাদের ‘বিয়ে’ দেয় ও তারপর রোপন করে ; স্বামী-স্ত্রী মিলে তাদের গোড়ায় জল দেয়—যদি এরা বেঁচে যায় তবে বিশ্বাস দম্পতি সন্তানের মুখ দেখতে পাবে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী অনেকের বিশ্বাস বন্ধ্যা রমণী যদি রোজা মেনে পুকুরে গলা জলে নেমে সন্তান কামনা করে তবে সে সন্তান পাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক অনুন্নত অঞ্চলে এ ধরনের বিশ্বাস আছে যে, ম্যানড্রেক নামে একঠি গাছের চারা যদি শেকড় শুদ্ধ তোলা যায় তবে সন্তান হবে। পূজা, আচ্চা, ব্রত, উপোস, শেকড় বাটা খাওয়া ইত্যাদি তো আছেই।

কিন্তু এসবের কোনটির ফলেই সন্তানলাভ হওয়া সম্ভব নয়। নারীর ডিম্বকোষের সাথে পুরুষের পুং জনন কোষের মিলনে সন্তানের জন্ম হয়। তাই নারী-পুরুষ—উভয়েরই শারীরিক অস্বাভাবিকত্বের কারণে সন্তান না আসতে পারে। শুধু নারীকে দোষ দেওয়া একদিকে যেমন ভ্রান্ত, অন্যদিকে তেমনি পুরুষ প্রাধান্যের সমাজে নিজের দোষ স্খালন করে স্ত্রীর উপর দোষ চাপানোর প্রবণতারও পরিচয়। এর ফলে একজন পুরুষ একের

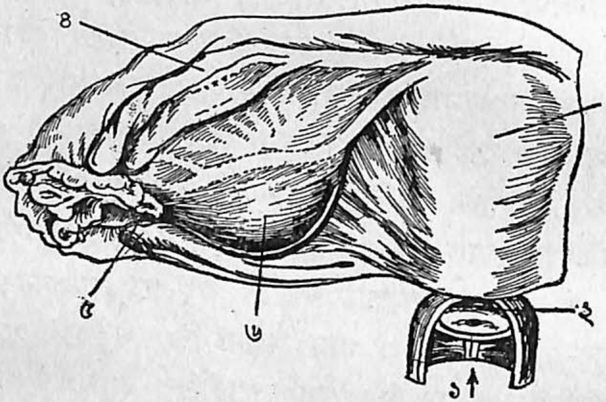
পর এক বিয়ে করেছে—এরও নজির আছে। কিন্তু তার একাধিক স্ত্রীর কারোরই সন্তান হল না—স্পষ্টতঃই এখানে সন্তানহীনতার কারণ পুরুষের শরীরেই মধ্যেই রয়েছে।

পুরুষের লিঙ্গ যদি ঠিকমত শক্ত না হয় তবে যৌনসঙ্গম ঠিকমত হয় না। এই ধ্বজভঙ্গ (impotent) অবস্থার জন্যও সন্তান না হতে পারে। আগেকার কোন মানসিক আঘাত বা অবচেতনমনে যৌনসঙ্গম সম্পর্কে ভীতি, ডায়াবিটিস, কোমরে আঘাত, সিফিলিস ও অন্যান্য কিছু রোগে সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর ক্ষতি, সংশ্লিষ্ট ধমনীর কিছু স্থায়ী পরিবর্তন (atherosclerosis of the iliac arteries or aorta) ইত্যাদি নানা কারণে এটি ঘটতে পারে। আর পুরুষের অণ্ডকোষ (testis) থেকে জনন কোষ যদি ঠিকমত তৈরি না হয় তাহলেও পুরুষ বন্ধ্যাত্বের সৃষ্টি হয়। অজ্ঞাত কোন কারণে অণ্ডকোষের বিশেষ কোষগুলির (germinal cells) অভাব (এক্ষেত্রে পুরুষের অন্যান্য লক্ষণ প্রায় ঠিকই থাকে এবং বীর্যপরীক্ষা বা অণ্ডকোষ-এর আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা ছাড়া এটি ধরা সম্ভব নয়), মস্তিষ্কের পিটুইটারী গ্রন্থির কম কাজ বা তার থেকে গোনাডোট্রপিক হরমোনের নিঃসরণ না হওয়ার ফলে এটি ঘটতে পারে। ফলিক্ল্ স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH), লুটিনাইজিং হরমোন (LH) ইত্যাদির অভাবেও জনন কোষের পরিপূর্ণ বিকাশ না ঘটে বন্ধ্যাত্বের সৃষ্টি হতে পারে। শরীরের কোষ (cell)-এর কেন্দ্র বা nucleus-এ ক্রোমোজোম থাকে—যেটি বংশগতি ও শারীরিক নানা বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক gene-এর বাহক—তার গণ্ডগোলেও পুরুষ-বন্ধ্যাত্বের সৃষ্টি হয় (যেমন Klinefelter's syndrome, Turner's syndrome ইত্যাদি)। অণ্ডকোষ ও তার সংশ্লিষ্ট কোষের প্রদাহ (যা যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, সিফিলিস, ই কোলাই ইত্যাদি জীবাণুর দ্বারা হতে পারে) এবং মাম্পস বা এই ধরনের ভাইরাস জনিত রোগের পরে (বিশেষতঃ বয়ঃসন্ধিক্ষণের বয়সে হলে) ভাইরাসের দ্বারা পূর্বোক্ত কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও জননকোষ সৃষ্টি হতে পারে না। অন্যদিকে মাতৃগর্ভে থাকার শেষের

দিকে ছেলের অণ্ডকোষ তলপেটে থাকে—গর্ভস্থ শিশুর বিকাশের সাথে সাথে, জন্মের সময় এটি নীচে মুষ্ক (scrotum)-এ নেমে আসে। কিন্তু কোন ছেলের অণ্ডকোষ যদি নীচে না নেমে পেটের মধ্যেই থেকে যায় তবেও তার বন্ধ্যাত্ব হতে পারে। এ ব্যাপারটি প্রায়ই ঘটে। (ঠিক সময়ে অস্ত্রোপচার করে এ ব্যাপারটি ঠিক করা যায়।) এছাড়া অণ্ডকোষে আঘাত, অতিরিক্ত এক্স-রে, অন্য ধরনের রে (ray) দেওয়ার ফলে (যেমন এক্স-রে বিভাগের বা পরমাণুশক্তি কারখানার কর্মচারীদের) অণ্ডকোষের ক্ষতির ফলেও পুরুষ-বন্ধ্যাত্বের সৃষ্টি হয়। পুরুষের বীর্যের স্বাভাবিক পরিমাণ ২-৬ সি. সি. (ঘন সেন্টিমিটার) এবং এর প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে পুংজনন কোষ থাকে ১০-২০ কোটি। পূর্বোক্ত বা আরো কিছু কারণে এই সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে কম হলে, পুংজনন কোষ বা শুক্রকোষ-এর সঞ্চালন ও গঠন অস্বাভাবিক ও বিকৃত হলে, এবং এ জাতীয় নানা কারণে, স্ত্রীর কোন শারীরিক ত্রুটি না থাকলেও, দম্পতির সন্তান না হতে পারে। যৌনমিলনের পর নারীর ফ্যালোপিয়ান টিউবে শুক্রকোষের কিছু সংখ্যক ১-৩ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে—এই সময়ের মধ্যে নারীর একটি ডিম্বকোষের সাথে এদের একটির মিলন হওয়া দরকার।

কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বকোষ আদৌ না বেরোতে পারে। এ্যাড্রেন্যাল গ্ল্যাণ্ডের গণ্ডগোল ও ভিটামিন বি-১২-এর অভাবের ফলে এটি অনেক সময় ঘটে। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বকোষ বেরিয়ে একটি নলাকার অংশ (Fallopian tube) বেয়ে জরায়ুতে আসে ; কোন জীবাণু-প্রদাহ, আঘাত বা অন্য কোন কারণে এই নলটি বন্ধ হয়ে গেলেও ডিম্বকোষ আর জরায়ুতে আসতে পারে না এবং যৌনসঙ্গমের পরে পুংজননকোষের সাথে মিলিত হতে পারে না। গর্ভপাতের পরে জীবাণু-সংক্রমণ হয়ে এই নলটি প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। কুমারী মাতৃত্বকে হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্যে নষ্ট করার পরে অনেক মহিলার ক্ষেত্রেই এটি ঘটে। পরে বিয়ের পর

আর সন্তান হয় না। কারোর ক্ষেত্রে জরায়ুর গঠনই ঠিকমত না হতে পারে। জরায়ুর যক্ষ্মারোগের পরেও ব্যাপারটি ঘটতে পারে। জরায়ুর মুখের গঠনগত গণ্ডগোল, জীবাণু-প্রদাহ বা ক্ষত ইত্যাদির কারণে স্থানীয় রাসায়নিক পরিমণ্ডলের অস্বাভাবিকত্ব, বা কোন টিউমার ইত্যাদি থাকলেও বীর্য জরায়ুতে প্রবেশ করতে না পেরে



আমরা যেখানে বেড়ে উঠেছি—নারীর অভ্যন্তরীণ জননাঙ্গ। ১—যোনি (এই পথে পুরুষের বীর্য নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করে); ২—জরায়ুমুখ; ৩—জরায়ু (এই খানেই প্রসবের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত শিশু বড় হয়); ৪—ফ্যালোপিয়ান টিউব (ডানদিকের); ৫—ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বকোষ এই পথে ফ্যালোপিয়ান টিউবে প্রবেশ করে; ৬—ডানদিকের ডিম্বাশয়।

সন্তানের জন্ম হয় না। যোনিপথেও একই ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, কোন কোন মহিলার শরীরে এমন কিছু পদার্থ থাকে (sperm agglutinins antibody to ova ইত্যাদি) যেটি পুংজননকোষ বা নিজেরই ডিম্বকোষের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এছাড়া জরায়ুর অভ্যন্তরীণ টিউমার বা আরো কিছু রোগেও কোন মহিলা সন্তানধারণ না করতে পারেন।

যৌনসঙ্গমের গণ্ডগোলেও সন্তানহীনতার সৃষ্টি হতে পারে। নারীর ডিম্বকোষ নিঃসৃত হয় দুই মাসিক ঋতুর মধ্যবর্তী সময়ে—মাসিক ঋতু স্রাব শুরু হওয়ার ১০ম-১৮শ দিনের মধ্যে। এই

সময়ে যদি যৌনসঙ্গম না করা হয় তাহলেও সন্তান হবে না। অনেকে যৌনসঙ্গমের সুবিধার জন্য বিশেষ কোন জেলি বা পিচ্ছিল রাসায়নিক জিনিষ ব্যবহার করেন। এই রাসায়নিক পদার্থটি প্রায়শঃই ক্ষতিকর ও শুক্রকোষ অর্থাৎ পুংজননকোষকে মেরে ফেলে বা দুর্বল করে দেয়।

এছাড়া নারীর মানসিক অস্থিরতা, আতঙ্ক, উদ্বেগ ইত্যাদির ফলে যৌনসঙ্গমের সময় ফ্যালোপিয়ান টিউব, জয়ায়ু বা জরায়ুর মুখের সংকোচন হয়েও পুরুষের বীর্য (semen) ভেতরে যেতে পারে না এবং এর ফলেও সন্তানলাভ না হতে পারে বলে অনেক গবেষক দেখেছেন। সন্তানহীন দম্পতি কোন পোষ্য সন্তান গ্রহণ করার পর এই মানসিক দুশ্চিন্তা চলে গিয়ে নাকি নিজের সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। কিন্তু অনেক চিকিৎসাবিজ্ঞানীই এ ব্যাপারে একমত নন এবং পরিসংখ্যানেও এটি প্রমাণিত নয়। তবে অনেক দম্পতি বেশ কয়েক বছর পরে সন্তানলাভ করতে পারেন। এর পেছনে মানসিক দিকটি ছাড়া অন্য কিছুও কাজ করতে পারে—যেমন হরমোনের সক্রিয়তা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রদাহ কমে যাওয়া ইত্যাদি।

যৌনসঙ্গমে নারীর যৌনসুখ না হলে সন্তানলাভ হয় না বলে অনেকের ধারণা। এটি ভুলই, নইলে ধর্ষণের ফলে গর্ভসঞ্চার হত না। যৌন সঙ্গমের পরে নারীর যোনীমুখ থেকে কিছু বীর্য বাইরে বেরিয়ে আসে। এটির ফলেও সন্তান হবে না বলে ভয় করা হয়। আসলে এ ব্যাপারটি (effuvium seminis) স্বাভাবিক ঘটনাই। জরায়ুর সংকোচনপ্রসারণের ফলে যৌনসঙ্গমের সময় জরায়ুমুখ দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ বীর্যই জরায়ুতে প্রবেশ করে। ক্রীড়াবিদ্‌মহিলা, স্থূলকায়া বা অত্যধিক শক্তসমর্থ মহিলারা বন্ধ্যা হতে পারেন—এ ধারণাও ভুল। তবে অনেক সময় অনেক পরিবারে বংশগতভাবে কম সন্তানের জন্ম হতে পারে। আবার গরীবদের চেয়ে ধনী মহিলাদের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব বেশী—এ ধরনের ধারণাও ভুল। বড়জোর গরীব, অশিক্ষিতদের তুলনায় শিক্ষিত, ধনী মহিলারা কিছু ব্যবস্থা

অবলম্বন করে সন্তানের সংখ্যা কমাতে পারেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষিত ধনী মহিলারা বিয়ের পরই সন্তান যাতে না হয় তারজন্য জন্মনিরোধক কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের ট্যাবলেট খেলে আর কোনদিনই ডিম্বকোষ নির্গমন না হতে পারে বা জরায়ুর মধ্যে একই উদ্দেশ্যে কপার টি বা এই ধরনের কিছু ধারণ করলে স্থানীয় প্রদাহের সৃষ্টি হয়ে সন্তানধারণ-ক্ষমতা লোপ পেতে পারে। কারো কারোর ক্ষেত্রে এটিও বন্ধ্যাত্বের কারণ হয়ে যায়।

এইভাবে অজস্র কারণের জন্য কোন দম্পতি সন্তানলাভ না করতে পারেন। স্পষ্টতঃই স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা করান দরকার, যার ফলে আসল কারণটি নির্ধারণ করা যায়—শুধু স্ত্রীর নয়। ঠাকুরের থানে হত্যা দিয়ে অনেকে সন্তান পেয়েছে বলে শোনা যায়। যদি সত্যিই ব্যাপারটি ঘটে তবে তা আদৌ ঠাকুরের আশীর্বাদে ঘটে না—কারণ প্রথমতঃ এই ধরনের কোন ঠাকুরদেবতার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, দ্বিতীয়তঃ, আশীর্বাদ করে কোন শারীরিক পরিবর্তন ঘটান যায় না। কোন দম্পতির সন্তানহীনতার পেছনে যদি স্বামীর ত্রুটিই কারণ হয় তবে স্ত্রী ঠাকুরের থানে হত্যা দিয়ে ছ'তিনদিন থাকার সময় কোন পূজারী বা মন্দির নির্দিষ্ট সুস্থ ব্যক্তি ঐ মহিলার সাথে যৌন মিলনে রত হন, ধুতুরা বা অন্যান্য কিছু পদার্থ ঠাকুরের চরণামৃত ইত্যাদির নামে মহিলাকে খাওয়ান হয়—ফলে তিনি একটি আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকেন। এই সময় মহিলাটি পূজারি বা অন্য কাউকে না চিনতে পারেন বা অন্ধ বিশ্বাসী, ভক্তিমতী তিনি দেবতার সাথে মিলিত হচ্ছেন, এ ধারণা করতে পারেন। যেহেতু তিনি নিজে স্বাভাবিক তাই এ ধরনের মিলনের পর তাঁর সন্তান লাভ হতে পারে আর মাহাত্ম্য বাড়ে ঠাকুরের থানের। এইভাবে বহু বিচিত্রভাবে নানা ধরনের মিথ্যা সংস্কারের বিশ্বাস-যোগ্যতা বাড়ে—যদিও তার পেছনে থাকে বাস্তব কিছু কারণ।

যাই হোক, স্পষ্টতঃই বন্ধ্যা রমণীদের অপয়া বলা বা পূজা, বিবাহ

ও তথাকথিত নানা শুভকাজে অংশগ্রহণ না করতে দেওয়ার পেছনে কোন যুক্তিই নেই। খোসপাঁচড়া, বসন্ত বা সর্দির মত এই বন্ধ্যাত্ব অন্য কোন রমণীতে সংক্রামিত আদৌ হয় না, এটি ঘটে সংশ্লিষ্ট দম্পতিরই নিজস্ব অস্বাভাবিকত্বের জন্য। সন্তানহীনা রমণীর মানসিক বেদনা এই ধরনের অমানবিক সংস্কারের ফলে শুধুমাত্র তীব্রতর হয়—আর বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা না করে তাবিজ-মাদুলি-হত্যা দেওয়া ইত্যাদি হাবিজাবির ব্যর্থ প্রচেষ্টায় এই হতাশা ও বেদনা আরো বেড়ে চলে।

৫

কিছু রোগ ও সংস্কার

শরীরকে ঘিরে অজস্র সংস্কার ও মিথ্যে বিশ্বাস যেমন রয়েছে, তেমনি এই ধরনের নানা সংস্কার রয়েছে রোগকে ঘিরেও, রয়েছে রোগারোগ্যের নানাবিধ পদ্ধতি। এদের অনেকগুলোই মিথ্যা আবার কোন কোনটির পেছনে কিছু বিজ্ঞান-সম্মত কারণ রয়েছে, কিন্তু সঠিক গবেষণার অভাবে ও অন্ধভাবে প্রয়োগের ফলে বহুদিন পরে এগুলিও তাদের নির্ভরযোগ্যতা অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পাশাপাশি, আদিমকাল থেকেই মানুষ তার নানা রোগকষ্টের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছে, অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও কাল্পনিক কিছু ধারণা থেকে এই সংগ্রামের হাতিয়ার খোঁজার চেষ্টা করেছে।

যেমন অথর্ববেদে বিভিন্ন ভূত-প্রেতের আক্রমণে বা কোন দেবতার অভিশাপে নানা রোগ হয় বলে বলা হয়েছে। এই সব ভূত ও পিশাচ জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে যাতুবান, কিমীদিন, অমীবা, রক্ষ, অত্রিন, কন্ব, দয়াবিন, অলিংস, বৎসক, পলাল, শর্ক, কোক, মলিম্লুচ, পলীজক, বব্রীবাবস, অশৌষ, প্রমালিন, ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে বরুণদেব যদি মানব শরীর আশ্রয় করেন তবে উদরী ঘটে বলে বর্ণিত হয়েছে—এর সহজ কারণ বরুণকে জলের দেবতা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল। আর এইভাবে নানা রোগ থেকে মুক্তির আশায় এইসব ভূত-প্রেত-পিশাচ-দেবতাকে তাড়ান বা সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, পূজা, মন্ত্রপাঠ, কবচধারণ, মারণ উচাটন ইত্যাদি নানা ধরনের ভ্রান্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হত। এ ব্যাপারটি শুধু ভারতবর্ষেই ঘটেনি, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানবগোষ্ঠীই বিভিন্নভাবে এই ধরনের নানা পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। এর অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, প্রাচীনকালে আমাদের

পূর্বসূরীদের সব পর্যবেক্ষণই ছিল ভ্রান্ত। তবু ঐতিহাসিক-ভাবে এটি সত্য যে—এবং সেটিই স্বাভাবিক যে, আদিম এই সব বিশ্বাসের অনেকগুলিই বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। যেমন, উদরীর কারণ হিসাবে যকৃতের গণ্ডগোল (cirrhosis of liver), অপুষ্টি, পেটের যক্ষ্মা ও ক্যান্সার ইত্যাদি নানাবিধ কারণ বৈজ্ঞানিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা ভূত-প্রেতের মত বরুণজাতীয় দেবদেবীরও কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তাই মানুষ আজ তার জ্ঞানের বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়মেই, উদরী হলে বরুণদেবের পূজা করেন না। অথর্ববেদে অন্ধবিশ্বাসী কোন ব্যক্তিও উদরীর জন্য আধুনিক চিকিৎসারই সুযোগ নেন। কিন্তু এই ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এখনো প্রকৃতির সবকিছুকে জানতে পারে নি, জানা তথ্যগুলিও এখনো সকলের কাছে পৌঁছয় নি। তাই নানা রোগ ও রোগারোগ্যের পদ্ধতিকে ঘিরে এখনো বহু ধরনের সংস্কার বেশ ভালভাবেই চালু। আবার কোন কোন রোগ সম্পর্কে রয়েছে অহেতুক নানা ধরনের ভীতি।

এই সব ধরনের কয়েকটিকেই এখানে আলোচনা করা হল।

কুষ্ঠ রোগ

এই রোগটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে—বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে বহু প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে। অচিকিৎসিত কিছু কুষ্ঠরোগীর চূড়ান্ত অবস্থায় হাতে-পায়ের আঙ্গুল খসে পড়ে, মুখমণ্ডল হয়ে যায় বিভৎস। প্রাচীনকালে রোগটির কারণ যেমন জানা ছিল না, তেমনি জানা ছিল না এর চিকিৎসা। ফলে এই অজ্ঞতা ও অসহায় অবস্থার জন্য আরো বহু মিথ্যে সংস্কারের মত কুষ্ঠ সম্পর্কেও ধারণা করা হল এ রোগ ঈশ্বর-প্রদত্ত বা কর্মফল বা পূর্বজন্মের কৃতপাপের ফল। বহু প্রাচীন ধর্মপুস্তকেই এই মিথ্যে বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। কুষ্ঠ রোগীকে অস্পৃশ্য ঘোষণা করে মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হত। সাধারণের

যানবাহন ব্যবহার বন্ধ করা হত। সমাজে অপাঙতেয় হয়ে লোকালয়ের বাইরে জঙ্গলে বা গুহায় থাকতে হত ওদের। আর এর ধারাবাহিকতা এখনো যে নেই তা নয়। 'কুষ্ঠ' নামটি শুনলেই মনে পড়ে যায় গলিত দেহ, বিভৎস চেহারার কথা। কারো কুষ্ঠ হয়েছে শুনলেই তার সঙ্গে ব্যবহারে চূড়ান্ত সন্ত্রস্ততা চলে আসে, ছেলেমেয়েদের তার সংস্রব থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এবং এক একজনের এমন মানসিকতাও সৃষ্টি হয় যে, পাছে রাস্তাঘাটে কোন অজ্ঞাত কুষ্ঠরোগীর ছোঁয়া লাগে তাই খুচরো পয়সা নেন না, বাসে হ্যাণ্ডেল ধরেন না ইত্যাদি। এর কারণ 'রোগটি অত্যন্ত সংক্রামক—ছোঁয়া লাগলেই হয়ে যাবে, আর হলেই—কোন চিকিৎসা নেই, হাত-পা খসে পড়বে, হতে হবে সমাজে ঘৃণ্য অপাঙতেয় অস্পৃশ্য' ইত্যাদি ধরনের ভ্রান্ত ধারণা।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুষ্ঠরোগটি ঈশ্বরপ্রদত্ত বা কর্মফলের জন্য হয় না ; হয় Mycobacterium leprae নামে এক জীবাণুর দ্বারা। মাত্র ১১৫ বছর আগে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ের ডাঃ জেরহার্ড হেনরিক আরমার হানসেন এই জীবাণু আবিষ্কার করেন। তার আগে কুষ্ঠের উপর বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার চেষ্টা করেন ডাঃ হানসেনের শ্বশুর ডাঃ ডানিয়েলসেন—তিনি অবশ্য বলেছিলেন, রোগটি বংশগত এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বংশে এটি দেখা যায়। পরে এটি ভুল প্রমাণিত হয়। যাই হোক, জীবাণুঘটিত কুষ্ঠরোগটি প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ভয়াবহভাবে সংক্রামকও নয়। শতকরা মাত্র ২০ জন কুষ্ঠরোগী সংক্রামক কুষ্ঠরোগে ভোগেন অর্থাৎ বেশীর ভাগ কুষ্ঠরোগীর থেকেই সংক্রমণের ভয় নেই। সংক্রামক কুষ্ঠরোগকে বলা হয় লেপ্রোমেটাস ধরনের—সুশ্রুতে একে মহাকুষ্ঠ বলা হয়েছে। শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ কুষ্ঠরোগীই এই ধরনের। যাদের শরীরে কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আদৌ নেই তাদের ক্ষেত্রে এটি ঘটে। আর কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘকাল এই ধরনের লোকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বসবাস করেন একমাত্র তবেই তাঁর শরীরে রোগটি

সংক্রামিত হতে পারে, এক-দু'বার ছোঁয়া লাগলে কখনোই হবে না। শিশু, দীর্ঘকাল রোগে ভোগা বা অপুষ্টির কারণে দুর্বল কোন ব্যক্তি এই সংক্রামক কুষ্ঠের দীর্ঘ সংস্পর্শে থাকলে রোগাক্রান্ত হতে পারেন। মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ড ছাড়া শরীরের যে কোন অংশে—চামড়া থেকে শুরু করে যকৃৎ, প্লীহা ইত্যাদিতে, এর প্রসার ঘটতে পারে। প্রথমে রোগীর শরীর ফোলাফোলা, লালচে হয়। পরে হাত পা জ্বালা বা টন্‌টন্ করতে পারে। তারপর সারা শরীরে লাল চাকাচাকা দাগ দেখা যায়। দাগ হয় চকচকে ও মসৃণ—কিন্তু চামড়ার এই দাগে সাড় বা অনুভূতি খুব একটা লোপ পায় না। তবে হাতে ও পায়ের পাতায় সাড় নষ্ট হয়ে যায়। এই ধরনের কুষ্ঠে বিকলাঙ্গতা, ক্ষত, চক্ষুপ্রদাহ ইত্যাদি বেশী হয়। আর অসংক্রামক কুষ্ঠরোগকে বলা হয় টিউবারকুলয়েড ধরনের। এতেও চামড়ায় লালচে বা সাদাটে দাগ দেখা যায়—দাগগুলি চামড়া থেকে উঁচু হয়। এবং এই সব দাগে সাড় লোপ পায়। স্নায়ুও মোটা হয়ে যায়। এছাড়া অন্য কিছু মাঝামাঝি অবস্থার কুষ্ঠরোগও রয়েছে। সুশ্রুত সংহিতায় সব ধরনের কুষ্ঠকেই সংক্রামক বলা হয়েছে। কারণ তখন কুষ্ঠের মূল দুটি বিভাগ সম্পর্কে কোন ধারণা খুব একটা ছিল না। আর বহু শত বছর ধরে এই অসম্পূর্ণ ধারণার বশবর্তী হয়ে সব কুষ্ঠরোগীকেই সংক্রামক হিসেবে ভয় করার ব্যাপারটা বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয়েছে।

কুষ্ঠরোগের কোন চিকিৎসা নেই-এ ধারণাটি ভুল। প্রাচীনকালে চালমুগরার তেল ইত্যাদি ব্যবহৃত হত—যদিও এটি খুব একটা কার্যকরী নয়। চীনে কুষ্ঠের বিরুদ্ধে আকুপাংচার ও মক্সিবাশ্চানকে প্রয়োগ করা হত। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে টোকিওতে কাটাকারা গেনসুই নামে একজন এ ব্যাপারে প্রবন্ধও লেখেন। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিকিৎসা শুরু হয়েছে এই কয়েক বছর আগে থেকে। ড্যাপসোন (Diamino diphenyl sulphone বা DDS) এবং সালফোনামাইড, ল্যামপ্রিন, রিফামপিসিন, ইত্যাদি দীর্ঘস্থায়ী

কার্যকারিতার কিছু ওষুধ দীর্ঘদিন ধরে সুনিয়ন্ত্রিত মাত্রায় প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় দরকার তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয়। রোগের প্রথম অবস্থায় রোগ ধরা পড়ে চিকিৎসা শুরু হলে, সংক্রামক মহাকুষ্ঠতেও রোগ নিয়ন্ত্রণ ও আশু নিরাময় সম্ভব হয়। এছাড়া কোন অংগহানি হলে অস্ত্রোপচার করা, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পুনর্বাসন ইত্যাদি দরকার।

কুষ্ঠরোগ মানেই সংক্রামক—এ ধারণাটি ঠিক নয়, সহজে সংক্রামিতও হয় না, চিকিৎসাও রয়েছে। এসব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও একে ঘিরে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মিথ্যে ভীতি সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে ব্যাপকভাবে। এইসব অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষতিকর ধারণাকে না কাটালে কুষ্ঠরোগী ও সাধারণ মানুষ উভয়ের জীবনই বিড়ম্বিত হবে। সরকারী স্তরে—এর জন্য কিছু কিছু কাজ করা হলেও তার মধ্যেও আন্তরিকতা যথেষ্ট কম। সরকারী আইনও এইসব সংস্কারকে ভিত্তি করে ও প্রশ্রয় দিয়েই টিকিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন হিন্দু 'বিশেষ বিবাহ আইন'-এর ২৭ (জি) ধারায় বলা হয়েছে, 'তিন বছর ধরে কুষ্ঠ রোগে ভুগলে, তারা যদি আবেদনকারীর কাছ থেকে রোগটি না পেয়ে থাকে, তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসম্মত'। তবে হিন্দু বিবাহ আইনের ১০ (সি) ধারায় অন্তত 'virulent form of leprosy' অথবা ১৩ (৪) ধারায় 'virulent and incurable form of leprosy' ইত্যাকার কথা ছিল—যদিও এরও চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্মত কোন অর্থ হয় না। কিন্তু 'বিশেষ বিবাহ আইনে' যা বলা হল তা সবধরনের কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য করে দেওয়া হল। ১৯৩৯ সালের 'মুসলিম বিবাহ আইন'-এও একই রকম বলা হয়েছে।

অতি সম্প্রতি ভারত সরকার হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫), বিশেষ বিবাহ আইন (১৯৫৪), মুসলিম বিবাহ আইন (১৯৩৯)—এই ধরনের আইন থেকে কুষ্ঠকে বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ হিসেবে ধরার ব্যাপারটা বাতিল করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও

একে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। বলা হয়েছে, কুষ্ঠ যেহেতু নিরাময়যোগ্য একটি রোগ অতএব তাকে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে গণ্য করা উচিত নয়। (সংবাদ সূত্র ঃ স্টেটসম্যান ; ১. ৪. '৮৪)

তবে কুষ্ঠরোগীদের সম্পর্কে সংস্কারাচ্ছন্ন, মিথ্যে ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়া নানা আইন রয়েছে। এই আইন অনুযায়ী কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত যে কোন ভিক্ষুককে পুলিশ বিনা সমনে কিছু নির্দিষ্ট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করতে ও কুষ্ঠাশ্রমে পাঠাতে পারে ; এখানে সংক্রামক-অসংক্রামক কোন বাছবিচারের সুযোগ নেই। আরো বলা হয়েছে, (ক) জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী বা পানীয়োপযোগী জিনিষপত্র বা পানীয় তৈরী করতে বা বিক্রি করতে কোন কুষ্ঠরোগী পারবে না। (খ) জনসাধারণের ব্যবহৃত পুকুর, কলের জল বা এই জাতীয় কোন স্থানে কুষ্ঠরোগাক্রান্তদের স্নান, কাপড় ধোওয়া বা জল নেওয়া নিষিদ্ধ। (গ) রেলগাড়ী ছাড়া অন্য কোন যানবাহন চালানো বা চড়ে যাওয়া এদের পক্ষে অপরাধ। ১১ ধারা অনুসারে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে এদের চাকরী দেওয়াও অপরাধ-তুল্য। আবার অন্যদিকে এমনই সামাজিক ব্যবস্থা,—বেশ্যাবৃত্তির মত ভিক্ষাবৃত্তিও আইনত স্বীকৃত। কুষ্ঠরোগীরাও তাদের রোগকে ভিক্ষার মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে। সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও ভীতি এদের সামাজিক পুনর্বাসনে বাধা দেয়।

অন্যদিকে কুষ্ঠকে অনেকে বংশগত বলেও ধারণা করেন, আসলে এটি তা আদৌ নয়। তাই কোন দম্পতির সন্তান-জন্মের পর বাবা বা মায়ের কারোর কুষ্ঠ হলে ছেলেমেয়েদের তা হয় না। অবশ্য যদি বাবা বা মা সংক্রামক কুষ্ঠে আক্রান্ত হয়ে থাকেন তবে বাচ্চাকে অবশ্যই আলাদা রাখতে হবে। সে ক্ষেত্রে বংশগতভাবে পাওয়ার ব্যাপারটা থাকে না, সংক্রামক কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির থেকেই রোগটি সংক্রামিত হতে পরে (বসন্ত বা খোসপাচড়ার মত)। অনেকে আবার শ্বেতী বা ধবল, জন্মগত কোন সাদা দাগ ইত্যাদিকেও কুষ্ঠের প্রাথমিক অবস্থা বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কুষ্ঠের

দাগের উপর চুল থাকে না, সাড়ও কোন কোন ক্ষেত্রে থাকে না। শ্বেতীর জন্মগত দাগের উপর চুল থাকে। আগুনে পোড়া বা কেটে যাওয়ার পরেও চামড়ায় সাদা বা ফ্যাকাসে চুলহীন দাগ হতে পারে। এটিও কুষ্ঠের দাগ থেকে গুণগত ভাবে পৃথক।

মিথ্যে ভীতি ও অন্ধসংস্কার নয়। কারোর কুষ্ঠ হয়েছে মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা লেপ্রসি ক্লিনিক বা সরকারী হাসপাতালে রোগ নির্ণয়, কুষ্ঠের প্রকার নির্ধারণ এবং উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু করা উচিত—যার সাহায্যে সব রোগীই সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। তা না করে, দেবতার অভিশাপ বা পূর্বজন্মের কর্মফল বলে বসে থাকলে বা ঠাকুরের থানে মানত করলে বা জলপড়া দিলে রোগ সারে না।

অনেকে আবার 'জগন্নাথদেবকে' কুষ্ঠের দেবতা বলে মনে করেন—জগন্নাথের নূলো হাত-পা এবং কুষ্ঠের ঘা সারাতে অনেকে ব্যবহার করে যে নিমকাঠ তার দ্বারা এর মূর্তি তৈরীর নিয়ম থেকে হয়তো এ ধারণা করা হয়। যদি আদৌ এই ব্যাখ্যাটি ঠিক হয়, তবে তা প্রাচীনকালে মানুষের প্রতীকী উপস্থাপনা ভঙ্গিমার জন্যই ঘটেছে। জগন্নাথদেবেরও যেমন বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তেমনি জগন্নাথধামে পূজো দিলেও Mycobacterium leprae মরবে না।

বসন্ত

সাপের সঙ্গে যেমন মা-মনসার যোগ বসন্তরোগের সাথে তেমনি নাকি জড়িয়ে আছেন শীতলা মাতা। বাংলাদেশে শীতলার মত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তেও বসন্তরোগের দেবী হিসেবে প্রায় একই ধরনের দেবীর কথা কল্পনা করা হয়েছে,—যেমম দক্ষিণভারতে তাঁর নাম শীতলম্মা, মরীয়ম্মা বা মরম্মা। শীতলা পৌরাণিক দেবী, পৌরাণিক যুগের শেষের দিকে তাঁর সৃষ্টি এবং সরস্বতী, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, পার্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি দেবীসত্তার মিশ্রণ তাঁর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলিত। শীতলার বর্ণনায় কুলা ও ঝাঁটার অস্তিত্ব রয়েছে।

তিনি শুধু বসন্ত বা বিস্ফোটক নয়, সর্বরোগহারিণী। আর কুলা ও ঝাঁটার দ্বারা অপদেবতার প্রভাব তথা অমঙ্গল দূর করার কল্পনা অতি প্রাচীন একটি ব্যাপার। যাই হোক অনেক সময় গৌরবে শীতলা মায়ের নামটি উহ্য রেখে বসন্তরোগকে শুধু 'মায়ের দয়া' বলেও উল্লেখ করা হয়। তাই বসন্ত হলে শীতলা-দেবীর পূজো করা, মায়ের থানে মানত করা, প্রসাদী পাদোদক পান করান ইত্যাদি হয়ে থাকে। এই কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশে এই ধরনের অনুষ্ঠান হামেশাই চোখে পড়ত। তবে গত বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে ভয়াবহ গুটি বসন্ত নির্মূল হয়েছে। গুটি বসন্তের সর্বশেষ রোগীর খবর জানা যায় ১৯৭৭ সালের ২৬শে অক্টোবর, সোমালিয়ার মার্কাতে এবং—সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপকভাবে শীতলামায়ের পূজো করে নয়,—রোগটির বিরুদ্ধে শিশুর জন্মের সময় থেকেই প্রতিরোধী টীকা দিয়েই এটি সম্ভব হয়েছে।

আসলে বসন্ত রোগটি হয় এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণে। সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন যুক্ত ভাইরাস নামের পদার্থটিতে প্রাণী-কোষের সমস্ত গুণাগুণ না থাকলেও বিশেষ প্রক্রিয়ায় এটি প্রাণী বা উদ্ভিদকোষের মত নিজেদের বংশবৃদ্ধি করতে পারে। দু'ধরনের ভাইরাস গুটিবসন্ত (small pox) ও জল বসন্ত (chicken pox) সৃষ্টি করে (pock কথাটির অর্থ চামড়ার উপর জলভরা গুটি ; এরই বহু বচন হচ্ছে pox)। গুটি বসন্তই সবচেয়ে মারাত্মক এবং এর কিছু কিছু ধরনের রোগীর প্রাণহানি ও অঙ্গহানির সম্ভাবনা রয়েছে। জ্বর হওয়ার সাধারণতঃ তৃতীয়দিনে যে কোন বয়সের ব্যক্তিতে একসাথে এর গুটি বেরোয়, গুটিগুলি হাতে পায়ে-মুখে বেশী হয়, বগলে হয়ই না এবং চামড়ার গভীরে বিস্তৃত থাকে। জলবসন্তের গুটি জ্বর ও শরীর খারাপ হওয়ার প্রথম দিনেই বেরোতে শুরু করে ও দফায় দফায় বেরুতে পারে ; সাধারণতঃ বাচ্চারা আক্রান্ত হয়। গুটি বেরোয় বগলে, বুকে-পিঠে এবং চামড়ার খুব একটা গভীরে যায় না।

ভাইরাসকে মারার জন্য সর্বার্থসাধক ওষুধ এখনো বেরোয় নি। তবে উপযুক্ত সেবাশুশ্রূষা ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসার ফলে মারাত্মক গুটি বসন্তের রোগীকেও মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। আজ মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও ভাইরাসের বিরুদ্ধে মানুষের অসহায়তা এখনো যথেষ্ট, প্রাচীনকালে এটি ছিল আরো ব্যাপক। তখন অতিসংক্রামক এই রোগটি থেকে অন্যদের রক্ষা করার বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিও জানা ছিল না। তাই একসময় গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়েছে বসন্তের মড়কে। রোগ ও মৃত্যুর এই ভয়াবহতার সামনে দাঁড়িয়ে অসহায় মানুষ—শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর নানা প্রান্তেই—শীতলা দেবী সহ নানা দেবতা ও অতীন্দ্রিয় শক্তির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে, আশ্রয় নিয়েছে তুকতাক, মাছুলি, মন্ত্রপড়া, ইত্যাদির। ভেবেছে কোন দেবতা-অপদেবতার জন্য এসব ঘটে। আবার মানুষই আজ তার উন্নততর জ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করেছে—রোগটি ঘটে ভাইরাসের আক্রমণে; পূজা আচ্চা ইত্যাদি করে দেরী করলে একদিকে যেমন রোগীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হবে তেমনি আশেপাশের লোকেদেরও মধ্যেও রোগটি সংক্রামিত হবে। তাই অন্য প্রাণীর শরীরে বসন্তের (small pox-এর) ভাইরাস ঢুকিয়ে পরে ঐ প্রাণীর থেকে দুর্বল ভাইরাস যুক্ত রক্তরস নিয়ে প্রতিরোধী টীকা তৈরী করে মানুষকে দেওয়া হচ্ছে, যা বসন্তের ভাইরাসের আক্রমণকে প্রতিহত করে। মা শীতলার পূজা বা তার পাদোদকের নামে নোংরা জল খাওয়ার ফলে এই প্রতিরোধ সৃষ্টি হয় না। একইভাবে বসন্ত হলে এইভাবে পূজা-আচ্চা ভাইরাসকে মারতেও পারে না—অন্ধবিশ্বাসী রোগীকে কিছু মানসিক সাহস দেয় মাত্র।

পৃথিবী থেকে গুটি বসন্ত নির্মূল হলেও আর কোনদিনই সেটি ফিরে আসবে না, তা কখনোই বলা যায় না। আর জল বসন্ত তো এখনো হ মেশাই হয়। তবে জল বসন্তের ভাইরাস খুব একটা মারাত্মক হয় না, তাই বিশেষ কোন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি

না করেই রোগটি আস্তে আস্তে সেরে যায়—রেখে যায় চামড়ায় কিছু দাগ, যা পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় বা পাৎলা হয়ে যায়। গুটি বসন্তই প্রাণহানি থেকে শুরু করে অন্ধত্ব ও নানা ধরনের অঙ্গহানির সৃষ্টি করে। উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসায় এগুলির কোন কোনটিকে ঠিক করা যায়। বসন্তের ভাইরাস রোগীর শরীর থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং শ্বাসের মাধ্যমে, ছড়ে যাওয়া চামড়া দিয়ে ও সম্ভবতঃ চোখের ভেতর দিয়েও শরীরে ঢোকে। বসন্ত রোগীর সঙ্গে সামান্যক্ষণ সংস্পর্শে এলেও এটি ঘটতে পারে। তবে কোন সুস্থ ব্যক্তি বসন্তরোগীর সংস্পর্শে আসার ৩ দিনের মধ্যে টীকা নিলে তাঁর বসন্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী এই রোগে ভোগে না, যদিও পোকা-মাকড়, মাছি ইত্যাদি এই ভাইরাসকে ছড়াতে পারে। ছোটবেলা থেকেই টীকা নিলে এইভাবে সংক্রামিত হওয়ার ভয়ও থাকে না। তাই 'মায়ের দয়া' ভেবে অসহায়ভাবে মায়ের পূজাদি না করে, বিজ্ঞানসম্মত উপযুক্ত ব্যবস্থাই নেওয়া দরকার—যার সাহায্যে এই রোগের আক্রমণ ও সংক্রমণ উভয়ই রোধ করা যায়. এবং বস্তুতঃ গুটি বসন্তের ক্ষেত্রে তা করা গেছেও।

ভূতে পাওয়া না হিস্টেরিয়া

সাধারণতঃ মহিলাদের এক ধরনের ফিটের ব্যারাম শুরু হয়,—হাত-পায়ের খুঁচুনি, সাথে চোখ উল্টে যাওয়া, দুর্বোধ্য কথাবার্তা বলা ইত্যাদিও ঘটে। এটিকে অশিক্ষিত বা তথাকথিত বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও, ভূতে পাওয়ার ব্যাপার বলে মনে করেন এবং এই ভূতকে তাড়ানর জন্য ওঝা-গুণিন ডেকে নানারকম ক্রিয়াকর্ম করা হয়। রোগীকে (অর্থাৎ তাকে ভর করা প্রেতাত্মাকে ?) ঝাঁটা পেটা করা, জুতো মুখে দিয়ে হাঁটান, লংকা পুড়িয়ে নাকে দেওয়া, শেয়ালের পায়খানা খাওয়ান, গরম লোহা ছেঁকা দেওয়া, হাত-পা বেঁধে চাবুক

মারা ইত্যাদি নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এর ফলে এক আধজন হয়তো 'সুস্থ'ও হয়। বিশ্বাস, এটি সম্ভব হয় ঐ প্রেতাত্মাটি অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রোগীকে ছেড়ে পালিয়ে গেল বলে।

ভূত-প্রেতে বিশ্বাস মানুষের অতি প্রাচীন একটি বিশ্বাস। বহু যুগ ধরে তা পোষণ করার ফলে অনেকের মধ্যেই এ সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেছে যা একধরনের মানসিক রোগের পর্যায়ে চলে গেছে (**delusion**)। একটি শিশু জন্মানর সময় সে যেমন দেব-দেবীতে বিশ্বাস নিয়ে জন্মায় না, তেমনি, ভূত-প্রেতের ভয় নিয়েও জন্মায় না। পরবর্তীকালে আত্মীয়-স্বজনের কথাবার্তা ও গল্প, শিশুপাঠ্য ও স্কুলপাঠ্য বইতে এইসব মিথ্যে ধারণা সম্পর্কে পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ নানা চিন্তা শিশুর মনে ঢোকান হয়। এবং সে এগুলিতে বিশ্বাস করতে শুরু করে। ভূত-প্রেতের বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার মূলে আত্মা সম্পর্কিত মিথ্যে ধারণাটি কাজ করেছে। জড়পদার্থের অতিজটিল ও সুনির্দিষ্ট বিশেষ বিন্যাসের ফলেই এমন কিছু পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে যা গুণগতভাবে জড় থেকে আলাদা অর্থাৎ তার মধ্যে তথাকথিত প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। এ ব্যাপারটি না জানা থাকায় শরীরকে জড় ভেবে তার ওপর শরীর-বহির্ভূত একটি শক্তি তথা আত্মার কল্পনা করে একেই প্রাণচাঞ্চল্যের জন্য দায়ী করা হয়েছে। মৃত্যু হলে এই আত্মা নাকি শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এই মুক্ত আত্মা শিশুর শরীরে ঢুকে গিয়ে পুনর্জন্মগ্রহণ করতে পারে। অথবা অতৃপ্ত অবস্থায় প্রেতাত্মা হিসেবে ঘুরে বেড়াতে পারে ও অন্যের শরীরে ভর করতে পারে। কিন্তু আত্মা যেহেতু অস্তিত্বহীন তাই প্রেতাত্মা ও তার ভরের ব্যাপারটিও মিথ্যে।

যে ফিটের ব্যারামটিকে ভূতের ভর হিসেবে ভাবা হয় তা প্রায়শঃই আসলে হিস্টেরিয়া নামে একটি মানসিক রোগ। গ্রীকশব্দ হিস্টেরা-র অর্থ মেয়েদের জরায়ু এবং আগে ধারণা ছিল এই জরায়ু ক্ষেপে গেলে রোগটি হয় ও শুধু মেয়েদেরই হয়। পরে জানা গেছে জরায়ুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই এবং নারীপুরুষ

উভয়েরই এটি হতে পারে, তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশী—তার কারণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা এমনই যে মহিলাদের উপর আমাদের সমাজে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন অনেক বেশী হয়। এছাড়া মেয়েদের আবেগগত কিছু বিশেষত্বও কাজ করে। অবাঞ্ছিত বা কষ্টকর কোন অবস্থা থেকে পলায়নীমৃনোবৃত্তি, কোন অতৃপ্ত বাসনার তীব্র তাড়না, অপ্রীতিকর কোন স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা ভুলে যাওয়ার অবচেতন চেষ্টা ইত্যাদি নানা কারণে এই মানসিক অস্বাভাবিকত্বের সৃষ্টি হতে পারে। রোগী বা রোগিনীর অবচেতন মনের ক্রিয়াতেই ব্যাপারটি ঘটলেও সে কিন্তু এ ব্যাপারে সচেতন থাকে না বা ইচ্ছে করেই করে না। অনেক সময় বংশগত কিছু ব্যাপার থাকে যার ফলে কেউ কেউ ছোটবেলা থেকে এধরনের মানসিক অসুস্থতাপ্রবণ হয়। এদেরই অনেকে হিস্টেরিয়ার প্রভাবে বা মানসিক অসুস্থতার কারণে বিভিন্ন ঠাকুর দেবতার সাক্ষাৎ পায় বলে মনে করে, উদাস-উদাস চেহারা নিয়ে কিছু অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলে এবং সাধুবাবা বা অবতার হিসেবে পরিচিত হয়।

হিস্টেরিয়ার প্রকাশ বহু বিচিত্রভাবে হতে পারে। এর ফলে কারোর কথা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, হাত-পায়ের 'প্যারালিসিস' হতে পারে, চোখে না দেখতে বা কানে না শুনতে পারে, ইত্যাদি। তবে খিঁচুনি বা তথাকথিত ফিটের ব্যাপারটিই ঘটে বেশী। সাথে অসংলগ্ন বা অস্বাভাবিক কথাবার্তাও রোগী বলতে পারে। বহু অতীতের কোন স্মৃতি—যা এমনিতে মনে থাকার কথা নয়, তা উদ্ধার হতে পারে ; এটি ঘটে সম্মোহিত হওয়ার মত একটি অবস্থার জন্য, যখন বাইরের উত্তেজনা মস্তিষ্কে প্রায় কাজ করে না এবং মস্তিষ্ক তার স্নায়ুকোষে জমে থাকা পুরনো স্মৃতিকে বিশ্লেষণ করতে পারে। এই ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনার জন্য ভূতের ভর হিসেবে ভাবার প্রবণতাটা শক্তিশালী হয়। অধ্যাপক গিরীন্দ্র শেখর বসু তাঁর 'স্বপ্ন' বইতে এ ধরনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

এক বাঙালী মহিলা হিস্টেরিয়ার ফিটের সময় অনর্গল হিব্রু বলতেন। এই ভাষা জানার কোন সম্ভাবনা তাঁর ছিল না এবং বাস্তবতঃ সুস্থ অবস্থায় এই ভাষার বিন্দুবিসর্গও বলতে পারতেন না। স্বাভাবিকভাবেই একে কোন হিব্রুভাষী ভূতের ভর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। কিন্তু পরে অনুসন্ধানে জানা যায়, ভদ্রমহিলা শিশু অবস্থায় যেখানে থাকতেন সেখানে এক পাদ্রী প্রতিদিন সকালে হিব্রুভাষায় বাইবেল পাঠ করতেন। এইভাবে বেশ কিছুদিন শোনার ফলে মহিলাটির মনে হিব্রুভাষার কথাগুলি গেঁথে যায় এবং ফিটের সময় তার প্রকাশ ঘটে। আরেক মহিলা ফিটের সময় বহু দূরের এক গ্রামের এক মহিলার কথা বলতেন বহু আগে যাঁর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। পোস্ট্যাল গাইড দেখে ঐ গ্রামের পোস্টমাস্টারের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেল ব্যাপারটি সত্যি। ঐ গ্রামের বা ঐ মহিলার সাথে যোগাযোগের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা তাঁর ছিল না, তাই ব্যাপারটিকে অপঘাতে মৃত্যু ঐ মহিলার প্রেতাত্মার ভর হিসেবেই ভাবা হয়েছিল। অধ্যাপক বসুও বহুদিন এর কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি। একদিন ঐ মহিলার বাড়ীতে বসে বসে সময় কাটানর জন্য তিনি অনেক পুরনো 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখেন একটি সংখ্যায় ঐ গ্রামের ঐ মহিলার আত্মহত্যা করে অপঘাতে মৃত্যুর ঘটনাটি বলা হয়েছে। তখন ব্যাপারটি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়। আসলে এই মহিলাটিও কোন সময় এটি পড়েছিলেন এবং ব্যাপারটি তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে ছিল। যদিও সুস্থ অবস্থায় এটি তাঁর মনে থাকত না, তবু ফিটের সময় এই স্মৃতিটি প্রকাশ পেত। ভূত বা দেবতার ভরের সমস্ত ব্যাপারকেই এভাবে অনুসন্ধান করলে আসল সত্যটি জানা যাবে।

হিস্টেরিয়ার ফিটের সাথে মৃগী (epilepsy)-রোগের ফিটের সাদৃশ্য থাকায় দুটিকে একই ভাবা হয় এবং মৃগীর ফিটকেও ভূতের ভর হিসেবে ভাবা হয়। হিস্টেরিয়া একটি মানসিক রোগ এবং

কোন্ বিশেষ অবস্থা রোগীর মধ্যে এটির সৃষ্টি করেছে তা জেনে দূর করতে পারলে এটি সেরে যায়। যেমন কোন অবিবাহিতা পূর্ণবয়স্কা মেয়ে তার অতৃপ্ত আবেগ ও যৌন বাসনার কারণে হিস্টেরিয়ার শিকার হতে পারে,—যৌন বিষয়ে মেয়েদের সম্পর্কে সামাজিক কিছু বিধিনিষেধ ও সংস্কার, বাইরে না বেরুন বা ছেলেবন্ধুদের সাথে বন্ধুর মত মেশাকেও বন্ধ করা ইত্যানি ব্যাপারগুলি একে আরো জটিল করে তোলে। এই ধরনের মেয়ের বিয়ে দিয়ে তার প্রয়োজনীয় ও স্বাভাবিক আবেগ ও যৌনআকাঙ্খাকে স্বাভাবিক-ভাবে মেটানর ব্যবস্থা করলে তার হিস্টেরিয়া চলে যায়, যদিও সব ধরনের হিস্টেরিয়া রোগীই বিয়ের পর ঠিক হয়ে যাবে—এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। একইভাবে অতৃপ্ত উচ্চাকাঙ্খা, পারিবারিক অশান্তি বা অত্যাচার, কোন গৃহবধূর অত্যধিক কাজের চাপ ইত্যাদি বহুবিচিত্র কারণে হিস্টেরিয়া হতে পারে।

অন্যদিকে মৃগী রোগটি ঘটে মস্তিষ্কের কোন অংশের অস্বাভাবিক সংবেদনশীলতা ও উত্তেজনার কারণে; মস্তিষ্কের আঘাত বা রোগ, টিউমার, ইত্যাদি নানা কারণে এটি ঘটতে পারে। হিস্টেরিয়ার ফিট রোগী যখন একা থাকে তখন বা বিপজ্জনক অবস্থায় হয় না। কিন্তু মৃগীরোগীর ফিট যখন তখনই হতে পারে। তাই ট্রেন বা বিমান চালান, আগুনের ধারে কাজ ইত্যাদি এদের করতে দেওয়া উচিত নয়। পুকুরে একা স্নান করতে করতেও মৃগী রোগী ফিটে আক্রান্ত হতে পারে, তখন তাকে পুকুরের কাদায় মাথা গোঁজা, মৃত অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে। একেও 'ভুতে মাথা মটকে দিয়েছে' এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। উপযুক্ত চিকিৎসায় মৃগীর ফিটকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় যদিও হিস্টেরিয়ার মত প্রায় সব রোগীর ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব হয় না। কিন্তু একজন হিস্টেরিয়া রোগীকেও যদি ভূতের ভর হিসেবে ভেবে 'ভূত তাড়ানোর' জন্য শুধু মারধোর করা হয়, বা অত্যাচার চালানো হয় তাহলে রোগটি জটিল ও স্থায়ী মানসিক

অস্বাভাবিকত্ব সৃষ্টি করতে পারে। অথচ বিজ্ঞানসম্মতভাবে, সামান্য কিছু চিকিৎসায় ত্রুটি সম্পূর্ণ দূর হয়ে যেত। অন্যদিকে রোগীর নিজের মনেও ভূত-প্রেত সম্পর্কে বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা থাকায় নিজের অবস্থাকে ভূতের ভর হিসেবে বর্ণনা করে সে ব্যাপারটিকে আরো জটিল করে তোলে। কোন বিশেষ দেব দেবীর ভর হিসেবেও অনেক সময় হিস্টেরিয়া রোগের ব্যাখ্যা চলে—রোগী বা রোগিনীর শরীরে অমুক ভর করেছে বলে বর্ণনা করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাপারটি প্রায়শঃই ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দেয়—রোগীকে ঠাকুর ভেবে সরলবিশ্বাসী মানুষেরা প্রণামী ইত্যাদির স্রোত বইয়ে দেয়। ভূতের মত তথাকথিত দেবতারও কোন অস্তিত্ব না থাকায় দেবতার ভর হওয়াটাও মিথ্যে। আর এইভাবে কোন বাহ্যিক শক্তি কোন জ্ঞাত বা প্রত্যক্ষ উৎস থেকে নির্গত না হয়ে কারোর শরীরে ঢুকতেও পারে না।

মানসিক বা শারীরিক এই ধরনের রোগকে সারানর অপচেষ্টায় ওঝা-গুণিনরা যে অমানুষিক অত্যাচার রোগীর ওপর চালায় তা প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করেই বন্ধ করা উচিত। এর ফলে রোগীর ক্ষতি ছাড়া ভাল তো হয়ই না, উপরন্তু বাড়ীর লোকের অর্থব্যয় ও নির্লিপ্ততা বাড়ে। হিস্টেরিয়া যেহেতু একটি মানসিক রোগ তাই কোন কোন ক্ষেত্রে ছেঁকা দেওয়া, প্রচণ্ড আঘাত করা ইত্যাদি শক্ থেরাপির মত কাজ করে ও বিরল ক্ষেত্রে রোগ সারায় বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই ধারণাটিকেও সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া উচিত। মানসিকরোগে এলোপাথাড়ি শক্ অর্থাৎ ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি (ECT) প্রয়োগের মত এই ধরনের শক থেরাপিও অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর। এবং এই ধরনের ধারণা পরোক্ষভাবে হলেও, ওঝাগুণিনদের ক্ষতিকর কাজকর্মকেই প্রশ্রয় দেবে। এছাড়া, মৃগীরোগীর ক্ষেত্রে এ ধরনের তথাকথিত শক্থেরাপি মৃদুভাবে প্রযুক্ত হলেও প্রাণহানির কারণ হতে পারে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও হিস্টেরিয়ার মত

নানা মানসিক অস্বাভাবিকত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। কেউ যখন দেখে অতিরিক্ত পরিশ্রম করেও সে স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখতে পায় না অথচ আরেকজন স্বল্প বা বিনা পরিশ্রমে প্রচুর সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে এবং যখন এ ব্যাপারটি তার মস্তিষ্কের উপর তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তখন তারো মানসিক অস্বাভাবিকত্ব সৃষ্টি হতেই পারে। অন্য দিকে মুক্ত চিন্তা করা, স্বাধীনভাবে মেলামেশা করা, শরীর ও মনের স্বাভাবিক চাহিদাগুলিকে পূরণ করা ইত্যাদিকে যখন, বিশেষতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে, নানা অপ্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ-সংস্কারের দ্বারা অবরুদ্ধ করা হয় বা সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে এগুলি আরোপিত হয়, তখনও নানা মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়। ভূতের বা দেবতার ভর হিসেবে ভাবলে, রোগসৃষ্টির এই বাস্তব ভিত্তিটিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গিয়ে অসুস্থ পরিমণ্ডলকে স্থায়ী করে রাখা হবে।

'ভোলা'য় ধরা

'ভোলা' নামে এক অপদেবতা ভর করলে নাকি মানুষ সব ভুলে যায় অর্থাৎ বিভ্রান্ত ও আত্মবিস্মৃত হয়। ফাঁকা মাঠে বেরিয়ে পথিক তখন দিক হারিয়ে ফেলে—'ভোলা' তখন তাকে উল্টোপাল্টা নিয়ে যায়, সে হয়তো যেতে চাইছে পূর্বদিকের এ কোণে, কিছুক্ষণ হাঁটার পর সে দেখল আসলে সে পৌঁছে গেছে পশ্চিমদিকের ঐ পারে। কিংবা কিছুই সে মনে করতে পারে না, হাবার মত দাঁড়িয়ে থাকে, কথাও হয়তো বন্ধ হয়ে যায়। অনেক জায়গায় এর চিকিৎসা হিসেবে 'ভোলা'য় ধরা ব্যক্তিকে সর্বসমক্ষে হাজির করান হয়। তারপর গুণিন কিছু মন্ত্র পড়ে হঠাৎ রোগীর কাপড় খুলে তাকেকে উলঙ্গ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রোগী আত্মসচেতন হয়ে কাপড়টি ধরে রাখতে চায় আর 'ভোলা'ও তখন পালিয়ে যায় অর্থাৎ লোকটির স্মৃতি ফিরে আসে, বিভ্রান্তি কেটে যায়।

ভুলে যাওয়া থেকে 'ভোলা' কথার সৃষ্টি, কিন্তু এই নামে কোন

অপদেবতার সৃষ্টি কোনদিনই হয়নি। ফাঁকা মাঠে বিশেষতঃ রাত্রিবেলা পথ ভুল করার অভিজ্ঞতা অনেক গ্রামবাসীরই ঘটে, ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরেও ব্যাপারটি হতে পারে। সব ক্ষেত্রেই দৃষ্টি বিভ্রম (visual illusions) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নির্জন ফাঁকা মাঠে একা চলার সময় আজন্মলালিত কুসংস্কারের বশে 'ভোলা' বা এই ধরনের অপদেবতার ভয় ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত করে। তখন গন্তব্যস্থলের বটগাছের নিশানার চিন্তাটি আকাশের মেঘের সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে, দূরের সাদা মেঠো পথকে পুকুর বা বাড়ী বলে ভুল হতে পারে ; দূরের জোনাকির আলো-কে মনে হতে পারে লোকালয়। 'ভোলায়' ধরার ভয় আদৌ না থাকলেই 'ভোলায়' ধরার ব্যাপারটা অনেক কমে যাবে। আর সাময়িক স্মৃতিভ্রংশের ব্যাপারটি মানসিক বা শারীরিক অনেক রোগের কারণেই ঘটে। আকস্মিক কোন মানসিক আঘাত বা অস্বাভাবিক মানসিক গঠনের কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সামান্য কোন কারণেই ব্যাপারটি ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে ঐ কাপড় খুলে দেওয়ার মত ঘটনা রোগীর স্নায়বিক কাজকর্মকে দ্রুত কার্যকরী করে তুলে এই মৃদু অস্বাভাবিকত্বতে সারিয়ে তুলতে পারে। তবে স্মৃতিলোপ বা আত্মবিস্মৃতি যদি স্থায়ী হয় তবে এইভাবে টোটকা কাপড়-খোলা চিকিৎসায় কিছু কাজ হবে না। উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। বার্দ্ধক্য ও বার্দ্ধক্যজনিত কিছু রোগ, মস্তিষ্কে আঘাত, মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত কিছু রোগ ও টিউমার, অতিরিক্ত মদ্যপান ইত্যাদি নানা কারণে স্মৃতি কমে যেতে পারে। স্নায়ুপ্রদাহের সাথে যুক্ত থেকে, কোর্সাকফ সাইকোসিস (Korsakoff's psychosis) নামে এক বিশেষ অবস্থায় রোগীর সাম্প্রতিক স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায় আর বহু পুরনো স্মৃতি মনে থাকে। যাই-ই হোক, 'ভোলা' নয়, মস্তিষ্কের রোগেই অস্বাভাবিকভাবে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটি ঘটে। স্পষ্টতঃই মস্তিষ্কে টিউমার বা এই ধরনের অন্য কিছুতে এটি ঘটলে, রোগীর কাপড় ধরে হাজার টানাটানি করলেও তার স্মৃতি ফিরে

আসবে না, যতক্ষণ না ঐ টিউমারটি বা মূল কারণটি দূর করা যায়।

জলাতঙ্ক

জলাতঙ্ক রোগের নামে কেই বা না আতঙ্কিত হয়! পাগল কুকুর কামড়ালে রোগটি হয় এবং এটি হলে রোগী নাকি জল দেখলেই আতঙ্কিত হতে থাকে—তাই এই নাম। শেষে জল না খেয়ে রোগী মারা যায়। কুকুরে কামড়ানো রোগী আবার নাকি কুকুরের মত পাগলা হয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে ও কুকুরের মত অন্যদের কামড়াতেও পারে—যার থেকে অন্য লোকেরও রোগটি হবে। বিশেষ অবস্থায় রোগী নাকি আবার কুকুরের মত ডাকও ছাড়ে—কুকুরের কামড় থেকে এ রোগ, তাই কুকুরের মত ডাক ছাড়বে এতে আর বিচিত্র কি?

কুকুরের কামড়ে শরীরে বিষ ঢুকেছে কিনা তা বোঝার জন্য জলভরা একটি থালার দিকে রোগীকে তাকিয়ে থাকতে বলা হয়। রোগী যদি নিজের মুখ না দেখে অন্য কারোর মুখ বা জন্তুর ছায়া ঐ জলে দেখে তাহলে বুঝতে হবে তার শরীরে বিষ ঢুকেছে। স্থানান্তরে (যেমন বাংলাদেশে) কিছুটা ভিন্নতর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যেমন রোগীর হাতে ৭টি গোমাংসের টুকরা ও সাতটি মাষকলাই দিয়ে কূয়োর জলের দিকে তাকাতে বলা হয়। সে একটি করে মাংসের টুকরো খাবে এবং একটি করে মাষকলাই কূয়োর জলে ফেলবে। সব টুকরো শেষ হয়ে যাওয়ার পর ব্যক্তিটি যদি কূয়োর জলে নিজের ছায়া না দেখে অন্য ছায়া দেখে তবে বুঝতে হবে শরীরে বিষ ঢুকেছে। এটি সাধারণতঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। কুকুর কামড়ানোর জন্য জলাতঙ্কের চিকিৎসা করারও নানা পদ্ধতি রয়েছে। যেমন সাতটি বিশেষ ধরনের এক পোকাকে (কোথাও বাঘা পোকা, কোথাও বা তেলা পোকা) ঘি ও একটি বিশেষ গাছের পাতার সঙ্গে বেটে গোলমরিচের সঙ্গে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

কোথাও বা রোগীর পিঠে 'মন্ত্রপূত' কাঁসার থালা বসানো হয়। বিশ্ব স—থালাটি শরীর থেকে বিষ টেনে নেবে, সব বিষ টানা হয়ে গেলে আপনা থেকেই পড়ে যাবে। এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে, আরো বহু রোগের মত জলাতঙ্ককে ঘিরেও নানা বিশ্বাস, নানা চিকিৎসাবিধি প্রচলিত রয়েছে।

জলাতঙ্ক (Rabies) রোগটি হয় এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণে। ল্যাটিন শব্দ rabio-এর অর্থ পাগল হয়ে যাওয়া, এর থেকেই নাম rab es ; পুরনো গ্রীক নাম ছিল lyssa যার অর্থও পাগলামি ; আবার জলাতঙ্কের মত একে hydrophobia বলেও বলা হয়—গ্রীক শব্দ hydor-এর অর্থ হল জল, phobos মানে আতঙ্ক। রোগটি খুবই সাংঘাতিক, প্রায় সব ক্ষেত্রেই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ভাইরাস কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে—যার ফলে উত্তেজনা, আক্রমণ করার ইচ্ছা ও পাগলামি দেখা দেয়, শেষ অব্দি মাংসপেশী অবশ হয়ে গিয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু শুধুমাত্র কুকুর থেকেই রোগটি হয় না। উষ্ণ শোনিত অন্যান্য প্রাণী যেমন, বেড়াল, নেকড়ে, শেয়াল, বাদুড় * ইত্যাদি থেকেও এটি হতে পারে। বিশেষতঃ নেকড়ে ও শেয়ালের কামড় এদিক থেকে বিপজ্জনক এবং মুখে, মাথায় বা ঘাড়ে কামড়ালে বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। অবশ্য এরা কামড়ালেই যে রোগটি হবে তাও ঠিক নয়। এই সব প্রাণী যদি আগে থেকেই এই সব ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকে তবে তাদের লালাগ্রন্থিতে এই ভাইরাস থাকে ও বংশবৃদ্ধি করে ; তাই এরা কামড়ে শরীরে যদি ক্ষত সৃষ্টি করে এবং এইভাবে ভাইরাসভরা লালা মানুষের রক্তে মিশিয়ে দেয় তবেই মানুষও এই রোগে আক্রান্ত হয়। ১৮৮১ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ব্যাপারটি আবিষ্কার করেন। রোগাক্রান্ত কুকুর বা শেয়াল কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেও রোগটি হয় না—অন্তত ১২ দিনের

* রক্ত চোষা বাদুড় (vampire bat) সংক্রামিত হলে তার কামড়ে জলাতঙ্ক হতে পারে। এ বাদুড়টি আমাদের দেশে নেই।

পর, ও দু'এক মাস এমন কি এক বছর পরেও রোগটি দেখা দিতে পারে। তবে ঘাড়ে-মাথায়-মুখে কামড়ালে তুলনামূলকভাবে তাড়াতাড়ি শুরু হয়। যে কুকুর কামড়েছে, সেটি যদি ১০ দিন পরেও জীবিত থাকে তবে বুঝতে হবে, তার জলাতঙ্ক রোগটি ছিল না এবং তার কামড় থেকে রোগটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। রোগ শুরু হওয়ার পর ৬ দিনের বেশী কুকুর বেঁচে থাকতে পারে না এবং রোগ শুরু হওয়ার ৪ দিনের আগে তার লালায় রোগের সংক্রামক ভাইরাস থাকতে পারে না। এইজন্য সর্বাধিক মোট ১০ দিন কুকুরটিকে লক্ষ্য রাখতে হয় এবং তারপরেও সে বেঁচে থাকলে রেবিস-এর ভাইরাসকে মারার জন্য ১৪টি ইনজেকশান (antirabies vaccine বা ARV) নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কুকুরটিকে (বা শেয়াল, নেকড়ে ইত্যাদিকে) যদি আদৌ লক্ষ্য রাখা সম্ভব না হয়, তবে নিরাপত্তার জন্য এই ইনজেকশান নিয়ে নেওয়া উচিত, কারণ যদি তার রোগটি থেকে থাকে ও কামড় খাওয়া ব্যক্তির রোগটি যদি হয়, তবে প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যেই মৃত্যু প্রায় অবধারিত।

রোগটি শুরু হওয়ার ১-২ দিনের মধ্যে ভাইরাস রোগীর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে—ফলে শরীরের বিভিন্ন মাংসপেশী সামান্য উত্তেজনায় তীব্রভাবে উত্তেজিত হয়। এই কারণেই জল খেতে গেলে যেই চোয়াল নাড়ান হয়, সঙ্গে সঙ্গে মুখের মাংসপেশী সংকুচিত হয়ে যায়, ফলে রোগীর মুখের চেহারা হয় আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তির মত। আসলে কিন্তু জল দেখে রোগী আতঙ্কিত আদৌ হয় না। রোগীর সামনে যদি জল রাখা হয় এবং যদি সে ঐ জল খাওয়ার আদৌ চেষ্টা না করে, বা খাওয়ার কথা না ভাবে তবে তার মাংসপেশী সংকুচিত হবে না অর্থাৎ তার আতঙ্কগ্রস্ত চেহারা হবে না। আর শুধু জল খাওয়ার চেষ্টা নয়,—মুখ নাড়ানর যে কোন চেষ্টা এবং ঠাণ্ডা হাওয়া, তীব্র শব্দ, আলো বা গন্ধ ইত্যাদি নানা উত্তেজনাতেই মুখের মাংসপেশী সংকুচিত হয়ে আতঙ্কিত

চেহারা নিতে পারে। তাই জলাতঙ্ক বা hydrophobia কথাটি ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরী করা। মুখের ভেতরের মাংসপেশীর সংকোচনের জন্য রোগী জল খেতেও পারে না। শুধু মুখের বা মুখমণ্ডলের নয়, হাতে-পায়ের মাংসপেশীরও খিঁচুনি হয়। আর এই অবস্থায় হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু হতেও পারে। একইভাবে স্বরযন্ত্রের মাংসপেশী আক্রান্ত হয়ে রোগীর গলার স্বরও বিকৃত হয়। কিন্তু কুকুরের ডাকের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। বিদ্‌ঘুটে বিচিত্র ধরনের আওয়াজই বেরোয়, যার সাথে নানা প্রাণীর আওয়াজের মিল থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু কুকুর কামড়েছে তাই রোগী কুকুরের মত ডাক ছাড়বে এ ধারণাটি ভুল। স্নায়ুতন্ত্রের পূর্বোক্ত উত্তেজিত অবস্থায় রোগীর মুখমণ্ডলের মাংসপেশীর আকস্মিক সংকোচনের কারণে কখনো কখনো মুখ হাঁ হয়ে. দাঁত বেরোতে পারে ও মুখ দিয়ে লালা গড়াতে পারে; এটিকে দাঁত-মুখ খিঁচোনো বলে মনে হতে পারে বা সে কামড়াতে চাইছে বলে মনে হতে পারে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অসহায় এই রোগীর মনে পাগলা কুকুরের মত কামড়ানোর কোন ইচ্ছা থাকে না।

শরীরে বিষ ঢুকেছে কিনা তা দেখার জন্য ছায়া দেখার যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাও ভ্রান্ত। জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আক্রমণ করলে নানা ধরনের দৃষ্টি বিভ্রম হতে পারে, তার ফলে থালা বা কূয়োর জলে নিজের ছায়া না দেখে অন্য কিছুর ছায়া দেখতে পারে। কিন্তু এইভাবে ব্যাপারটির একটি দুর্বল ব্যাখ্যা দেওয়াটা সম্পূর্ণ ভুল ও বিপজ্জনক। কুকুরকে নজরে রাখা, কামড়ের জায়গায় রক্তপাত ও রোগটি হয়ে গেলে তার সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ থেকেই ভাইরাস শরীরে ঢুকেছে কিনা বোঝা যায়। মস্তিষ্ককোষের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাতেও কিছু পরিবর্তন ধরা পড়ে।

জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসাতে ওঝারা পিঠে কূলো বা থালা বসিয়ে, মাটির সরা ভেঙ্গে, মন্ত্র পড়ে ও হাবিজাবি নানাকিছু খাইয়ে

যে সব চিকিৎসা করে তা-ও সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। মসৃণ কাঁসার থালা চেপে পিঠে বসিয়ে দিলে সবার পিঠেই সেটি কিছুক্ষণ আটকে থাকবে—ঐ ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়াক বা না কামড়াক। তাই থালা 'বিষ' টেনে নিচ্ছে জাতীয় বিশ্বাস নির্ভেজাল মিথ্যা এবং 'জলাতঙ্ক'-এর ভাইরাসকে এ ধরনের কোনকিছু কখনোই মারতে পারে না। রোগাক্রান্ত কুকুর, শেয়াল ইত্যাদি কাউকে কামড়ালে পেটে চামড়ার নীচে ১৪টি অ্যান্টিরেবিস ভ্যাক্সিন (A R V) ইনজেকশান করে রোগ প্রতিরোধ করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে ভাইরাস শরীরে ঢুকে থাকলেও তা মারা যায় বা দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু রোগের লক্ষণ একবার প্রকাশ পেলে তা রোগীর পক্ষে মারাত্মক, প্রায় কোন রোগীই বাঁচে না। তবু লক্ষণগত চিকিৎসা, খিঁচুনির সময় অজ্ঞান করে রাখা, কিছু ওষুধ, কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির সাহায্যে বিরল ক্ষেত্রে কাউকে বাঁচানও সম্ভব হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কোন ওষুধের সাহায্যে নয়, কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃদপিণ্ডের কাজ চালিয়ে (intensive cardiorespiratory assistance) সারা পৃথিবীতে এখনো অব্দি মাত্র দু'জন জলাতঙ্কের রোগীকে বাঁচান সম্ভব হয়েছে।

পাগলা কুকুর অর্থাৎ জলাতঙ্কে রোগাক্রান্ত প্রাণী কামড়ালে, পটাস পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে স্থানীয় ক্ষত পরিষ্কার করা, ফেনল দিয়ে কটারাইজ করা ইত্যাদি করা যায়। ৩০ মিনিটের মধ্যে সম্ভব হলে আলতো করে ক্ষতের উপরে এমন বাঁধন দেওয়া উচিত যাতে শিরার রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়, কিন্তু ধমনীর রক্ত স্থানীয় অঞ্চল দিয়ে বেরুতে পারে। কামড়ের ফলে চামড়া যদি ছিঁড়েও যায় তবু প্রথম তিন দিনের মধ্যে সেলাই করা উচিত নয়। এবং সর্বোপরি দরকার সময় নষ্ট না করে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার সুযোগ নেওয়া অর্থাৎ ইনজেকশান নিয়ে রোগ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করা। জলে ছায়া দেখিয়ে বা কুলো-থালা পিঠে দিয়ে সময় কাটালে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুকেই নিশ্চিততর করে তুলবে। প্রকৃতপক্ষে মূলতঃ এই

ধরনের অজ্ঞতা ও অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার কারণেই সারাভারতে প্রতিবছর প্রায় ১৯০০০ ব্যক্তি জলাতঙ্কে প্রাণ হারান। [ভারতবর্ষের মত গরীব দেশগুলিতে যে ARV ব্যবহৃত হয় সেটি তৈরী করা হয় ভেড়া বা ছাগলের মত জন্তুকে রোগাক্রান্ত করে তার মস্তিষ্ক কোষ থেকে। কিন্তু এটির অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যেমন উল্টে স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়ে প্যারালিসিস হয়ে যায় (প্রায় প্রতি ৬০০ জনে ১ জনের ক্ষেত্রে)। তাই উন্নত দেশে আরো উন্নত প্রতিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যেমন, Human diploid cell-tissue culture vaccinc (HDCV)। অতি সম্প্রতি নিরাপদ ও স্বল্প ব্যয়ে, উন্নততর Rhesus diploid cell-strain rabies vaccine (RDRV) তৈরী করা হয়েছে যা মাত্র ৫ বার ইনজেকশানেই কার্যকরী।]

পেটে ছ্যাকা

পিলে অর্থাৎ প্লীহা (spleen) বা যকৃৎ (liver) বড় হয়ে গেলে, স্থানীয় পেটের চামড়ায় ছ্যাঁকা দিয়ে ফোস্কা ফেলে দেওয়ার পদ্ধতি অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। লোহার দণ্ড গনগনে লাল করে অথবা কোন গাছ-পালার পাতা শুকিয়ে তা জ্বালিয়ে ছেঁকা দেওয়া হয়, কখনো বা লোহার কাস্তের সূচালো ডগাটি গরম করে তা চেপে ধরা হয়।

ছ্যাকা দেওয়া ও তার ফলে ফোস্কা বা ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার পর স্থানীয় অঞ্চলে প্রদাহ (inflammation) হয়। এর ফলে স্থানীয় অঞ্চলে চামড়ায় রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। এই তাপ বা চামড়ার ক্ষতের ফলে নীচের বেড়ে যাওয়া যকৃৎ বা প্লীহায়ও রক্ত সঞ্চালন কিছুটা বাড়ে। এর ফলে এদের মৃদুপ্রদাহজনিত কোন অবস্থার উপশম করা যায় এবং বিরল ক্ষেত্রে এইভাবে মৃদুপ্রদাহের কারণে এদের বৃদ্ধিকে কিছুটা কমান যায়। শরীরের নানা অংশের প্রদাহকে তাপ প্রয়োগে কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি মানুষের একটি অতি প্রাচীন অভিজ্ঞতা।

পুরা প্রস্তরযুগে (**Pleolithic** বা **Old Stone Age**) (অর্থাৎ নব্য প্রস্তর-যুগ বা Neolithic Age-এরও আগে—আনুমানিক ১২০০০-৫০০০০ বৎসর পূর্বে) মানুষ আগুনের ব্যবহার ও কৃত্রিমভাবে আগুন সৃষ্টি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করার পর থেকেই শারীরিক নানা দুরবস্থার বিরুদ্ধেও ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আগুন ও তাপের ব্যবহার সে করেছে ; সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ হলেও পরীক্ষা মূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অভাব থাকায় এর মধ্যে বহু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন প্লীহা ও যকৃৎ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ক্যান্সার, লিউকিমিয়া, থ্যালাসিমিয়া ইত্যাদি অনেক কারণে ও বিভিন্ন ধরনের প্রদাহের ফলে বাড়তে পারে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি কোন রোগ নয়, বিশেষ রোগের বিশেষ লক্ষণ মাত্র। তাই এই মূল রোগটিকে নির্ধারিত করে তার চিকিৎসা করাটাই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। যকৃৎ বা প্লীহার বৃদ্ধি ঘটলেই পেটে ছ্যাঁকা দিয়ে ফোস্কা ফেলার বাস্তব উপযোগিতা দুর্লভ ক্ষেত্রে থাকলেও তা অনুসরণ করা সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে এখনো শহরের হাসপাতালে অনেক রোগী আসেন যাঁদের নানা কারণে যকৃৎ ও প্লীহার বৃদ্ধি ঘটেছে—তাঁদের পেটে ফোস্কার দাগ দেখা যায়, কিন্তু এতে যকৃৎ বা প্লীহার আকার কমে নি। এইভাবে ছ্যাঁকা ফেলে ক্ষত সৃষ্টি করার ফলে অহেতুক জীবাণু সংক্রমণ ইত্যাদির ফলে রক্তদূষণ (septicaemia) বা টিটেনাস হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। রক্তহীনতায় ভোগা, দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আরো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

তাই সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা না করে এইভাবে পেটে ছ্যাঁকা দেওয়ানর ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত।

জণ্ডিসের মালা ও জণ্ডিস

ন্যাবা বা জণ্ডিস (**jaundice**) হলে, বিশেষ এক ধরনের মালা পরলে নাকি জণ্ডিস সেরে যায়। ব্যাপারটি অলৌকিক জাতীয়

নিশ্চয়ই কিছু, কারণ, দেখা গেছে মালাটি পরার পর অদ্ভুতভাবে তা বাড়তে থাকে। একসময় তার বৃদ্ধি থেমে যায়—জণ্ডিসও চলে যায়। গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায়, এমনকি খোদ কলকাতা শহরেও এধরনের মালার চলন বেশ রয়েছে—বিশেষ কিছু পরিবার এই মালা বিতরণ করে, অবশ্যই ব্যবসায়িক ভাবে ; কেউ কেউ আবার ব্যাপারটিকে অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ভেবে বিনামূল্যেও বিতরণ করে।

ন্যাবা বা জণ্ডিস হলে চোখের সাদা অংশ, এমনকি চামড়া, নখ, জিভ ইত্যাদি হলুদ হয়ে যায়। ব্যাপারটি ঘটে বিলিরুবিন ($C_{38}H_{36}N_4O_6$) নামে হলুদ রঙের একটি রঞ্জক পদার্থের জন্য। স্বাভাবিকভাবে মানুষ ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীর পিত্তে এটি থাকে ; যকৃৎ পিত্ত (bile) তৈরী করে এবং এতে এই রঞ্জক পদার্থের পরিমাণ থাকে ১৫-৩০%। রক্তের লোহিত কণিকার লাল হিমোগ্লোবিন থেকে যকৃতের কুপ্‌ফার (**Kupffer**) কোষে নির্দিষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, সীমিত পরিমাণে স্বর্ণাভ হলুদ রঙের এই বিলিরুবিন তৈরী হয়। এই পিত্ত পিত্তনালী বেয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে যায় এবং অন্ত্র থেকে প্রধানতঃ চর্বি জাতীয় খাদ্য শোষণে সাহায্য করে। পায়খানায় কিছু বিলিরুবিন বেরোয় (প্রতিদিন ৪০-২৮০ মিলিগ্রাম)—তাই তার রঙ হলুদ ; আর প্রস্রাবেও সামান্য পরিমাণ বেরোয়—যার ফলে তারও রঙ হলুদাভ।

যকৃৎ ছাড়া প্লীহা ও হাড়ের মজ্জায়ও অল্প পরিমাণে এটি তৈরী হয়। রক্তে এর স্বাভাবিক পরিমাণ প্রতি ১০০ সিসি রক্তে ০·১—১ মিলিগ্রাম। এর বেশী হলে প্রথমে প্রস্রাব হলুদ হয়, তার পর চোখের সাদা অংশ ও শরীরের অন্যান্য অংশ হলুদ হতে থাকে। রক্তে এই বিলিরুবিনের পরিমাণ বিভিন্ন কারণে বাড়তে পারে। খুব সাধারণ কারণ হল এক ধরনের ভাইরাস জনিত যকৃতের প্রদাহ (hepatitis)। এই ভাইরাসকে মারার মত ওষুধ না থাকলেও স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৭-১০ দিনের

মধ্যে শরীরের নিজস্ব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তা আপনাআপনিই সেরে যায়। তবে এর জন্য পূর্ণ বিশ্রাম ও গ্লুকোজ, ভিটামিন জাতীয় কিছু জিনিষ রোগীকে দেওয়া এবং চর্বি জাতীয় খাবার না দেওয়া দরকার। এছাড়া পিত্তনালীতে পাথর, টিউমার, ক্যান্সার অথবা কাছাকাছি অন্য কোন অংশের টিউমার পিত্তনালীকে বন্ধ করে দিলেও পিত্ত তার স্বাভাবিক গন্তব্যস্থল ক্ষুদ্রান্ত্রে যেতে পারে না এবং রক্তে এর পরিমাণ বাড়ে। তখন পায়খানার রঙ সাদা হয়ে যায়। বিশেষ কিছু অবস্থায় রক্তের লোহিত কণিকা যদি অতি অতিরিক্ত পরিমাণে ভাঙ্গতে থাকে তাহলেও হিমোগ্লাবিন থেকে বেশী পরিমাণে বিলিরুবিন তৈরী হবে এবং জণ্ডিস হবে (যেমন নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে, বিশেষ কিছু ধরনের রক্তহীনতায়, সাপের কামড়ে, রক্ত দেওয়ার গণ্ডগোলে ইত্যাদি)। এত কিছু রোগের লক্ষণ হিসেবে জণ্ডিস দেখা দেয়। এই সব রোগের কোনটির প্রকৃত চিকিৎসা ঐ তথাকথিত ন্যাবার মালার দ্বারা হয় না।

"ন্যাবার মালা কোন শাস্ত্র সম্মত প্রতিষ্ঠানিক চিকিৎসা পদ্ধতি নয়, একান্তই টোটকা চিকিৎসা। প্রায় সব ক্ষেত্রেই বামনহাটি গাছের ডাল দিয়ে মালা হয়, তবে দু চার জায়গায় আপাং, ভৃঙ্গরাজ ইত্যাদি গাছের ব্যবহার চোখে পড়ে। প্রাচীন ও আধুনিক ভেষজ-বিজ্ঞানে দেখা যাচ্ছে বামনহাটি বা ভার্গী (Clerodendron siphonanthus) যকৃতের রোগ কমায় না ; এর শেকড় (ডাল নয়) অবশ্য জ্বর-কাশি-হাঁপানি-গলগণ্ডে উপকার দেয় ; জণ্ডিসে নয়। আপাং বা অপামার্গ (Achyranthes asperao) গাছও আমাশয়, উদরাময় কিংবা সর্দিতে কাজ দিতে পারে, জণ্ডিসে কখনোই নয়। ভৃঙ্গরাজ বা মার্কব (Eclypta alba) অবশ্য লিভারের গোলমালে ব্যবহার হয় কিন্তু ন্যাবা রোগ নিরাময়ের উল্লেখ নেই। কবিরাজি চিকিৎসায় 'পিত্ত-শীতলকারক' কুলেখাড়া, কালমেঘ, হরিতকি, হলুদ ইত্যাদির বিধান দেওয়া হয়—বামনহাটির স্থান নেই। উপরন্তু এ সব ওষুধই খাওয়াতে হয়, যাতে তারা রোগীর দেহে ঢুকে

সরাসরি ক্রিয়া করতে পারে। ধারণের কোন বিধান নেই! আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে তো নয়ই, সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও দ্রব্যের ধারণ বা স্পর্শগুণ স্বীকৃত নয়। এটি তান্ত্রিক পদ্ধতি যা পরীক্ষিত সংস্কৃত চিকিৎসাবিদ্যায় টেঁকে না।

"সুতরাং বামনহাটির মালায় ন্যাবা রোগ সারবার নয়। অথচ মালাটা বাড়ছে, কেন? তবে কি রোগ নিরাময়ের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য একটি পরীক্ষা করা হয়েছিল। ২৪ ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে একটি ন্যাবার মালাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, কোন জণ্ডিস রোগীর গলায় নয়, একটা ঢাকা টেবলের গায়ে। মালা তবু বেড়েছে আপন খেয়ালে, রোগের সান্নিধ্য ছাড়াই। অতএব ন্যাবার মালা সর্বদাই বাড়ে। বাড়ে মালা গাঁথার কৌশলে। বামনহাটির ডাল প্রথমে ছোট ছোট টুকরোয় কেটে নেওয়া হয়। তারপর এক-একটা কাঠি আড়াআড়িভাবে ধরে আঙ্গুলের দুই পাকে ফাঁস দিয়ে পরপর গা ঘেঁষে ঘেঁষে বাঁধা হয়, দ্রুত ঠাস বুনোটে মালা গাঁথা হয়ে যায়। এই ফাঁস বা গিঁট গুলোই হল বিশেষ কায়দার বাঁধন; ইংরাজি নাম শিফার্স নট (Shiffers' knot) বা সেলার্স নট (Sailor's knot)। কোন বজ্রআঁটুনি নয়, কাঠির গায়ে সুতোর বেড় দেওয়া। এমনিতে কাঠিগুলো গায়ে গা ঘেঁষে থাকে; কিন্তু যতই মালা শুকোয়, কাঠিগুলো শুকিয়ে সরু হয়, ততই সুতোর পাক ঢিলা হয়। ফলে দুই কাঠির মধ্যে ফাঁক বাড়ে। এই-ভাবে আজকের ছোট মালা কাল মস্ত বড় হয়ে দাঁড়ায়।

"যে কোন ফাঁপা ডালের কাঠি দিয়ে শিফার্স (বা সেলার্স) নট এ গাঁথা মালা সব সময়েই বাড়বে—সে সুস্থ অসুস্থ পাগল ছাগল দেয়াল টেব্‌ল যেখানেই ঝোলানো হোক না কেন। তাই বামনহাটি যকৃৎ বা পিত্তের কোন বনোষধি না হলেই বা কি, এর ডাল ফাঁপা, শুকোলে অনেকটা সরু হয়, মালা বাড়ার চমক এতে দারুন আসে। একই কারণে আপাং, অরহর ইত্যাদি গাছের ফাঁপা ডালও ন্যাবার মালায় ব্যবহার হতে পারে। একটা মালা—গলায় দিলে আপনি

বেড়ে যাচ্ছে, এই চমকপ্রদ ঘটনাকে যুক্তি বিচারের আওতার বাইরে রেখে দৈব ও অলৌকিক শক্তির খোলস চড়াতে পারলে সামাজিক প্রভাব ও ব্যবসায়িক লাভ একচেটিয়া হওয়া আদৌ কঠিন কি ?

"যাঁরা এই মালা দেন তাঁরা পারিবারিক ঐতিহ্য, স্বপ্নাদেশ সাধুর নির্দেশ বা রহস্যময় কোন কারণের কথা বলেন ; আনুষঙ্গিক নিয়মকানুনও থাকে বেশ সমীহ আদায় করার জন্য। (যার অন্যতম হল দু'দিন স্নান না করা বা বিশ্রাম করা এবং তেল ঘি না খাওয়া।) কলকাতার দর্জিপাড়ার মিত্তির বাড়ীর কথা অনেকেরই জানা। শতাধিক বছর ধরে ওখানে ন্যাবার মালা দেওয়া হয় প্রতি শনিবার। তিনচার পুরুষ আগে নাকি এই মিত্র জমিদার বাড়ীর সরকার মশাই বাংলার অম্বিকা-কালনা গ্রামে এই মালার ন্যাবা-রোগ নিরাময়ের গুণ দেখে জমিদার বাড়ীতে নিয়ে আসেন। সেই থেকেই চলছে। এখন এটা মিত্র বাড়ীর পারিবারিক ব্যবসা। বাড়ীর ছোট মেয়েটিও দ্রুত সিফার্স নটে নালা বুনতে পারে খেলাচ্ছলে। তবে এঁরা ভগবান বা অতিপ্রাকৃত শক্তির কোন ক া কিন্তু বলেন না।" ('উৎসমানুষ' পত্রিকা থেকে)।

তা হলেও, এঁদের দেওয়া বা অন্য কারোর দেওয়া এই ন্যাবার মালায় আস্থা বহু জনেরই রয়েছে। এর বাস্তব কারণ হল, কিছু সংখ্যক জণ্ডিস রোগী এই মালা পরা অবস্থায় সুস্থ হয়ে যান—ফলে বিশ্বাস বাড়ে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ন্যাবার মালার রোগনিরাময়গুণ যদি আদৌ না থাকে তবে কিছু ক্ষেত্রে রোগটি সারে কি করে ? এর উত্তরও সহজ। আগেই বলা হয়েছে, যতজনের হয় তাঁদের অনেকেই ভোগেন ভাইরাস জনিত যকৃতের প্রদাহে—যা ৭-১০ দিনের মধ্যে আপনা থেকেই সেরে যায়। এবং তা এই মালা পরলেও সারবে, না পরলেও সারবে। তবে অবশ্যই যেটি দরকার তা হ'ল বিশ্রাম ও তেল-ঘি-মাখন অর্থাৎ চর্বিজাতীয় খাবার না খাওয়া এবং সম্ভব হলে ভিটামিন-গ্লুকোজ ও প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ। যাইই হোক, ন্যাবার মালা পরে ১০ জন রোগীর

৪ জনও যদি মালার সঙ্গে সম্পর্কহীন অবস্থায় শুধু বিশ্রাম ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণে সেরে যান তবেও এর সপক্ষে প্রচার ও বিশ্বাস বহুগুণ বাড়ে। অন্যদিকে জণ্ডিস যদি পিত্তপাথুরী, ক্যান্সার বা কোন টিউমারের জন্য হয় তা যেমন মালায় সারে না, অন্য দিকে তেমনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভাইরাসজনিত যকৃতের প্রদাহও না সেরে জটিল অবস্থার দিকে চলে যায়। বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা না করে যদি মালায় আস্থা রেখে সময় নষ্ট করা হয় তবে এই ধরনের রোগীর যকৃৎ স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে চিরস্থায়ী শারীরিক অসুস্থতা, বিলিরুবিন মস্তিষ্কে গিয়ে স্থায়ী স্নায়বিক রোগ—এমনকি মৃত্যুও ডেকে আনে। বাস্তবতঃ অনেক হাসপাতালেই এ ধরনের জণ্ডিসের রোগী বহু ভর্তি হন যাঁরা ৭-১০ দিন মালা পরে সময় কাটিয়েছেন, তাতেও না কমায় ও আরো অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে এসেছেন।

জণ্ডিস হলে প্রকৃতপক্ষে দরকার এর পেছনে কারণটি জানা অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মতভাবে রোগ নির্ণয়। অনেকে এধরনেরও ধারণা করেন, হলুদ রঙটি যেভাবে হোক শরীর থেকে বের করে দিতে পারলে জণ্ডিস সেরে যাবে। আর এই কারণেই আমগাছের রস হাতে মেখে চুন জল দিয়ে ধোওয়ার মত টোটকা চালু রয়েছে। আমগাছের রসের সাথে চুন জল মিশে টকটকে হলুদ রঙের পদার্থ তৈরী হয়। এর সাথে জণ্ডিসের বিলিরুবিনের কোন সম্পর্ক নেই এবং রক্তে মিশে থাকা বিলিরুবিন এভাবে বেরোয়ও না। একইভাবে জণ্ডিসের চিকিৎসার জন্য বলা হলেও অথর্ববেদ বর্ণিত সূর্যমন্ত্রের সাহায্যেও জণ্ডিস আদৌ সারে না (১ম খণ্ড ; ৫ম অনুবাক ; ১ম সুক্ত); অবশ্য মন্ত্র আউড়াতে আউড়াতে ৭—১০ দিন কেটে গেলে ভাইরাস জনিত জণ্ডিস (কামলা রোগ) আপনিই সেরে গিয়ে বেদ-মাহাত্ম্য বাড়াতে পারে।

বেড়াল থেকে ডিফ্‌থেরিয়া

বেড়ালের এঁটো খেলে বা বেড়াল নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে

ডিফ্‌থেরিয়া হয়—এটি একটি অতি সাধারণ পারিবারিক স্বাস্থ্যবিধি। জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত কুকুরের কামড় থেকে জলাতঙ্ক যেমন হয়, বেড়াল থেকে কিন্তু ঐভাবে ডিফ্‌থেরিয়া হয় না। এবং সত্যি কথা বলতে কি বেড়াল ও ডিফ্‌থেরিয়ার এই সম্পর্ক সম্পর্কিত ধারণাটাই ভুল, কারণ বেড়ালের ডিফ্‌থেরিয়া হয় না।

ডিফ্‌থেরিয়া হয় কোরিনিব্যাক্‌টেরিয়াম ডিফ্‌থেরি (Corynebacterium diphtheriae) নামক জীবাণু থেকে। ৬ মাস বয়সের নীচে বা মধ্যবয়সের পরে সাধারণতঃ এর আক্রমণ ঘটে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গলায় টনশিলের আশে পাশের অঞ্চলে এই জীবাণু বাসা বাঁধে; এ ছাড়া নাকে, ল্যারিংক্‌সে ও দুর্লভ ক্ষেত্রে চামড়া, যোনিদেশ ইত্যাদিতেও এর আক্রমণ ঘটে। জীবাণুটি বংশবৃদ্ধি করার সময় এক ধরনের বিযাক্ত রাসায়নিক পদার্থের (exotoxin) সৃষ্টি করে যা রোগীর পক্ষে মারাত্মক। জ্বর, দুর্বলতা ইত্যাদির সাথে সাথে বিভিন্ন স্নায়ু আক্রান্ত হয়। এমন কি হৃদপিণ্ডও আক্রান্ত হতে পারে ও রোগীর মৃত্যু ঘটে। বাচ্চাকে নিয়মমত (৩য়, ৪র্থ, ৫ম মাসে, পরে দেড় বছর ও ৫-৬ বছর বয়সে) ট্রিপল এন্টিজেন টীকা দেওয়ার মাধ্যমে রোগটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয় (ট্রিপল এন্টিজেনের সাহায্যে টিটেনাস, ডিফ্‌থেরিয়া ও হুপিংকাশির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরী করা যায়)। সম্পূর্ণ বিশ্রামের সঙ্গে পেনিসিলিন ও ডিফ্‌থেরিয়া এ্যান্টিটক্সিনের সাহায্যে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করলে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রোগের সংক্রমণ বন্ধ করা। মুখ বা নাক থেকে বিন্দু বিন্দু আকারে নির্গত জলীয় পদার্থে অজস্র জীবাণু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সুস্থ ব্যক্তিকে—সাধারণতঃ অল্পবয়স্ক শিশুকে—আক্রমণ করে। তাই আক্রান্ত ব্যক্তিই ডিফ্‌থেরিয়া সংক্রমণে প্রধান ভূমিকা নেয় এবং অন্যদের থেকে তাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা, তার ব্যবহৃত জিনিষপত্রকে আলাদা করা

ও ফুটিয়ে নেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রোগীর ব্যবহৃত থালা-কাপ-ডিশ ইত্যাদির মাধ্যমেও রোগ ছড়াতে পারে। কিন্তু বেড়ালের কামড় থেকে বা বেড়াল থেকে রোগটি ছড়ায় না।

তবু বেড়াল-এর সাথে এর সম্পর্ক টানার পেছনে একটিই যুক্তি-সঙ্গত দিক আছে, তা হল বেড়াল একটি অতি সাধারণ গৃহপালিত জন্তু। প্রায় সব বাড়ীতেই বেড়াল থাকে—হয় পোষা বা খাওয়ার লোভে ভ্রাম্যমান অতিথি হিসেবে। বাচ্চাদের কাছে বেড়াল—বিশেষ করে বেড়ালছানা, খুবই প্রিয় ও খেলনার মত। বেড়াল একবাড়ি থেকে আরেক বাড়ীতে অনায়াসে যাতায়াত করে এবং বাড়ীর রান্নাঘর থেকে শোবার ঘর সর্বত্রই অনায়াসে ঘুরে বেড়ায়। তাই কোন বাড়ীর কোন বাচ্চা ডিফ্‌থেরিয়ায় আক্রান্ত হলে বেড়ালের মাধ্যমে তার লোমে লেগে বা অন্যভাবে এটি বাড়ীর অন্যত্র বা অন্য বাড়ীতে ছড়াতে পারে—রোগীর মুখ বা নাক থেকে বেরুন জীবাণু তার সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ার ফলে। এই বেড়ালকে যখন বাড়ীর অন্য কোন লোক বা অন্য বাড়ীর কোন লোক ঘাঁটাঘাঁটি করে তখন সেও ডিফ্‌থেরিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে—রোগীর সংস্পর্শে না এসেই। তবে এ ব্যাপারটিও খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে এবং এইভাবে ডিফ্‌থেরিয়া রোগ ছড়ানর ব্যাপারটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবু বেড়ালের অবারিত গতিই তাকে রোগীর ব্যবহৃত থালা-বাটি-জামা-কাপড়ের মত ডিফথেরিয়া সংক্রমণের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে তৈরী করে দিতে পারে। এদিক থেকে বেড়ালের বদলে খরগোস, কুকুরছানা ইত্যাদিও বেড়ালের মত একই ভূমিকা রাখতে পারে। আসল কথা হলো, কোন ভাবেই ডিফ্‌থেরিয়া রোগী থেকে যাতে জীবাণু সংক্রমণ না ঘটে তা দেখা। কিন্তু আক্রান্ত কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক হওয়ার সঠিক সম্ভাবনার মত, বেড়াল কামড়ালেই বা বেড়াল ঘাঁটলেই ডিফ্‌থেরিয়া হবে—এ ধারণার পেছনে কোন যুক্তি নেই, কারণ কুকুর জলাতঙ্কে আক্রান্ত হতে পারে ও তার কামড়ের ফলে রোগটির ভাইরাস মানুষের শরীরে

ঢুকতে পারে ; কিন্তু বেড়ালের ডিফ্‌থেরিয়া হয় না বা ডিফ্‌থেরিয়া রোগীর সংস্পর্শে না এলে বেড়ালের গায়ে ডিফ্‌থেরিয়া জীবাণু থাকারও সম্ভাবনা নেই। বেড়াল কামড়ালে অন্য সুস্থ জন্তুর কামড়ের মতই ফলাফল হতে পারে, তাকে ঘাঁটলে—তার লোম থেকে এ্যালার্জি হতে পারে—কিন্তু ডিফ্‌থেরিয়া নয়। শুধু খেয়াল রাখা দরকার বেড়ালটি কোন ডিফ্‌থেরিয়া রোগীর নিকট সংস্পর্শ থেকে আসছে কিনা এবং এ খেয়াল শুধু বেড়াল নয়, অন্য যে কোন প্রাণী (যেমন কুকুরছানা) বা আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে, অ-প্রাণী (যেমন রোগীর ব্যবহৃত থালা)-র দিকেও রাখা দরকার।

গরু-ছাগল ও যক্ষ্মা

গরু থেকে যক্ষ্মা হতে পারে—এ ধরনের একটি ধারণা চালু আছে। আবার ছাগলের দুধ যক্ষ্মা সারাতে পারে—এটিও বেশ চালু। অনেক জায়গায় যক্ষ্মারোগীর ঘরে ছাগল বেঁধে রাখার রেওয়াজও দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় গরুর ব্যাপারটি সত্যি আর ছাগলের ব্যাপারটি মিথ্যে।

যক্ষ্মা (tuberculosis বা সংক্ষেপে **T. B.**) হয় মাইকোব্যাক্‌টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস (Mycobacterium tuberulcosis) নামক একটি জীবাণুর আক্রমণে। সাধারণতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে এটি ঢোকে এবং ফুসফুসকে আক্রমণ করে। এখান থেকে রক্তের মাধ্যমে বৃক্ক (kidney), হাড়, এমননি মস্তিষ্কের আবরণী (meninges)-তেও ছাড়াতে পারে। লসিকানালী (lymph channel)-এর মাধ্যমেও এটি শরীরের অন্যত্র ছড়ায়। যক্ষ্মা জীবাণু সাধারণত তিন ধরনের হয়—human type (যা শুধুমাত্র মানুষের শরীরে থাকে), bovine type (যা গরু-মহিষের শরীরে থাকে) এবং anonymous type. গরু-মহিষের শরীরে যে ধরনের জীবাণু থাকে তা তাদের দুধের মাধ্যমে বেরোয় এবং ঐ দুধ খেলে, মানুষের পেটের মধ্যে যক্ষ্মা-জীবাণু ঢোকে ও অন্ত্র আক্রান্ত হয়,

সেখান থেকে অন্যত্রও ছড়ায়। এইভাবে গরু থেকে দুধের মাধ্যমে যক্ষ্মার সংক্রমণ ঘটতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রেও দুধকে ফুটিয়ে নিলেই এই জীবাণু সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। অপুষ্টির কারণে (বিশেষতঃ প্রোটিন ও ভিটামিনের অভাবে) বা অন্য কোনভাবে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করলে যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই উপযুক্ত পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত (pasteurised) দুধ সরবরাহ করা ও উন্নততর জীবন-যাত্রার ফলে উন্নত দেশগুলিতে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ অনেক কমে গেছে। এছাড়া প্রতিটি বাচ্চাকে যক্ষ্মাপ্রতিরোধী টীকা (Bacille Calmette Guerin বা B C G) দিয়ে রোগটিকে দূর করা সম্ভব।

ছাগল-এর শরীরে যক্ষ্মা প্রতিরোধী স্বাভাবিক কিছু ক্ষমতা আছে বলে জানা গেছে। এটি জানার পরই ধারণা করা হয়েছে ছাগলের দুধ খেলে যক্ষ্মা সেরে যাবে বা হবে না ; এমকি ঘরের মধ্যে ছাগল বেঁধে রাখলেও নাকি যক্ষ্মারোগটিকে দূরে রাখা যাবে। প্রকৃতপক্ষে ছাগলের দুধে B C G-এর মত কোন যক্ষ্মাবিরোধী পদার্থ বেরোয় বলে এখনো প্রমাণিত হয় নি। আর যদি বেরোতও, তবে তা গরম করার ফলেই নষ্ট হয়ে যাবে। (তাই বলে, না ফুটিয়ে ছাগলের দুধও খাওয়াটা ঠিক নয়।) ছাগলের শরীর থেকেও এমন কিছু বেরোয় না, যা যক্ষ্মাজীবাণুকে মারতে পারে। B C G টীকা শরীরের ভেতরে গ্রহণ করলে রক্তের মধ্যে আক্রমণকারী যক্ষ্মাজীবাণুকে মেরে ফেলার মত পদার্থের সৃষ্টি হয়। স্ট্রেপটোমাইসিন (১৯৪৪ সালে আবিষ্কৃত), প্যারাআমাইনো স্যালিসিলিক এ্যাসিড (PAS ; ১৯৪৬ আবিষ্কৃত), আইসোনিকোটিনিক অ্যাসিড হাইড্রাজাইড (INH ; ১৯৫২ সালে আবিষ্কৃত) ইত্যাদি ওষুধও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় যক্ষ্মাজীবাণুকে মারতে পারে। তাই যক্ষ্মা হলে এই সব ওষুধ প্রয়োগ করার সাথে সাথে উপযুক্ত খাবার দাবার ও উপযুক্ত পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু ঘরে ছাগল বেঁধে রোগটিকে সারান সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা

দরকার যে, অনেকের ধারণা ছাগলের আদৌ যক্ষ্মা হয়ই না। এটি কিন্তু ঠিক নয়। যদিও খুব কম তবু ভেড়া ও ছাগলেরও যক্ষ্মা হওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায়। যক্ষ্মারোগে সাধারণত ভেড়ার ফুসফুস আক্রান্ত হয় এবং ছাগলের ক্ষেত্রে আক্রান্ত হয় তাদের অন্ত্র (intestines)। এর ফলে ছাগলের পেটের লসিকাগ্রন্থি (mesenteric lymph nodes)-এর বৃদ্ধি ও ক্ষত ঘটে। ভেড়া ও ছাগলের শরীরে যক্ষ্মা জীবাণুর human type-এর প্রতি সম্পূর্ণ প্রতিরোধী ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু এরা bovine ও avian type-এর যক্ষ্মা জীবাণুতে আক্রান্ত হতে পারে। এগুলি, বিশেষতঃ bovine type টি, মানুষরও যক্ষ্মা রোগ ঘটায় এবং যদিও অত্যন্ত কম তবু ছাগলের দুধের মাধ্যমে মানুষের শরীরে যেতে পারে। ছাগলের দুধের বাঁটেও যক্ষ্মা (mastitis tuberculosa contagiosa) হতে পারে। তবে এ দুধ ফোটালেই এই জীবাণু মারা পড়ে। ভেড়া বা ছাগলের যক্ষ্মারোগ কম হওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ অনুমান করা হয়, যেমন তাদের অতি অল্প বয়সে মেরে ফেলা, তারা যে সব গাছপালা খায় তার মধ্যে ওষধিগুণসম্পন্ন কিছু পদার্থ থাকা ইত্যাদি। এছাড়া পৃথিবীর সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে গৃহপালিত ছাগলের রক্ত উষ্ণতম (গড় তাপমাত্রা প্রায় ১০৪°F)। এটি তাদের যক্ষ্মারোগ কম হওয়ার পেছনে কিছু ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য তাদের কখনোই যক্ষ্মা হয় না বা যক্ষ্মা প্রতিরোধে বা সারানোর ক্ষেত্রে ছাগলের ভূমিকা রয়েছে —এটি ভুল।

রোগচিকিৎসায় গ্রহরত্ন ও রঙ

রত্নব্যবসায়ী ও জ্যোতিষীদের একটি বড় দাবী যে, মানুষের শরীরে নানাবিধ রোগ দেখা দেয় বিভিন্ন গ্রহের প্রভাবে। এ ব্যাপারে আবার বিশেষজ্ঞও রয়েছে—এরা রত্ন-চিকিৎসক (gem therapist)। বিভিন্ন কুপিত গ্রহকে শান্ত করার জন্য এরা

নানা ধরনের রত্ন ধারণের পরামর্শ দেয়। যেমন মৃগীতে নীলা, অর্শরোগে পলা ইত্যাদি। একই ভাবে চুনী, গোমেদ, চন্দ্রকান্ত মণি, সূর্যকান্ত মণি ইত্যাদিরও বিধান দেওয়া হয়।

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের নিদান নেহাৎই কিছু ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে টিকিয়ে রাখা হয়। রোগযন্ত্রণায় কাতর সাধারণ মানুষ আধুনিক চিকিৎসার সুযোগে বঞ্চিত হয়ে বা দুরারোগ্য রোগে ভুগে অন্ধ মিথ্যে বিশ্বাসে মরীয়াভাবে এ সবে বিশ্বাস করে এবং চক্রবৃদ্ধিহারে ব্যাপারটি বাড়তে থাকে।

রোগের ক্ষেত্রে গ্রহের প্রভাবের ব্যাপারটি জ্যোতিষবিদ্যার মিথ্যে ধারণা থেকে মূলতঃ সৃষ্টি। জ্যোতিষ বিদ্যার গ্রহসম্পর্কিত এই সব ধারণা যে কিভাবে ভ্রান্ত তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অস্তিত্বহীন রাহু-কেতুর কল্পনা, সূর্যের অন্যান্য গ্রহ (ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো) সম্পর্কে অনুল্লেখ এবং সর্বোপরি কয়েক লক্ষ মাইল দূরবর্তী গ্রহের শারীরিক প্রভাব ফেলার বা ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার মত হাস্যকর ব্যাপারগুলি এর সাথে যুক্ত। স্পষ্টতঃ এই হাস্যকর ধারণাবলীর উপর ভিত্তি করে, রবি গ্রহের ঘাটতি হলে হৃদরোগ হয় অতএব তারজন্য নীলা ধারণ করা বা মঙ্গলগ্রহের জন্য প্রবাল রত্ন ধারণ করার মত বিধান যে ভ্রান্ত হবে তা বলাবাহুল্য।

অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কিত মূল্যবান গ্রন্থ, সুশ্রুত সংহিতায় নব গ্রহের উল্লেখ থেকেও এ ধরনের ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। সুশ্রুত, চরক ইত্যাদির সংহিতায় যুগোপযোগী কিছু কিছু অসম্পূর্ণ ও সংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে রোগারোগ্যের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ছিল। শিশুদের বিভিন্ন রোগে যে নবগ্রহের প্রভাবের কথা সুশ্রুত সংহিতায় রয়েছে তা আসলে বিভিন্ন প্রতীকী ধারণা এবং রবি-সোম-মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পতি-শুক্র-শনি-রাহু-কেতু—এই নয়টি 'গ্রহের' কথা সুশ্রুতে আদৌ বলা হয় নি। বলা হয়েছে স্কন্দগ্রহের কথা যার প্রভাবে শিশুর জ্বর হয়ে খিঁচুনি হয় এবং শিশু পঙ্গু হয়ে যেতে পারে যা

আধুনিক কালে meningitis, encephalitis হিসেবে বর্ণনা করা হয়। শকুনীগ্রহের প্রভাবে জলবসন্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, পুতনাগ্রহের জন্য পাৎলা পায়খানা, অন্ধপুতনাগ্রহের জন্য হাম, শীতপুতনাগ্রহের জন্য কলেরা ইত্যাদি। এবং এই ধরনের কোন রোগকেই গ্রহরত্নের সঙ্গে যুক্ত করা হয় নি, বরং বিভিন্ন গাছগাছড়া, নিয়মকানুন ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদির দ্বারা চিকিৎসা করা হত, যেগুলি অনেক খানিই ছিল কার্যকরী। আর এই প্রাচীন ধারাকে অবলম্বন করেই গ্রহশান্তির ব্যাপারটা বিকৃত হয়ে নানারূপ ধারণ করেছে। একদিকে গ্রহশান্তির জন্য বিক্রি হচ্ছে লতা-পাতা-শেকড়, যার অনেকগুলি বহুদিনের বিবর্তনে ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার অভাবে অনেকাংশে নির্ভরযোগ্যতা হারিয়েছে; অন্যদিকে সৃষ্টি হয়েছে রত্নবিত্থার।

এই রত্নবিত্থায় রোগসৃষ্টির মূলে রঙের ভূমিকা আছে বলেও বলা হয়। এই অপবৈজ্ঞানিক ধারণায় বলা হয় রামধনুর সাতটি রঙ হচ্ছে মহাজাগতিক সাতটি রঙ—যা মানুষের 'সাতটি স্নায়ুচক্র' সহ পৃথিবীর সবকিছুর উপর প্রভাব ফেলে। যখন মানুষ এই সব রঙের কোন-কোনটি শোষণ বা গ্রহণ করতে পারে না তখন ঐ-রঙের অভাবে বিভিন্ন রোগ হয়; তাই ঐ রঙ দিতে পারে এমন রত্ন ধারণ করতে হয়। যেমন মৃগীর কারণ হিসেবে বলা হয় নীল রঙের অভাব, যার জন্য নীলা পরতে হবে অথবা অর্শের কারণ হলুদ রঙের অভাব যার জন্য পলা পরতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে কোন রোগই মহাকাশের কোন গ্রহের প্রভাবে বা কোন 'রঙের অভাবে' ঘটে না। যেমন মৃগী রোগের কারণ অনেকে কিছুই হতে পারে। বংশগত প্রভাব, মস্তিষ্কে আঘাত, ছোট বেলায় মস্তিষ্কের প্রদাহ, টিউমার ইত্যাদি নানা কারণে এটি ঘটে। এর সঙ্গে নীল রঙের কোন সম্পর্ক নেই। একইভাবে অর্শে নানা ভাবে মলাশয়ের শিরায় রক্তসঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তার স্ফীতি ঘটে। এর সৃষ্টি যকৃতের রোগ থেকে, কোষ্ঠবদ্ধতা, স্থানীয় কিছু বিশেষ

অবস্থা ইত্যাদি কারণে হতে পারে, কিন্তু হলুদ রঙের অভাবে আদৌ নয়। একইভাবে রবিগ্রহের প্রভাবে ঘাটতি থাকার জন্য হৃদরোগ বা পেটের রোগের পেছনে মঙ্গলগ্রহের কোন প্রভাবের ব্যাপার নেই। শরীরে নিরন্তর ঘটে চলা অসংখ্য বিচিত্র ও জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার, সুনির্দিষ্ট কারণপ্রসূত তারতম্যের ফলেই এ সব রোগ ঘটে, এবং এর অনেক কিছুই এখন বিজ্ঞান-সম্মত পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে, কিন্তু এসবের পেছনে কোন রঙ বা গ্রহের ব্যাপার জানা নেই। আসলে সূর্যের আলো সাতটি রঙের সমষ্টি এবং আকাশের জলকণায় প্রতিসৃত (refracted) হলে এই সাতটি রঙ আলাদা হয়ে রামধনুর সৃষ্টি করে। এই সাতটি রঙ হল—বেগুনী, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল।

তবে কিছু কিছু রোগে রঙের কিছু উপযোগিতা থাকে। যেমন চোখের রোগের জন্য সবুজ রঙের কার্যকারিতা আছে বলে জানা গেছে, যা ঘটে সবুজ রঙের আলোক রশ্মির বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কারণে। এই ধরনের বিজ্ঞান সম্মত অন্যান্য গবেষণা করা প্রয়োজন, কিন্তু তা হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের জন্য —অপবৈজ্ঞানিক ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়।

আর রত্ন ধারণ করে রোগারোগ্যের বিধানটিও হাস্যকর। ঐসব তথাকথিত গ্রহরত্ন আসলে কিছু কিছু খনিজ বা সমুদ্রজ রাসায়নিক পদার্থ। যেমন নীলা আসলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, পলা বা প্রবাল হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট, গোমেদ হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম-ক্যালসিয়াম-ম্যাঙ্গানিজ-লোহা-ক্রোমিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম-সিলিকন ইত্যাদি বিভিন্ন ধাতুর যৌগিক পদার্থ যাদের পরিমাণের বিভিন্ন তারতম্যে নানা রঙের সৃষ্টি হয়, পোখরাজ হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট, সূর্যকান্তমণি পটাসিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ইত্যাদি। এই সব ধাতু বা রাসায়নিক পদার্থগুলি জ্যোতিষবিদ্যা বা গ্রহরত্নবিদ্যায় নির্দেশিত কোন রোগেই কাজ করে বলে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে জানা যায় নি। যেমন হৃদরোগের চিকিৎসায় নীলা

বা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সত্যিকারের কোন কার্যকারিতা নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা যেভাবে এগুলিকে আংটি করে বিভিন্ন আঙ্গুলে ধারণের কথা বলা হয়, ঐভাবে এগুলি শরীরের কোন কাজেই লাগে না—অন্ধবিশ্বাসী ব্যক্তিকে কিছু মানসিক সাহস দেওয়া এবং জ্যোতিষ ও রত্ন-ব্যবসায়ীকে কিছু অর্থ পাইয়ে দেওয়া ছাড়া।

অনেকে আবার এই সব তথাকথিত গ্রহরত্নের অত্যদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দেয় আরো অদ্ভুত একটি পরীক্ষার দ্বারা। মসৃণ কোন রত্নের গায়ে শক্ত করে রুমাল বা ন্যাকড়া জড়িয়ে তাতে আগুন লাগান হয়—কিন্তু দেখা গেল এতে কাপড়টি পুড়লো না। বলা হয় গ্রহরত্ন আগুনের তাপ শোষণ করে নিচ্ছে। আর যে গ্রহরত্ন সর্বভুক আগুনের তাপ পর্যন্ত শুষে নিচ্ছে, তা যে মহাজাগতিক বিভিন্ন রশ্মি ও শক্তিকে শোষণ করে শরীরের রোগ সারাবে এতে আর বিচিত্র কি! ব্যাপারটি আসলে একটি ধোঁকা। গ্রহরত্ন বলে নয়—কাঁচের গুলি বা মার্বেলের মত যে কোন মসৃণ পদার্থের উপরই এইভাবে কোন কাপড়ের টুকরো টানটান করে বেঁধে আগুন লাগালে দেখা যাবে কাপড়ের টুকরোটি পুড়বে না। এটি আসলে ঘটে,—মসৃণ গায়ে লেপটে থাকা কাপড়ের টুকরোটি, বিপরীত প্রান্ত থেকে অক্সিজেন তথা বাতাসের যোগান না পাওয়ার জন্য, যা যে কোন পদার্থের দহনের জন্যই একান্ত প্রয়োজন। এই পরীক্ষার ফলে মার্বেল বা কাঁচের গুলির মত গ্রহরত্নেরও কোন অত্যদ্ভূত ক্ষমতার পরিচয় প্রমাণিত হয় না।

কেউ কেউ দাবী করেন যে গ্রহরত্ন ধারণ করে অনেকের নানা রোগ সেরেছে। আসলে ব্যাপারটি ঘটে খুবই বিরল ক্ষেত্রে এবং অতি সামান্য সংখ্যক এই সাফল্যের উদাহরণই সরলবিশ্বাসী, রোগ-যন্ত্রণায় কাতর মানুষকে মরীয়া করে তোলে গ্রহরত্ন ব্যবহারে। ছ'একটি ক্ষেত্রে যদি সত্যিই রোগটি সারে তবে তার জন্য অবশ্যই গবেষণার প্রয়োজন। তবে বাস্তবতঃ যা ঘটা সম্ভব বা ঘটে তা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানসিক আস্থা ও সাহস অর্জন। হাঁপানি থেকে পেটের

নানা রোগে এবং বহু ধরনের দীর্ঘস্থায়ী রোগের ক্ষেত্রে রোগীর মানসিক অবস্থা যে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে তা প্রমাণিত। মন বা মানসিক অবস্থা যেহেতু স্নায়ুনির্ভর এবং স্নায়ুতন্ত্রই যেহেতু শরীরের নানা অংশের স্বাভাবিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই মানসিক অবস্থা শারীরিক নানা ঘটনাকে প্রভাবিত করবে এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। এই কারণে গ্রহরত্নে অন্ধবিশ্বাসী ও গভীর আস্থাশীল ব্যক্তি বিশেষ কোন রোগের জন্য তাঁর বিশ্বস্ত কোন জ্যোতিষী বা গ্রহরত্ন চিকিৎসকের পরামর্শে কোন রত্ন ধারণ করলে যে মানসিক সাহস পান সেটি তাঁর রোগ নিরাময়ে সাহায্য করতে পারে। অন্য দিকে জ্যোতিষ বা রত্ন চিকিৎসকের দেওয়া স্তোকবাক্য সম্মোহনের জন্য কার্যকরী স্তোক বা প্রস্তাব (suggestion)-এর মত কাজ করে এবং এটিরও সুনির্দিষ্ট প্রভাব রয়েছে। এইভাবে শুধু গ্রহরত্ন নয়, নানা সাধু, বাবাজি, তান্ত্রিক ইত্যাদিও মিথ্যে আশা দিয়ে রোগের চিকিৎসা করে থাকেন।

বাস্তবতঃ, রোগচিকিৎসায় গ্রহরত্নের কোন ভূমিকা নেই। মিথ্যা মোহে এই অপবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগটি জটিলতর হয় বা অপরিবর্তিত থাকে।

বাতব্যথায় তামার বালা ও বিদ্যুৎ

অবশ্যি শুধু বাতব্যথাতেই নয়, হাঁপানি থেকে অর্শ, নানা রোগের রোগীই রোগারোগ্যের আশায় তামা, লোহা বা দস্তার বালা, আংটি ইত্যাদি ধারণ করেন। সাধারণতঃ শুভানুধ্যায়ী 'অতি অভিজ্ঞ' কোন বন্ধু বা কখনো কোন হাতুড়ের পরামর্শে এসব ধারণ করা হয়। এর সঙ্গে আরেকটি ব্যাপার যুক্ত করা হয়, তা হল বিদ্যুৎ (electricity)। যেমন, বালা তৈরী করা হয়, উচ্চবিভবের বিদ্যুৎ পরিবাহী তামার তার থেকে। এই তার আবার মাটিতে না ঠেকিয়ে (অর্থাৎ earth না করে) নিতে হবে! এই সংস্কারটি অতি প্রাচীন আদৌ নয়—যদিও রত্ন বা মাদুলি ধারণের বিশ্বাসের ধারাবাহিকতায়

এর সৃষ্টি। বিদ্যুৎ শক্তির আবিষ্কার ও তাকে ঘিরে নানা বৈজ্ঞানিক ধারণার অপবৈজ্ঞানিক বিকৃতি থেকে এ ধরনের নানা বিশ্বাস চালু হয়েছে।

বাতব্যথা, হাঁপানি, অর্শ বা অন্য কিছু রোগে তামা, লোহা, দস্তা ইত্যাদি ধারণের কোন উপযোগিতা নেই। বালা বা আংটি করে পরলে এই সব ধাতুর অণু চামড়া দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে ও হোমিওপ্যাথির নীতিতে রোগ সারাতে পারে—এ ধরনের একটি ব্যাখ্যা অনেকে দেওয়ার চেষ্টা করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি কয়েকশ' বছর চালু রয়েছে এবং বর্তমানে মানুষ অণু-পরমাণু সংক্রান্ত বহু সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত তথ্য জানতে পেরেছে। তা সত্ত্বেও এখনো অব্দি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপারটি পরিষ্কার ভাবে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না; তবু কিছু কিছু রোগে এর কার্যকারিতার কথা বহুল প্রচারিত। হোমিওপ্যাথির ওষুধ অতি সূক্ষ্ম, সামান্য পরিমাণে রোগারোগ্যের কাজ করে বলা হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতেও উপরোক্ত এই সব ধাতুর ব্যবহার সংশ্লিষ্ট রোগে করা হয় না। যেমন হোমিওপ্যাথিতে কিউপ্রাম মেটালিকাম নামে ওষুধটি আসলে তামা থেকে তৈরী; পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ, প্যারালিসিস ইত্যাদিতে এর ব্যবহারের উল্লেখ আছে কিন্তু বাতের ব্যথায় নয়। একই ভাবে দস্তা ধাতু থেকে তৈরী জিংকাম মেটালিকামও চামড়ার রোগ, মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু রোগে ব্যবহৃত হয়—কিন্তু বাত-সায়াটিকা-স্পণ্ডাইলোসিসে নয়।

দু'একটি রোগী বালা পরার সময় কিছু উপশম পান বলে বলেন। এটির ক্ষেত্রেও রোগের নিজস্ব গতিপ্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক কিছু সাবধানতা অবলম্বনের জন্যই ব্যাপারটি ঘটে। এর সাথে রোগীর মানসিক আস্থার ফলে, 'মনে হচ্ছে ব্যথা একটু কম' জাতীয় ব্যাপার জড়িত থাকে।

আর তামার তার earth না করে পরার ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি

এর ভেতর থাকে ও রোগ উপশম করে—এ ধারণাটি আরো হাস্যকর। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে বহু অত্যাশ্চর্য কাজ করা যায় এবং এটি অত্যন্ত শক্তিশালী—এ ধরনের ব্যাপার থেকে বিদ্যুতের সাথে সম্পর্ক-যুক্ত যে কোন কিছুই সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটাতে পারে—এ ধরনের বিশ্বাস মনের মধ্যে গেড়ে বসে। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্যে দুই তড়িৎ মেরুর সংযোগকারী অবিচ্ছিন্ন বর্ত্মনী (circuit) ও বিভব পার্থক্য (potential difference) থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় বিদ্যুৎ পরিবাহী কোন কিছুর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে না। আর কিছুক্ষণ বা কিছুদিন ধরে তামার তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এর মধ্যে এমন কিছু পরিবর্তনও ঘটে না, যেটি শরীরকে কোন অতিরিক্ত শক্তির জোগান দিতে পারে বা বাত সারাতে পারে। Earth না হওয়ার আগে তার সংগ্রহের ব্যাপারটিও হাস্যকর। মাটিতে না ঠেকিয়ে শরীরে লাগালেও তারটি earth হয়েই যায়, কারণ আমাদের শরীর বিদ্যুতের সুপরিবাহী এবং শরীরটি থাকে মাটিরই ওপর। অনেকে আবার 'ব্যাটারির তেল' বাতব্যথায় মালিশ করে উপকার পাওয়ার চেষ্টা করেন এবং কেউ কেউ উপকৃত হনও। এক্ষেত্রে মালিশ করা, ব্যাটারির মধ্যস্থ পাৎলা অ্যাসিডের দ্বারা চামড়ার মৃদু প্রদাহ সৃষ্টি ইত্যাদিই কাজ করে, কিন্তু তথাকথিত ব্যাটারির তেলে যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে না, তেমনি এই কারণেও এটি কোন উপকার করে না।

সর্পদংশনে পাথর বসান ইত্যাদি

মনসা বা মহাদেবের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপড়ার সাথে সাথে হাত চালার সাহায্যে সাপের বিষ 'নামানোর' ভ্রান্ত পদ্ধতির কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও এর জন্য আরো নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যেমন সাপের কামড়ের জায়গায় বিশেষ ক্ষমতাযুক্ত একটি পাথর ওঝা বা গুণিনরা বসায়। পাথরটি এই ক্ষত

দিয়ে নাকি বিষ শুষে নেয়, যতক্ষণ শরীরে বিষ থাকে ততক্ষণ এটি আটকে থাকে—তারপর, সব বিষ শুষে নেওয়ার পর পাথরটি আপনা থেকে খসে পড়ে। অনেকে আবার এই পাথরকে দুধে ফেলে দেখায় দুধ আস্তে আস্তে নীল হয়ে গেল—অর্থাৎ পাথরটির শুষে নেওয়া বিষ দুধে বেরিয়ে এল; আর যে বিষ খেয়ে মহাদেব হয়েছেন নীলকণ্ঠ সেই বিষের রঙ যে নীল তা কে না জানে! অনেক ওঝা আবার পাথরের বদলে মন্ত্রপূত থালা বা বাটি, শিকড় ইত্যাদি ব্যবহার করে। কোথাও আবার একই সঙ্গে রোগীকে পাশে রেখে মা মনসার পূজোও চলে। সর্পদংশনের চিকিৎসার আরেকটি পদ্ধতি হল রোগীর মাথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা জল ঢালা। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে এইভাবে এক সাপে কাটা রোগীর 'সফল' চিকিৎসার কথা বেরিয়েছিল।

উপরোক্ত কোন পদ্ধতিই সর্পদংশনের সঠিক চিকিৎসা নয়। কামড়ানোর সময় বিষাক্ত সাপ তার বিষ উপযুক্ত পরিমাণে শরীরের ভেতর ঢেলে দিতে পারলে রোগীর অবস্থা আশংকাজনক হয়। এই বিষ অতি দ্রুত রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। শংখচূড় (king cobra), কেউটে, গোখরো (Common cobra), ইত্যাদির বিষ মূলতঃ স্নায়ুতন্ত্রকে দ্রুত আক্রান্ত করে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাংসপেশীসহ অন্যান্য মাংসপেশীর প্যারালিসিস ঘটিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু ডেকে আনে। অন্য দিকে চন্দ্রবোড়া (Russel's viper), গেছো বোড়া (pit viper) ইত্যাদির বিষ রক্তের উপর কাজ করে—রক্তের লোহিত কণিকা ভেঙ্গে যায়, চামড়ার নীচে ও চামড়া ফেটে, চোখ-মুখ-নাক দিয়ে রক্তপাত হয়, প্রস্রাবে রক্ত পড়ে বা প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং বেশ কিছুক্ষণ পরে (এমনকি দু'এক সপ্তাহ পরে) রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

সাপের বিষ প্রোটিন জাতীয় একটি পদার্থ। যেহেতু এই বিষ রক্তের সাথে মিশে যায় তাই কোন পাথর, বাটি, থালা বা শিকড়

দিয়ে এই বিষকে নামান বা টেনে নেওয়া সম্ভব নয়। যদি রোগীর শরীরের বেশীর ভাগ অংশ রক্তকে একই গ্রুপের নির্বিষ রক্তের সাথে পাল্টাপাল্টি করা যায় তাহলেই একমাত্র শরীরে মিশে যাওয়া বিষকে শরীর থেকে দূর করা যায়। এছাড়া এ্যান্টিভেনম সেরাম (AVS) যথেষ্ট পরিমাণে শরীরে ইনজেকশান করলে এটি বিষের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাকে নিষ্ক্রিয় করে তুলতে পারে। কিন্তু মন্ত্র পড়ে হাতচালার মত, পাথর বা অন্য কোনভাবেই এ বিষ কাটান যায় না। তাই বিষাক্ত সাপের বিষ নামানর জন্য ওঝার পাথর বসান ইত্যাদি পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া একটি অতি বিপজ্জনক সংস্কার।

সাপের বিষ হলুদাভ ও থক্‌থকে, এর রঙও আদৌ নীল নয়। তাই বিষ শুষে নেওয়া পাথর দুধে দিলে দুধ নীল হওয়াটা কখনোই বিষের জন্য ঘটবে না। যদি আদৌ এটি হয়, তবে তার পেছনে থাকে কিছু কারসাজি—যেমন পাথরের উপর সুকৌশলে নীলরঙ মাখান বা দুধের বাটিতে কায়দা করে নীল কালির বড়ি দেওয়া থাকতে পারে। সাপের বিষের প্রভাবে রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে থাকা লাল রঙের হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে cyanosis নামে একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার ফলে ঠোঁট, মুখ, আঙ্গুল, নখ ইত্যাদি নীল হয়ে যায়। এ থেকেই এই ধারণার সৃষ্টি যে সাপের বিষ যেন নীল।

পাথর বা বাটি জোরে শরীরে চেপে দিলে ঘাম ইত্যাদির জন্য তা অল্প কিছুক্ষণ এমনিতেই শরীরে আটকে থাকে, তারপর আপনা-আপনি খসে পড়ে তার ভারের জন্য। এইভাবে আটকে থাকার পেছনে 'যতক্ষণ বিষ শুষে নিচ্ছে ততক্ষণ আটকে থাকছে' এই ধরনের কোন ব্যাপারও নেই। মাথায় জল ঢাললেও রক্তে মিশে যাওয়া বিষ কোনভাবে নিষ্ক্রিয় হয় না।

বিষাক্ত সাপের বিষ উপযুক্ত পরিমাণে রক্তে মিশে গেলে কোন সাধু-সন্ন্যাসী-ওঝা-গুণিন-পীরবাবার সাধ্য নেই শুধুমাত্র মন্ত্রপড়ে, হাত চেলে, পাথর, বাটি বা থালা বসিয়ে অথবা জল ঢেলে রোগীকে

বাঁচায় বা বিষমুক্ত করে। তবু অনেক ক্ষেত্রেই এ সব করার পরে সাপে কামড়ানো রোগী বেঁচে গেছে বলে দেখা যায়। এর পেছনে এই সব পদ্ধতির কার্যকারিতা নেই রয়েছে ভিন্নতর বাস্তব কারণ।

সাপে কামড়ালেই রোগী মারা যাবে তার কোন মানে নেই। প্রথমে দরকার গোখরো, কেউটে, শংখচূড়, চন্দ্রবোড়া, কালাচ, শাঁখামুটি, গেছোবোড়া ইত্যাদির মত কোন বিষাক্ত সাপের কামড়। কিন্তু সর্পদংশনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই ঘটে দাঁড়াশ বা ঢ্যামনা, হেলে, জলঢোঁড়া, বেত আছড়া, ছুঁয়ে ইত্যাদি নির্বিষ সাপের জন্য। এছাড়া আবার কিছু ক্ষীণবিষ সাপের কামড়ও ঘটে যেমন লাউডগা, মেটেলি, কালনাগিনী, কাঁড় সাপ ইত্যাদির। এদের কামড়ে কিছু জ্বালাযন্ত্রণা ঘটলেও মারাত্মক বিষক্রিয়া খুব একটা হয় না। বিষাক্ত সাপের কামড়ে দুটি বিষদাঁতের স্পষ্ট দাগ পাশাপাশি থাকে, নির্বিষ সাপের ক্ষেত্রে চামড়ায় একাধিক ছোট ছোট দাগ বা আঁচড়ের চিহ্ন পাওয়া যায়। আর সাপটিকে চিনতে পারলে তো হাতে নাতেই তফাৎ করা যাবে বিষাক্ত ও নির্বিষ সাপের কামড়কে।

দ্বিতীয়তঃ দরকার উপযুক্ত পরিমাণ বিষ শরীরে ঢালা। বিষাক্ত সাপ কামড়ালেও যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিষ ন্যূনতমভাবে (lethal dose) শরীরে অর্থাৎ রক্তে না ঢোকাতে পারে তাহলেও মৃত্যু হবে না। বিভিন্ন প্রাণীর ও বিভিন্ন সাপের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ বিভিন্ন। যেমন মানুষের ক্ষেত্রে কালাচ সাপের বিষের এই পরিমাণ ১ মিলিগ্রাম, শাঁখামুটির ১০ মিলিগ্রাম, শংখচূড়ের ১২ মিলিগ্রাম, কেউটে বা গোখরোর ১৫ মিলিগ্রাম, চন্দ্রবোড়ার ৪২ মিলিগ্রাম, বোড়ার ১০০ মিলিগ্রাম ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রেই, সাপ বিশেষতঃ গেছোবোড়া বা চন্দ্রবোড়া সাপ, এই পরিমাণ বিষ ঢালতে পারে না,—কারণ সাপ দিনের বেলাতেও ভাল দেখতে পায় না, দূরত্ব বুঝতে পারে না ও অনেকটা অনুমাণেই ছোবল মারে, কামড়ানোর সময় নিজেই ত্রস্ত থাকে আর যাকে কামড়াচ্ছে সেও দ্রুত শরীর সরিয়ে নিতে পারে।

মূলতঃ এই দুটি কারণে শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী সাপের কামড়ের রোগীর মারা যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সাপ সম্পর্কে ভীতি সাধারণের মধ্যে এত তীব্র যে সাপে কামড়ানো মাত্রই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি ভয়ে ও আশংকাতেই অজ্ঞান হয়ে যান এবং এটিই একটি মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষতঃ শিশু ও মহিলাদের ক্ষেত্রে। অথচ হয়তো সাপটি আদৌ বিষধর ছিল না বা বিষধর হলেও উপযুক্ত পরিমাণ বিষ দিতে পারে নি। আর ১০ জন সর্পদংশনের রোগীর ৭-৮ জনই যদি এইভাবে আসলে বিষমুক্ত রোগী থাকে তবে তাদের ক্ষেত্রে মাথায় জল ঢেলে, পাথর বসিয়ে বা বাটি বসিয়ে রোগীর মানসিক সাহস ফিরিয়ে আনার ফলে সে তাড়াতাড়ি তার তীব্র ভয় কাটিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে বা এমনিতেই ধীরে ধীরে সামলে ওঠে। বাকী দু'জন যদি মারাও যায় তবে ভেতরের বাস্তব কারণটি অজ্ঞতার ফলে চাপা পড়ে যায় এবং ঐ ধরনের ভ্রান্ত সংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসায় আস্থা বাড়ে। ফলে এই দুজন রোগী, যাদের উপর পাথর বা বাটি বসিয়ে সময় নষ্ট না করে, তাড়াতাড়ি উপযুক্ত চিকিৎসা করালে সেরে যেত তারাও, বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। অন্যদিকে নির্বিষ সাপের কামড়ে ভয়ে অজ্ঞান হওয়া রোগীর উপর জল ঢাললেও তার জ্ঞান আস্তে আস্তে ফিরে আসে। আবার ক্ষীণবিষ সাপের বিষ বা বিষধর সাপ যদি সামান্য পরিমাণ বিষ ঢেলে থাকে তবে সেই বিষ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জল ঢালার ফলে সময় কাটার সঙ্গে সঙ্গে 'কেটে' যায় অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই তার মৃদু প্রতিক্রিয়া শেষ হয়ে আসে। মাহাত্ম্য বাড়ে জলচিকিৎসার। অন্যদিকে ক্ষীণবিষ বা অল্প পরিমাণ বিষ দুর্বল, অপুষ্টিতে ভোগা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও কিন্তু মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

সাপে কামড়ানো মাত্র দেখে নেওয়া দরকার কি ধরনের সাপ কামড়েছে এবং তাকে ধরার চেষ্টা করা—অবশ্য যাকে কামড়েছে সে, বা তাকে ফেলে রেখেই অন্যান্যরা আবার যেন তা না করেন।

কামড়ানো জায়গার ওপর বাঁধন দেওয়া দরকার—কিন্তু এই বাঁধন খুব শক্ত করা উচিত নয়, শুধু চামড়ার নীচের শিরার রক্ত সঞ্চালন বন্ধ করবে অথচ ভেতরে ধমনীর রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখবে—এ ধরনের বাঁধন দেওয়া উচিত। এছাড়া ১৫-২০ মিনিট অন্তর অন্তর বাঁধনটি আলগাও করে দেওয়া দরকার যাতে শরীরের দূরবর্তী অংশ রক্তের অভাবে মারা না পড়ে। আসলে বাঁধন বা তাগা বিরাট কিছু করে না, যদিও সঙ্গে সঙ্গে বাঁধন দিতে পারলে সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়তে না দেওয়ার ক্ষেত্রে এর সামান্য ভূমিকা অবশ্যই আছে। সাপে কামড়ানোর পর রোগীর চুপচাপ থাকা উচিত, ভয়ে ছোটা দূরের কথা—হাঁটাহাঁটিও না করা ভাল।

কামড়ানো জায়গাটি ব্লেড বা ছুরি দিয়ে কেটে বিষ বের করে দেওয়ার চেষ্টাও অনেকে করেন। এটিও ভুল ও বিপজ্জনক। যদি বিষ শরীরের রক্তে ঢুকে থাকে তবে এইভাবে কেটে বা রক্তপাত করিয়ে বিষ বের করান সম্ভব নয়, কারণ বিষ ঐ জায়গা থেকে শিরা বেয়ে চলে গেছে হৃদপিণ্ডের দিকে, আর রক্তপাতের কিছু রক্ত আসছে শিরা বেয়েই, তবে ক্ষতস্থানের যে দিকে হৃদপিণ্ড রয়েছে তার উল্টোদিকের অংশ থেকে এবং ধমনী বেয়ে হৃদপিণ্ডের দিক থেকে। ফলে বিষ নিয়ে যাচ্ছে যে রক্ত ও কেটে রক্তপাত ঘটালে তার রক্ত—এ দুই রক্তধারা সম্পূর্ণ আলাদা। আর এইভাবে কাটা ছেঁড়ার ফলে যতটুকু বিষ হয়তো চামড়ার স্তরেই ছিল, রক্তে মিশতে পারে নি, তাও রক্তে মিশে যাবে। তাড়াহুড়োয় কাটাকাটির ফলে ক্ষতস্থান বিষিয়ে যাওয়া, এমনকি টিটেনাস হয়ে মারা যাওয়াও বিচিত্র নয়। একই কারণে ক্ষতস্থানে পটাশপারম্যাঙ্গানেট দিয়ে ঘষা, লোহার শিক গরম করে পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদিও বিপজ্জনক। ক্ষতস্থানে বরফ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বড়জোর ১০-১৫ মিনিট ধরে। অনেকে মুখ বা জ্যান্ত মুরগীর মলদ্বার ক্ষতস্থানে লাগিয়ে বিষ শুষে নেওয়ার চেষ্টা করে। প্রথমতঃ এভাবে রক্তে মিশে যাওয়া বিষ শুষে নেওয়া যায় না, এবং বিষ শুষে নেওয়ার জন্য

শোষক যন্ত্রের ব্যবহারও ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, চামড়ায় লেগে থাকা বিষ যদি যে শুষে নিচ্ছে তার মুখে ঢোকে, তবে ঠোঁট, মাড়ি বা জিভের ফাটা-চেরা জায়গা দিয়ে শরীরে ঢুকে তারও বিপদ ডেকে আনতে পারে। স্থানীয় ব্যথা কমানর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মরফিন বা কোন মাদক দ্রব্য কখনোই দেওয়া উচিত নয়। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, 'হায়, হায়' না করে ঠাণ্ডা মাথায় রোগীকে মানসিক সাহস দেওয়া এবং ওঝা-গুণিন দেখানো, মনসা পূজা করা, মন্ত্র পড়া, পাথর বসানো বা হাত চালা ইত্যাদিতে সময় নষ্ট না করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। এখানে কামড়ের জায়গাটি দেখে অভিজ্ঞ চিকিৎসক কি ধরনের সাপ কামড়েছে তা বুঝতে পারবেন। তারপর **AVS,** জীবাণু ধ্বংসকারী ওষুধ, স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ ইত্যাদি দেওয়া হয়। এবং এইভাবে দ্রুত চিকিৎসা শুরু হলে বিষাক্ত সাপে কামড়ানো প্রায় সব রোগীকেই বাঁচান যায়।

সাপের উৎপাতে এখনো মা-মনসাই ভরসা!

"গোটা খেজুরী থানা এলাকায় বর্তমানে সাপের উপদ্রব বাড়ছে। সাপের উপদ্রব কমাতে খেজুরী বিদ্যাপীঠ চৌরঙ্গী মোড়ে ইয়ংস্টার নেতাজী তরুণ সংঘের পরিচালনায় জনকা হাসপাতালের মাঠে সম্প্রতি মনসা পূজা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।" (দৈনিক চেতনা, কাঁথি, মেদিনীপুর; ২৪. ৭. ৮৮.) সাপ সম্পর্কিত নানা ব্যাপারে মা-মনসায় বিশ্বাস তথা এ ধরনের নানা বিপজ্জনক কুসংস্কার আমাদের দেশে কি ব্যাপকভাবে এখনো বর্তমান তার আঁচ এ ধরনের ছোট্ট একটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায়। আরো লজ্জাজনক, ভয়াবহ ও করুণ ব্যাপার হল হাসপাতালেরই মাঠে কিছু 'শিক্ষিত' 'ইয়ং' রা মিলে আয়োজন করছেন এ ধরনের পূজো-আচ্চার।

বাণ মেরে অসুস্থ করা

বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে মন্ত্র পড়লে ঐ ব্যক্তিকে নাকি অসুস্থ করে দেওয়া যায়। অনেক সময় ঐ ব্যক্তির প্রতীক হিসেবে একটি পুতুল নেওয়া হয় এবং উদ্দিষ্ট যে স্থানে আঘাত করা হবে, মন্ত্রের সাথে পুতুলের ঐ স্থানে সূচ ফোটান হয়। যেমন হয়তো কাউকে অন্ধ করা হবে—তখন পুতুলটির চোখে সূচ ফুটিয়ে দেওয়া হয়। কখনো বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নখ, চুল, রক্ত, থুথু, এমনকি পরণের কাপড়ের টুকরো সংগ্রহ করেও তার ওপর মন্ত্র পড়ে তাকে 'অসুস্থ করা হয়'। এই ধরনের পদ্ধতিই বাণ মারা, যার অর্থ 'মন্ত্রপূত শর'। যারা এই ভাবে 'বাণ মারার ক্ষমতার অধিকারী' স্পষ্টতঃই তারা অন্যান্যদের সম্ভ্রম ও ভীতি আদায় করে। এদের ওঝা বা গুণিন বলা যায়, কোথাও কোথাও ডাইনী, ভানমতী ইত্যাদি নামেও এদের অভিহিত করা হয়। অনেক সময় তথাকথিত এই ক্ষতিকর ক্ষমতার জন্য ওরা গণরোষের শিকার হয়ে মারধোরও খায়, এমনকি খুনও হয়। সাধারণতঃ আদিবাসী ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সব ঘটনা বেশী ঘটে। গ্রামের বা গোষ্ঠীর কেউ বাণ মারার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে—একবার এ ধরনের ঘটনা প্রচারিত হওয়ার পর চক্রবৃদ্ধিহারে অন্যান্যরাও মানসিক কারণে এর শিকার হয়।

বর্তমানে, আমাদের চূড়ান্ত জ্ঞান অর্জিত না হলেও গত প্রায়২০০ বছরের মধ্যে আমাদের শরীর ও তার বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে বহু বিস্তারিত ও গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। এই সব তথ্য অনুযায়ী, দূর থেকে মন্ত্র পড়ে বা কারোর উদ্দেশ্যে কিছু কাজ কর্ম করে তাকে অসুস্থ করে দেওয়ার ব্যাপাটার সমর্থনে কোন তথ্য জানা নেই। বাস্তবতঃ বাণ মেরে যেসব রোগ হওয়ার কথা বলা হয় তাদের বিশ্লেষণ করলে বাস্তব কিছু কারণই পাওয়া যাবে। মাঠে চাষ করতে করতে পাথর বা হাড়ের টুকরো ফুটে পা হয়তো বিষিয়ে ফুলে উঠেছে, গ্রামের হাতুড়েদের টোটকায় কিছু উপকার

হল না—তখন 'দুরারোগ্য' এই ব্যাপারটিকে বাণ মারার কোন রহস্যময় কারণ প্রসূত বলে ধরে নেওয়া হয়। মৃগীর ফিট, ঘা বা যক্ষ্মা হয়ে প্রস্রাবে রক্ত পড়া ইত্যাদি ধরনের বহু ব্যাপারই তথাকথিত বাণ মারার ঘটনার পেছনে রয়েছে বলে দেখা গেছে। ব্যাপারটিকে জটিল করে তোলে দরিদ্র ও অসহায়, সংস্কারাচ্ছন্ন সরল বিশ্বাসী মানুষের অহেতুক ভীতি। একবার দুরারোগ্য কোন ব্যধি 'বাণমারার' ছাপ পেয়ে গেলে, অন্যদের মনেও ব্যাপারটি সংক্রামিত হয়। এবং অন্যরা সব ধরনের ছোট-বড় অসুস্থতাকেও কোন ডাইনী বা ভানমতীর বাণ মারা বলে অভিহিত করতে থাকে। এমনকি আতঙ্ক ও অন্ধ বিশ্বাসের ফলে গণ-হিস্টেরিয়ার সৃষ্টি হয়ে নানা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন কয়েক বছর আগে হয়েছিল ঝিন্‌ঝিনি রোগ। একইভাবে একবার কেউ কোন 'ভূত দেখার ঘটনাকে' বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রচার করে দিলে অন্যরাও ধারাবাহিকভাবে ভূত দেখতে থাকে, যদিও ভূত দেখার এই সমস্ত ঘটনাই ভূয়ো—হয়, দৃষ্টি বিভ্রম অথবা আতঙ্কজনিত অস্থিরতা-প্রসূত। একইভাবে কোন ওঝা-গুণিন-সাধু সন্ন্যাসী বা অবতারের সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যভাবে কিছু প্রচার করলে—তার ভক্তসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। এ সবই ঘটে আশেপাশের মানুষের যুক্তিবোধহীন, অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার কারণে।

বাণমারার ব্যাপারটার মধ্যে যাদুবিদ্যার (magic) প্রভাব স্পষ্ট। [ইংরেজি Magic কথাটি এসেছে ফার্সী Magi শব্দ থেকে। প্রাচীন পারস্যের অগ্নি উপাসক পুরোহিত মাজি (Magi) বা Magus-রা নানা ধরনের রহস্যময় ক্রিয়াকর্ম করত এবং এইভাবে অন্যদের উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করত।] আদিম মানুষ প্রাণ ও প্রকৃতি জগতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে একটি অতীন্দ্রিয় শক্তির কল্পনা করে তাকে বশীভূত বা প্রভাবিত করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের কাল্পনিক পদ্ধতির জন্ম দিয়েছে। এর সাহায্যে সে একদিকে যেমন নিজের বিপদআপদ রোগব্যধি নিরাময়ের চেষ্টা করেছে অন্যদিকে অন্যের

উপর আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টাও করেছে। এই শেষোক্তটিরই একটি ধারা বাণ মারা (magical arrow)—যেন মন্ত্রপূত অদৃশ্য একটি তীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি নিক্ষেপ করা হচ্ছে। মহাভারতের বাণ রাজারও নাকি এ ধরনের নানা ক্ষমতা ছিল বলে বলা হয়েছে। এই যাদুবিদ্যার পদ্ধতি আবার দু'ভাবে বিভক্ত। এক ধরনের হচ্ছে সদৃশ যাদুবিদ্যা (Homeopathic বা imitative magic)। যেমন, একটি পুতুলকে কোন ব্যক্তির প্রতীক হিসেবে ভেবে ঐ পুতুলকে আঘাত করলে যেন ঐ ব্যক্তির গায়েও আঘাত লাগবে। আরেকটি পদ্ধতিকে সংক্রামক যাদুবিদ্যা (contagious magic) বলা যায়। এর মূল, কথা হল যে-সমস্ত বস্তু কোন ব্যক্তির সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ সেই ব্যক্তি ও বস্তু শারীরিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে থাকলেও উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। যেমন নখ, চুল, পরনের কাপড়, রক্ত ইত্যাদি। আর এই ধারণা থেকেই কোন ব্যক্তির শরীর থেকে এগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে তার ওপর তুকতাক-মন্ত্র প্রয়োগ করে ভাবা হত এর ফলে ঐ ব্যক্তির উপরও প্রভাব বিস্তার করা যাবে। যাদুবিদ্যার এই ধরনের কাণ্ডকারখানা শুধু বাণ মারার মধ্যে নয়, এই ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও আদিম বহু কাল্পনিক পদ্ধতিতেই জড়িয়ে রয়েছে।

অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক জ্ঞান একদিকে যেমন এই ধরনের পদ্ধতির জন্ম দিয়েছে, অন্যদিকে কিছু ব্যক্তি পুরোহিত, ওঝা ইত্যাদি নাম নিয়েও এগুলির আশ্রয় নিয়ে অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করেছে। আর বর্তমানে, গরীব, অশিক্ষিত মানুষেরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও চিকিৎসাদির সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকায়, এই সবের সাহায্যেই রোগারোগ্যের চেষ্টা করে, রোগের পেছনে বাণমারার মত ঘটনাকে দায়ী করে তাকে কাটানর জন্য ওঝা-গুণিনের আশ্রয় নেয় এবং 'কিছু একটা করা হচ্ছে'—এই ভেবে মানসিক সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করে।

ভারতের মত দেশের নানা স্থানে বাণমারার প্রতি অটল আস্থা

এখনো রয়েছে। অনেককেই বলতে শোনা যায়, তাঁরা এর চাক্ষুষ প্রমাণও নাকি পেয়েছেন যাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখির কাছে একটি গ্রামে এ ধরনের এক গুণিনের কথা শোনা গেল, যে নাকি দূর থেকে মন্ত্র পড়ে (অর্থাৎ বাণ মেরে) কাউকে অসুস্থ করে দেবে (আর এ অসুস্থতা তার মন্ত্র ছাড়া কোনভাবে সারান সম্ভব নয়), কিছু দূরে কোন ব্যক্তির হাতে ধরা একটি কাগজে আগুন লাগিয়ে দেবে, দূরের একটি গাছকে বাণ মেরে শুকিয়ে দেবে, মন্ত্রের জোরে সাপকে গর্ত থেকে বের করে আনবে ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপারটা দেখার জন্য তার সাথে যোগাযোগ করা হয়। তবে এ সব করতে সে কয়েকশ' টাকা দাবী করে। ঠিক হয় আগে তাকে কিছু টাকা দিয়ে দেওয়া হবে এবং সন্তোষজনক ভাবে সবকিছু করতে পারলে, বাকী টাকা দেওয়া হবে। এতে সে রাজিও হল। কিন্তু সাথে তাকে কিছু শর্তের কথা বল, যেমন বাণ মেরে কাকে কাকে অসুস্থ করতে হবে তা ও ঠিক করবে না; দু'জনের কথা বলা হবে—একজনকে সামনাসামনি আরেকজনকে আড়াল থেকে তার অজান্তে মন্ত্র পড়ে অসুস্থ করতে হবে,—এদের নাম ঠিক বাণ মারার সময় বলে দেওয়া হবে। যে কাগজে সে বাণ মেরে আগুন লাগাবে সেই কাগজটি সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হবে এবং আমাদেরই একজন কাগজটি ধরবে। যে গাছটি মন্ত্রবলে শুকিয়ে দেওয়া হবে সেই গাছটিও সে ঠিক করবে না, বাণ মারার ঠিক আগে আমরাই গাছ ঠিক করে দেব। সাপ বের করানর ব্যাপারটা প্রয়োজন হলে তাকে ভাড়া দিয়ে কলকাতায় নিয়ে এসে করা হবে। কিন্তু এই সব শর্তের কোনটিতেই সে রাজী হল না। যেমন কাগজ বা খড় গুণিন নিজেই আনবে এবং তার লোকই সেটি ধরবে—এই ছিল তার শর্ত। অন্যান্যগুলির ক্ষেত্রেও একই রকম ব্যবস্থা সে করবে বলে জানায়। কিন্তু সত্যিই যদি বাণ মারার বা মন্ত্রের জোর থাকত তবে তো যে কোন কাগজে আগুন লাগান, যাকে খুশি অসুস্থ করা বা যে কোন

গাছ শুকিয়ে দেওয়া যাবে। আমাদের শর্তে রাজী না হওয়ায় যে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয় তা হল ঐ বাণ মারা বা মন্ত্রের জোর সব ফালতু কথা—আসলে থাকে কিছু কারসাজি। যেমন কাগজ বা খড়ে বিশেষ কিছু মাখিয়ে রেখে রোদে ধরলে কিছুক্ষণ পরে তার থেকে ধোঁয়া বেরুতে পারে। অন্যান্যগুলির মধ্যেও এই ধরনের নানা কারসাজি করা যায়। গ্রামের সাধারণ মানুষ এত সব কিছু তলিয়ে দেখেন না ; বাণমারা তথা অলৌকিকত্বে সন্দেহাতীত আস্থার কারণে নিজের মত করে মিলিয়ে নেওয়া হয়। মাহাত্ম্য বাড়ে বাণ মারার বা অতীন্দ্রিয় শক্তির, ব্যবসা বাড়ে গুণিন-ওঝাদের—যুক্তিবোধ কমতে থাকে মানুষের, লাভ হয় শাসক শ্রেণীর। যাই হোক বাণ মারার মত তথাকথিত ঘটনাবলীর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করলে ও চ্যালেঞ্জ করে দেখলেই তাদের অসারতা আর ফাঁকির ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়। অন্ধবিশ্বাসী দুর্বলচিত্ত কাউকে বাণ মেরে অসুস্থ করে দেওয়া হবে শুনলে ভীতির জন্য মানসিক কারণেই সে অসুস্থ হতে পারে। অন্যথায় মন্ত্রের জোরে অসুস্থ করা সম্ভব নয়।

রোগ সারানোর আরো কিছু উপায়

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ একদিকে যেমন সীমাবদ্ধ জ্ঞান সত্ত্বেও বিভিন্ন গাছগাছড়া, খনিজ পদার্থ, পশুপাখির শরীরের নানা অংশ ইত্যাদির সাহায্যে নিজেদের রোগকষ্ট লাঘবের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি, পাশাপাশি চালু হয়েছিল কিছু অপবৈজ্ঞানিক ধারা। মন্ত্র পড়া, পূজাআচ্চা করা, ভূত-প্রেত-পিশাচকে তাড়ান ইত্যাদি নানাবিধ প্রক্রিয়ায় এটি করা হত। এসবের মধ্যেও পূর্বোক্ত যাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রভাব ছিল। এবং এখানেও সেই সংক্রামক ও সদৃশ যাদুবিধানের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

এইভাবেই প্রাচীনভারতে ন্যাবা বা পাণ্ডুর (jaundice) রোগের চিকিৎসা হিসেবে চোখের হলুদ রঙকে উদয় বা অস্তের সময়কার হলুদাভ সূর্যের কাছে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে উৎসর্গ করা হত।

বোর্নিওর আদিবাসীরা প্রসব যন্ত্রণা লাঘবের জন্য বিশেষ গুণিনের আশ্রয় নিত—বাচ্চার অনুকরণে একটি পুতুল এই গুণিন নিজের পেটে বেঁধে নকল প্রসব করাত এবং মন্ত্র পড়ত ; ধারণা, এর ফলে মায়েরও সুপ্রসব হবে। এই যাদুবিদ্যার ধারা বেয়েই মাদুলি, কবচ, আংটি, বালা, তাবিজ ইত্যাদির সৃষ্টি—যা ধারণ করে রোগ সারান বা রোগকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা নেওয়া হত এবং এখনও নেওয়া হয়। যদিও গ্রামের গরীব চাষী থেকে 'বিজ্ঞানের অধ্যাপকও' এসব ধারণ করেন বা নিজেদের ছেলেমেয়েদের পরান, তবু প্রকৃত পক্ষে কিছু মানসিক আস্থা দেওয়া ছাড়াও এসবের অন্য কোন বাস্তব উপযোগিতা নেই। এইভাবে কোন রোগ সারান বা কোন রোগকে আটকে রাখা সম্ভব নয়। মাদুলি, তাবিজের তথাকথিত দ্রব্যগুণের যে কথা বলা হয়, তাও ভিত্তিহীন। এইসব হাবিজাবি জিনিসপত্র যে ধাতু বা দ্রব্য দিয়ে তৈরী তা শরীরের মধ্যে আদৌ প্রবেশ করে না বা যদি তার দু' একটি অণু শরীরে ঢোকেও তবুও তার বাস্তব কোন প্রতিক্রিয়া হয় না।

যাদুবিদ্যারই অধিকারী হিসেবে পুরোহিত ইত্যাদিরা এই গুপ্ত-বিদ্যার সাহায্যে রোগ সারান ও অন্যদের কাছ থেকে সম্ভ্রম ও অর্থাদি আদায় করার কৌশল অবলম্বন করে। এরই ধারাবাহিকতা এখনো চলছে। চলছে সাঁইবাবার বিভূতি বা ছাই, দলাইলামার পায়খানা ইত্যাদি হাবিজাবির ব্যবহার। সাঁইবাবার বিভূতি খেয়ে, মাথায় ঠেকিয়ে, গায়ে মেখে বা ধারণ করে নানা রোগ সারান যায় বলে সাঁইবাবা ও তার ভক্তরা দাবী করে। সাঁইবাবা নিজে কিন্তু নিজের অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের জন্য এই বিভূতি না খেয়ে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ভাবে অস্ত্রোপচার করিয়েছে (যদিও এর ব্যাখ্যা দিয়েছে অন্যরকম)। বলা হয়, সাঁইবাবার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে তার বিভূতির সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়, যদিও পাশাপাশি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যাপক ব্যবস্থাও রয়েছে। একইভাবে প্রাচীন তিব্বতে দলাইলামা নিজের পায়খানাকে বড়ি করে গরীব লোকদের দিত ওষুধ হিসেবে। বর্তমানে তিব্বত থেকে দলাইলামার স্বেচ্ছা-

নির্বাসন ঘটায়, এই পায়খানার বদলে সেখানকার মানুষ আধুনিক চিকিৎসারই সুযোগ নিচ্ছে এবং তাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। আর দলাইলামারা নিজেদের অসুখের সময় নিজেদের পায়খানা না খেয়ে বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসারই সুযোগ নিত। এই ধরনের উদাহরণ পৃথিবীর বহু প্রান্তেই ছড়িয়ে আছে। অন্ধবিশ্বাসী সরল, অসহায় মানুষকে কিছু মানসিক সাহস দেওয়া ছাড়া এই সবের কোন বাস্তব উপকার নেই, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা ক্ষতিকর। ক্যান্সারে মুমূর্ষু একজন ব্যক্তি যখন দেখেন মানুষের জ্ঞানের আওতার মধ্যেকার সব চিকিৎসাও ব্যর্থ হল এবং মৃত্যু অবধারিত, তখন তিনি গভীর বিশ্বাস নিয়ে গুরুদেব বা তথাকথিত অবতারের মহিমার উপর নির্ভর করে জীবনের শেষ কটা দিনে একটু শান্তি খোঁজেন। এর কিছু ব্যবহারিক মূল্যও রয়েছে যদিও তা ভিত্তিহীন। কিন্তু যে সব রোগ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় ভাল হয়ে যেত সে সবের ক্ষেত্রেও যখন ঐ সব হাবিজাবিকে প্রয়োগ করা হয়, তখন তা রোগকে জটিল করে তুলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। আবার দু' একটি ক্ষেত্রে ভক্তের গভীর বিশ্বাসের কারণে নিজের মানসিক প্রভাবে রোগের উপশমও ঘটতে পারে এবং স্পষ্টতঃ সেটি ঐ বিভূতি, পায়খানা বা এই জাতীয় কিছুর (গুরুদেবের আশীর্বাদ, পূজা-শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি সহ) বাস্তব কোন ক্রিয়ার ফলে ঘটে না।

সরল বিশ্বাসী লোকদের মাথায় হাত বুলিয়ে এইভাবে নানা ওঝা—গুণিন-ফকির-দরবেশ-বাবাজি-গুরুজি-অবতার-পুরোহিতেরদল পৃথিবীর নানা প্রান্তে রোগ সারানার নাম করে, প্রতারণা করে চলেছে। হিস্টেরিয়ার মত কিছু মানসিক রোগ ও মানসিক প্রভাবে সারার মত অবস্থায় রয়েছে এমন কিছু রোগ ছাড়া এদের চিকিৎসায় অন্য কোন রোগ সারা সম্ভব নয়।

পেঁচোয় পাওয়া

নবজাত শিশু অনেক সময়—বিশেষতঃ গ্রামে বা বস্তিতে দরিদ্র পরিবারে,—জ্বর, ও খিঁচুনিতে ভোগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা মারা

পড়ে। ব্যাপারটিকে পেঁচো নামক এক অপদেবতার প্রভাব বলে গণ্য করা হয় এবং তাকে দূর করার জন্য ওঝা-গুণিনের সাহায্যে নানা ক্রিয়াকর্ম করা হয়। কখনো লংকা পুড়িয়ে, কখনো বা পারা অর্থাৎ পারদ (mercury) জোগাড় করে তা মন্ত্রপূত করে ও পুড়িয়ে এবং আরো নানা ভাবে এই সব কাজকর্ম করা হয়। বলাবাহুল্য এর ফল (!) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় নেতিবাচক।

এবং তা-ই হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ব্যাপারটি অস্তিত্বহীন পেঁচো নামক ভূতের জন্য নয়, হয় ক্লষ্ট্রিডিয়াম টিটেনি (Clostridium tetani) নামক এক জীবাণুর জন্য ও রোগটি আসলে টিটেনাস। টিটেনাস ছাড়া অন্য জীবাণুর বা ভাইরাসের আক্রমণ হয়ে মেনিনজাইটিস, এনকেফালাইটিস ইত্যাদি অথবা নিউমোনিয়া জাতীয় রোগের ফলেও জ্বর, খিঁচুনি ইত্যাদি হতে পারে। এবং এসবের চিকিৎসা কখনোই ওঝা-গুণিনের মন্ত্র বা লংকা পোড়ানো ইত্যাদি নয়।

নবজাত শিশুর টিটেনাস (tetanus neonatorum) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুর মৃত্যু ঘটায়। মূলতঃ উষ্ণ অঞ্চলে ও দরিদ্র পরিবারে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এটি বেশী হয়। নবজাত শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি খুব কম থাকে তবে এটি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। শিশু তার জীবনের প্রথম কয়েক মাসের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পায় তার মায়ের কাছ থেকে। তাই অপুষ্টিতে ভোগা বা দুর্বল মায়েদের শিশুরা টিটেনাস বা এই ধরনের রোগে বেশী মারা যায়। গর্ভাবস্থায় মা-কে উপযুক্ত পুষ্টি দেওয়া প্রয়োজন এবং নবজাত শিশু যাতে টিটেনাসে না ভোগে তার জন্য গর্ভাবস্থার মাঝামাঝি গর্ভবতী মা-কে একমাসের ব্যবধানে টিটেনাস-প্রতিরোধী ইনজেকশান দু'বার অবশ্যই দিয়ে দেওয়া উচিত।

প্রসবের পর শিশুর শরীর থেকে নাড়ী (umbilical cord) কাটার ক্ষত থেকেই সাধারণতঃ শিশু টিটেনাসে আক্রান্ত হয়। জীবাণুমুক্ত ছুরি বা ব্লেড দিয়ে এটি কাটা উচিত। অপরিষ্কার

ঝিনুক, মরচেপড়া ব্লেড, বাঁশের পাত ইত্যাদি দিয়ে কখনোই কাটা উচিত নয়। একটি নতুন ব্লেডকে আগুনে গরম করে ঠাণ্ডা করে নিলেই নাড়ী কাটার জীবাণুমুক্ত অস্ত্র পাওয়া যেতে পারে।

আর টিটেনাস হয়ে গেলে বা নবজাত শিশুর জ্বর হলেই হাসপাতালে বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার আশ্রয় নেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে একদিকে অশিক্ষা, অসচেতনতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা অন্যদিকে দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য ও ব্যাপক মানুষের কাছে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ না থাকার মত অব্যবস্থা যেখানে হাত ধরাধরি করে টিকে আছে সেখানে গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি, টিটেনাস প্রতিরোধী ইনজেকশান, জীবাণুমুক্ত অস্ত্র দিয়ে নাড়ী কাটা অথবা অসুস্থ শিশুর উপযুক্ত চিকিৎসা—এ সবের কোনটিই ঘটে না। তাই অসহায় বাবা মা অস্তিত্বহীন পেঁচোকেই দায়ী করে শিশুমৃত্যুর জন্য। অথচ নিস্তব্ধ, প্রায়ান্ধকার পরিস্কার ঘরে এই পেঁচোয় ধরা অর্থাৎ টিটেনাসে আক্রান্ত শিশুকে রেখে এ্যান্টি টিটেনিক সিরাম (ATS), পেনিসিলিন ইত্যাদির সাহায্যে এই শিশুকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব—কিন্তু ওঝা-গুণিনের পেঁচো-তাড়ান বিদ্যায় তা আদৌ সম্ভব নয়।

অস্বাভাবিক কিছু মানসিক অবস্থা ও অনুভূতি

আমাদের মন সম্পূর্ণই বস্তু অর্থাৎ জীবন্ত স্নায়ু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ভর, যদিও ব্যাপারটি অত্যন্তই জটিল একটি প্রক্রিয়া। অনেকে এই জটিল ও বিচিত্র মনের অস্বাভাবিকত্বে ভোগেন। এই অস্বাভাবিকত্বের একটি দিক হল নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর অনুভূতি। একে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—ভ্রমাত্মক অনুভূতি (illusion), মতিভ্রম (hallucination) ও বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা (delusion)।

Illusion হচ্ছে কোন বস্তু প্রকৃত পক্ষে যা তাকে সেইভাবে উপলব্ধি না করা। Hallucination হচ্ছে অস্তিত্বহীন কোন কিছু সম্পর্কে ভ্রান্ত অনুভূতি লাভ করা। Delusion হচ্ছে কোন ব্যাপারে

অসুস্থ ও বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা বা বিশ্বাস। মেঝেতে পড়ে থাকা একটি দড়িকে সাপ বলে মনে হওয়া illusion বা ভ্রমাত্মক অনুভূতি। কিছুই নেই অথচ একটি সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে ধারণা হওয়াটা মতিভ্রম বা hallucination। দড়িকে মন্ত্রবলে সাপ করে দেওয়া যায়—এ ধরনের বদ্ধমূল বিশ্বাস হচ্ছে delusion.

পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর ভিত্তি করে illusion ও hallucination-এর অনুভূতিও পাঁচ ধরনের হতে পারে। যেমন, দৃষ্টিঘটিত (visual illusion ও hallucination), শ্রবণঘটিত (auditory), স্পর্শঘটিত (tactile), ঘ্রাণঘটিত (olfactory) ও স্বাদঘটিত (taste)।

একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি মরুভূমিতে মতিভ্রম বা ভ্রমাত্মক অনুভূতির ফলে মরুদ্যান, জলাশয় ইত্যাদি দেখতে পারে। একজন সরল বা ছিটগ্রস্ত লোক ছোটবেলা থেকে অস্তিত্বহীন কালীঠাকুর বা নানা দেব-দেবীতে গভীরভাবে বিশ্বাস করতে করতে (delusion) ও তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে, একসময় মতিভ্রান্ত অবস্থায় মনে করতে পারে—কালীঠাকুর বা অন্য কোন ঠাকুর তাকে দেখা দিল, ছুঁয়ে দিল বা মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, দৈববাণী শোনাল অথবা রামপ্রসাদের অনুভূতির (? মত বেড়া বাঁধা বা অন্য কোন কাজে সাহায্য করল। একইভাবে ধূপ-ধূনোর গন্ধ পেয়ে দেব-পূজা হচ্ছে বলে মনে করতে পারে। কাউকে দেখে বিশেষ কোন ঠাকুর হিসেবে মনে করা, পাতার খসখানি বা অন্য কোন আওয়াজকে ঠাকুর বা প্রেতাত্মার পদধ্বনি মনে করা, গায়ে কিছু ঠেকলে তাকে ঠাকুর বা ভূতের ছোঁয়া বলে মনে করা, সাধারণ চাল-কলার প্রসাদকে দারুন সুস্বাদু বা অমৃত বলে ধারণা হওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের ভ্রমাত্মক অনুভূতিও হতে পারে। আলো আঁধারিতে ভূত দেখা, নির্জন রাত্রের কোন আওয়াজকে ভূতের বা নিশির ডাক হিসেবে শোনা ইত্যাদিও এই ভাবেই ঘটে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনা অনুযায়ী এই ধরনের ভ্রান্ত

অনুভূতির বৈচিত্র্য আসে। আর এই ধরনের ভ্রান্ত অনুভূতি ও ধারণাগুলিকে গুরুগম্ভীরভাবে বা বিশ্বাসযোগ্যভাবে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সামনে হাজির করেই তথাকথিত নানা অবতার বা বাবাজি তৈরী হয়, সৃষ্টি হয় ঈশ্বরদর্শন বা প্রেতাত্মাদর্শনের ধারণা।

বিভিন্নভাবে এই ধরনের অসংখ্য বিচিত্র ভ্রান্ত অনুভূতি ও মতিভ্রমের অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়। এর পেছনে কাজ করে ভূত-প্রেত-ঠাকুর-দেবতা, মন্ত্রশক্তি বা অতীন্দ্রিয় শক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে নানা ধরনের মিথ্যে ও বদ্ধমূল ধারণাগুলি।

বিশেষ কিছু মানসিক (psychological) কারণ এর জন্য দায়ী থাকতে পারে। মস্তিষ্কের উপযুক্ত বিকাশ না ঘটলে বা পারি-পার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে অনেকে অত্যধিক ভাবুক, কল্পনাপ্রবণ ও আবেগপ্রবণ হয়ে বেড়ে ওঠে। মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুকোষের অস্বাভাবিক কাজের ফলেই এটি সম্ভব হয়। এই ধরনের ব্যক্তিকে সহজে সম্মোহিত করা সম্ভব হয় বা নিজেরা সহজেই আত্মসম্মোহনের (autohypnosis)-এর শিকার হন। এর ফলে সম্মোহিত অবস্থার মত নানা ধরনের ভ্রান্ত অভিজ্ঞতা (অর্থাৎ illusion ও hallucination ইত্যাদি) লাভ করেন, কখনো বা পুরনো কোন স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির জাগরণ ঘটে। ছোটবেলা থেকেই ঠাকুর দেবতা, ভূতপ্রেত, অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্পর্কে নানাবিধ কথাবার্তা শুনতে শুনতে অনেকের মধ্যেই এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বদ্ধমূল বিশ্বাস মনের গভীরে গড়ে বসে। তারপর সামান্য ধরনের প্রস্তাব বা স্তোকবাক্য (suggestion এঁদের মধ্যে ঐসব অস্তিত্বহীন ব্যাপার-গুলিকে ঘিরে মিথ্যে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। পুনঃ পুনঃ মন্ত্রোচ্চারণ করা, দীর্ঘক্ষণ খোলকর্তালের শব্দ, দীর্ঘক্ষণ ধরে পূজা, ধ্যান ইত্যাদি করা—এই ভাবে বহু বিচিত্র পদ্ধতিতে আত্মসম্মোহিত হওয়া এবং ভ্রান্ত অনুভূতি বা মতিভ্রমের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব। বিয়ের আগে কোন তরুণ বা তরুণী গভীরভাবে তার প্রেমিকের কথা ভাবতে

ভাবতে এক সময় আপন মনে তার সাথে কথা বলে উঠতে পারে, কারণ প্রেমিকের কথা শুনতে পাওয়ার মত ভ্রান্ত শ্রবণানুভূতি তার তার হতে পারে। একইভাবে তথাকথিত তূরীয় ধ্যান (transcedental meditation বা T. M.) বা অন্য কোন ধরনের ধ্যান করতে বা কোন ঠাকুরদেবতার ক্যালেণ্ডারে দেখা ছবি বা প্রতিমাকে গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে কারোর মনে হতে পারে সামনে শিবঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে, কালী ঠাকুর তার মা—তাকে খাইয়ে দিচ্ছে, কৃষ্ণঠাকুর নাচছে—তার ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ইত্যাদি। এ সবগুলিই অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার ফল মাত্র—দেবতা-প্রেতাত্মা-অতীন্দ্রিয় শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ যেমন নয়, যেমনি অলৌকিক-অতিপ্রাকৃতিক-অতীন্দ্রিয় কোন ব্যাপারও নয়। কিন্তু এখনো ব্যাপক মানুষের মধ্যে ব্যাপারগুলিকে এইভাবেই গণ্য করার সংস্কারাচ্ছন্ন প্রবণতা রয়েছে।

এই ধরনের তথাকথিত অলৌকিক, অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের অস্বাভাবিক ক্রিয়ার ফল তা পরীক্ষা মূলকভাবে প্রমাণও করা সম্ভব। যেমন বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে (physical stimulus) মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়বিক কেন্দ্রকে উত্তেজিত করে কৃত্রিমভাবে ভয়, প্রেম, ঘৃণা, আধ্যাত্মিক ভাব ইত্যাদি ও নানা ধরনের অস্বাভাবিক অনুভূতি আনান সম্ভব। সুইজারল্যাণ্ডের ডঃ ওয়াল্টার হেজ, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জে. ডেলগাডো, মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জেম্‌স্ ওলডস্ সহ অনেকেই বৈজ্ঞানিক ভাবে এগুলি প্রমাণ করেছেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে মন্ত্রোচ্চারণ, কীর্তন বা কর্তাল বাজান, পুনঃ পুনঃ চোখে আলো ফেলা ও নেভান ইত্যাদির মাধ্যমে শব্দ, আলো ইত্যাদি ধরনের শক্তিও একই ধরনের উত্তেজকের কাজ করে।

আবার বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যেও (chemical stimulus) এই ভাবে নানা কৃত্রিম অনুভূতি জাগান সম্ভব। গাঁজা, আফিং, চরস, ভাং ইত্যাদি নানা ধরনের নেশার

জিনিস পরিমিত মাত্রায় শরীরে গ্রহণ করলে তথাকথিত দেবদর্শন, দৈববাণী শোনা, তূরীয় আনন্দ, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ইত্যাদির ভ্রান্ত ধারণা লাভ করা যায়। ধুতুরা, এল এস ডি (**LSD** বা **Lysergic acid diethylamide**) ইত্যাদির প্রভাবেও এটি ঘটে। এই কারণেই তথাকথিত সাধু-ঋষি-সন্ন্যাসিদের মধ্যে ও প্রাচীন নানা আধ্যাত্মিক সাহিত্যে গাঁজা, ধুতুরা, ভাং ইত্যাদির এত প্রচলন। এই সব খেয়ে তাঁরা নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে দেবদর্শন (visual hallucination), দৈববাণী শোনা (auditory hallucination) ইত্যাদি নানা ধরনের যে বিকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করতেন তাকেই সরল বিশ্বাসে, বিশ্বাসযোগ্যভাবে হাজির করে সকলের মনে ঈশ্বরবিশ্বাস ইত্যাদি জাগিয়ে রাখতেন। ডঃ আলবার্ট হফম্যান পরীক্ষামূলকভাবে এল. এস. ডি. খেয়ে বলেছেন, "আমি দেখলাম আমার আত্মা আমার শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শূন্যে ঝুলে রইল। আমি আমার মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলাম।" এখানেও স্পষ্টতঃ আত্মা দেখার মতিভ্রম (hallucination) ঘটেছে—ব্যাপারটি আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ আদৌ নয়। সিজোফ্রেনিয়া ও অন্যান্য ধরনের মানসিক রোগীর রক্তে এল. এস. ডি.-এর অনুরূপ রাসায়নিক উচ্চমাত্রা ধরা পড়েছে। এই ধরনের রোগীরা নানা ধরনের মিথ্যে ধারণা, মতিভ্রম ও ভ্রান্ত অনুভূতিতে ভোগেন। তথাকথিত ধর্মোন্মাদ ব্যক্তিদের রক্তেও এই ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। ডঃ কোয়াস্টেল, ডঃ হুইটলে প্রমুখ গবেষকরা এ নিয়ে বিস্তারিত কাজ করেছেন।

এছাড়া জৈব (biological) নানা কারণেও মতিভ্রম, ভ্রান্ত ধারণা বা অনুভূতিতে অনেকে ভোগেন। ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকত্ব অর্থাৎ বংশগত কিছু রোগ, আঘাত-প্রদাহ-অপরিণত গঠন ইত্যাদি নানা কারণে মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক কাজ, প্যারাথাইরয়েড হরমোনের গণ্ডগোল এসব নানা কারণে এটি ঘটে। নিকোটিনিক এ্যাসিড নামক ভিটামিনের অভাবে সৃষ্টি হওয়া

পেলাগ্রা রোগে বা থায়ামিন অর্থাৎ ভিটামিন বি-১-এর অভাবে বেরিবেরি রোগেও এটি ঘটে। ভিটামিন বি-১২-এর অভাবে নানা ধরনের রক্তহীনতার সৃষ্টি হয়, সঙ্গে মানসিক রোগও দেখা দেয়। এই সমস্ত ধরনের রোগীরাই হিস্টেরিয়ার মত মানসিক রোগে ভোগেন ও অস্বাভাবিক নানা কাজ কর্ম করতে পারেন, অস্বাভাবিক অনুভূতিও লাভ করেন। এইভাবে প্যারাথাইয়েড গ্ল্যাণ্ডের রোগে ভূত-প্রেত বা ঠাকুরের দর্শন পাওয়া, বা মৃত কোন আত্মীয়ের আত্মাকে দেখা যেতে পারে। বয়স্করা থাইরক্সিন হরমোনের অভাবজনিত মিক্সিডিমা রোগে ভুগলে (রোগের মাত্রা সামান্য হলেও) অনেকের ক্ষেত্রে নানা ভ্রান্ত ধারণার (delusion) সৃষ্টি হয়—যেমন, কারোর বদ্ধমূল ধারণা হল কালীঠাকুর তার মা, কৃষ্ণঠাকুর তার স্বামী বা ছেলে, বা পূর্বজন্মে সে অমুক ছিল অথবা অমুক লোক তার শত্রু ইত্যাদি। এরা নানা মতিভ্রমেও ভুগতে পারে—যেমন ভ্রান্ত ধারণার সাথে সাথে তার একসময় মনে হতে পারে, কালীঠাকুর তাকে খাইয়ে দিচ্ছে বা তার বেড়া বেঁধে দিচ্ছে কিংবা কৃষ্ণঠাকুর তার সামনে নাচছে ইত্যাদি। আর সরলবিশ্বাসী ভক্তদের চোখে বা আপাত-দৃষ্টিতে স্বাভাবিক এইসব ব্যক্তি যখন বিশ্বাসযোগ্যভাবে এগুলিকে বর্ণনা করে তখন বিশ্বাসপ্রবণ ব্যক্তিরা এগুলিকে সঠিক বলে গ্রহণ করে,—সৃষ্টি হয় আরো বহু সংস্কারের। তাই যদি বাড়ীর কেউ একসময় বলতে থাকে যে, অমুক দেবতা বা অবতার তার সাথে নিয়মিত কথা বলে ইত্যাদি বা যদি কেউ বলে, সে প্রতিরাত্রে ঠাকুরের বা ভূতের দেখা পাচ্ছে, তবে তাকে অবতার বানিয়ে পূজা আচ্চা না করে বা ভূত তাড়ানর জন্য মাদুলি পরান বা ওঝা-গুণিন ডাকা ইত্যাদি না করে, উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা করান দরকার—যাতে যে রোগের লক্ষণ হিসেবে এসব হচ্ছে সেই মূল রোগটি ধরা পড়ে ও সুষ্ঠু চিকিৎসা হয়। অন্যথায় রোগীকে স্থায়ী শারীরিক-মানসিক বিকৃতি, এমনকি মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দেওয়া হতে পারে।

আজন্মলালিত বিশ্বাস একসময়ে বদ্ধমূল ভ্রান্ত অন্ধবিশ্বাস (delusion)-এ পরিণত হয়। এর ফলে, তথাকথিত ধ্যান বা তূরীয় ধ্যান (Transcedental Meditation বা T. M.), ও মনঃ-সংযোগের বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই একজন নানা ভ্রান্ত অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। এটি আসলে আত্ম-সম্মোহন (auto-hypnosis)-এর একটি পদ্ধতি। একই ভাবে, দীর্ঘক্ষণ ধরে কোনকিছুর দিকে তাকিয়ে থাকা বা কোনকিছু শোনা (যেমন ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র, ইত্যাদি), কিছু সম্মোহনী কথাবার্তা বা মৃদু স্পর্শ ইত্যাদির সাহায্যেও একজনকে সম্মোহিত করে তাকে ঐ ধরনের অস্বাভাবিক নানা অনুভূতির অভিজ্ঞতা দেওয়া যায় (রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে যা বলা হয়ে থাকে)। তূরীয় ধ্যান বা অন্য কোন পদ্ধতির সাহায্যে কেউ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করেছে বা কাউকে এই ধরনের ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া যায়—এ ধরনের প্রচার বা দাবীর পেছনে এইসব ব্যাপারই থাকে। তথাকথিত ধ্যান বা মনঃসংযোগের পদ্ধতি সীমিতভাবে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে শারীরিক-মানসিক নানা সুস্থতা অর্জন করা যায়। এর ফলে স্মৃতিশক্তি বাড়ান, বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ মস্তিষ্কের কাজকে বিকশিত ও সাহায্য করা যায় এবং পেপটিক আলসার, হাঁপানি ইত্যাদি যে অজস্র রোগের উপর মানসিক প্রভাব রয়েছে তাদেরও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু তার তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতা যেমন নেই, তেমনি বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা মানসিক অস্বাভাবিকত্বও সৃষ্টি করতে পারে।

জীবন্ত মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুনির্ভর মন একদিকে মস্তিষ্কেরই নানা ধরনের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ রোগে, অন্যদিকে বাহ্যিক পরিবেশের কিছু অসুস্থ প্রভাবে নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অস্বাভাবিক বা বিকৃত অনুভূতি এরই ফলে ঘটে। এগুলিকে ভূত-প্রেত, ঠাকুর-দেবতা-অলৌকিকত্ব-আধ্যাত্মিকতা, অতীন্দ্রিয় শক্তি ইত্যাদির সাথে যুক্ত করাটা ভ্রান্ত সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬

বিবিধ

অবলা নারী

কি শারীরিক শক্তি, কি মানসিক ক্ষমতা—উভয় দিক দিয়েই নারীরা পুরুষের তুলনায় তুর্বল—এ ধরনের একটি ধারণা পুরুষরা শুধু নয়, নারীরাও পোষণ করেন। তুর্বৃত্তদের হাত থেকে নিজেদের শক্তিতে অবলা নারীরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, তাই দূর যাত্রায় বা নির্জন স্থানে অবশ্যই একজন পুরুষ সঙ্গী থাকা দরকার ; ধারণাটি এতই ব্যাপক যে রোগা, তুর্বল একজন পুরুষকে, এমনকি কোন বাচ্চা ছেলেকেও প্রয়োজনে কোন মহিলার সঙ্গী করা হয়—এতে মহিলারাও বেশ নিরাপদ অনুভব করেন। মেয়েরা গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না, তাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা পুরুষদের তুলনায় নিকৃষ্ট মানের—তাই বড় বড় কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ সন্দেহের চোখে দেখা হয় ; জটিল কোন পারিবারিক সমস্যার সমাধানে গিন্নির পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাই অধিকাংশ পুরুষ (-সিংহ !) অনুভব করে না। 'মেয়েরা তো শুধু রান্না করতে আর ছেলে মানুষ করতে পারে, ওরা আর কি মতামত দেবে !' পুরুষদের তুলনায় নারীদের এই হীনমন্যতা বহু যুগ ধরে এমনই গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, অধিকাংশ মহিলাই আত্মবিশ্বাস ও সাহস হারিয়ে ফেলেছেন। নিজেদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতাকে বিকশিত করার মানসিকতাটাই নষ্ট হয়ে গেছে। ছেলেরা খেলধূলা করবে, ব্যায়াম করবে, শরীরচর্চা করবে—এটিই যেন স্বাভাবিক ; মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলা করবে, উলবোনা শিখবে, বড়জোর তাস বা হাল্কা কোন খেলাধূলা করবে। ছেলেদের পড়াশুনা বা 'মানুষ করান'র জন্য যে ব্যয় করা হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে তা করা হয় না। কারণ ওরা তো বিয়ে করে সংসারই শুধু করবে ! নারীদের অবলা ভেবে ঐধরনের প্রবণতা গুলি অতি সামান্য

পরিমাণে কমলেও, এখনো সমাজের প্রায় সর্বস্তরে বেশ ভালোভাবেই রয়েছে।

কিন্তু স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক নিয়মে শারীরগত দিকথেকে নারী-পুরুষের কিছু তফাৎ থাকলেও নারীর শারীরিক-মানসিক শক্তিহীনতা সম্পর্কে ধারণাগুলি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও কৃত্রিমভাবে আরোপিত। আদিম-কালে মানুষ যখন প্রকৃতি ও হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছিল তখন কিন্তু এই ধরনের ধারণা ছিল না। তখনকার আদিম সমাজে নারী-পুরুষের সত্যিকারের সমানাধিকার ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে প্রায়শঃই পুরুষ প্রাধান্যও ছিল না—সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। শারীরিক শক্তিই ছিল তখন প্রধান এবং এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েরই দক্ষতা ছিল। এখনো তারই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর নানা প্রান্তের আদিবাসী বা আদিম জনগোষ্ঠির মধ্যে নারীদের এই দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। আফ্রিকার কিকুয়ুদের মধ্যে দেখা গেছে নারীরা ১০০ পাউণ্ড ওজনের জ্বালানিও ৫-১০ মাইল দূরত্ব অনায়াসে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কঙ্গোর অ্যাডোম্বিসদের মধ্যে প্রায়শঃই নারীরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। আসামের খাসি মহিলারা অনায়াসে যে বোঝা বহন করে তা পুরুষরা তুলতেই পারবে না। সাঁওতাল, ওঁরাও ইত্যাদি গোষ্ঠীর নারীরা যে শারীরিক শক্তির অধিকারিণী, সে শক্তি তথাকথিত ভদ্র, শিক্ষিত সমাজের পুরুষদেরও নেই। ব্রিটিশ নিউগিনিতে একটা জিনিষ হামেশাই দেখা যায়,—মায়েদের পিঠে রয়েছে খাবার আর জ্বালানিকাঠের বিশাল ঝুড়ি, তার ওপর বাচ্চা—সব নিয়ে সে হেঁটে চলেছে মাইলের পর মাইল। এ ধরনের পরিশ্রম করার ক্ষমতা চর্চার অভাবে শিক্ষিতা, আধুনিকা মহিলাদের তো নেই-ই, অধিকাংশ পুরুষেরও নেই।

মানব সভ্যতার বিকাশেরও নারীদের শক্তিশালী ভূমিকা স্বীকৃত। আদিম কালে কৃষিকাজ, মৃৎপাত্র তৈরী, পশুপালন ইত্যাদির মত অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির আবিষ্কার ও চর্চা নারীরাই করেছে।

প্রাকৃতিক শারীরগত নিয়মে সন্তানজন্ম দেওয়া ও পালন করা, মাসিক ঋতুস্রাব ইত্যাদি কারণে পুরুষদের তুলনায় নারীদের বাড়ীতে বেশীক্ষণ আবদ্ধ থাকতে হত। এই সময়কে কাজে লাগিয়ে এসব করা সম্ভব হয়েছে। পুরুষরা বেরুত শিকারে। নারীদের এই আবিষ্কার তাদের বুদ্ধিমত্তারই পরিচয়। চিন্তাভাবনার দিক থেকে নারীরা যে পুরুষদের সমকক্ষ হতে পারে না—এ ধারণা এখন ক্রমশঃ ভেঙ্গে যাচ্ছে। অধ্যাপনা, চিকিৎসা ও প্রযুক্তিবিদ্যা, রাষ্ট্র পরিচালনা, নেতৃত্ব ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রেই ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় নারীরা সুযোগ পেলেই তাঁদের দক্ষতার পরিচয় রাখছেন। ভারতের শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী তাঁর মস্তিষ্কের যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, পৃথিবীর কোন পুরুষই তা এখনো পারেননি। (মাত্র ২৮ সেকেণ্ডে তিনি ১৩টি অংকের দুটি সংখ্যার সঠিক গুণফল বলে দিতে পেরেছেন। ১৯৮০ সালের ১৮ই জুন, লণ্ডনের ইম্পেরিয়েল কলেজের কমপিউটার বিভাগে এ পরীক্ষা করা হয়। ৭৬৮৬৩৬৯৭৭৪৮৭০ ও ২৪৬৫০৯৯৭৪৫৭৭৯—এদুটি সংখ্যার সঠিক গুণফল ১৮৯৪৭৬৬৮১৭৭-৯৯৫৪২৬৪৬২৭৭৩৭৩০ তিনি ২৮ সেকেণ্ডে করেছিলেন। তাঁকে human computer বলা হয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর মস্তিষ্ক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনার অধিকারী। তাঁর জ্যোতিষবিদ্যা চর্চা আর এর সাহায্যে অর্থোপার্জন করা তার পরিচয়।) বাস্তব তথ্য অনুযায়ী, কি শারীরিক ক্ষমতা, কি মানসিক ক্ষমতা—উভয় দিক থেকেই নারীদের যতটা অবলা ভাবা হয়, আদৌ তারা তা নয়।

আসল ব্যাপারটি হল অভ্যাস। আদিম মানবসমাজে যখন সম্পদ ছিল গোষ্ঠীর সকলের সম্পত্তি তখন নারীরা পুরুষদের পদানত ছিল না। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হল তখন ঐতিহাসিক কারণে,—সুনির্দিষ্ট বংশধর ঠিক করার জন্য সৃষ্টি হল পরিবার বা family. একজন পুরুষের কর্তৃত্বে নারীসহ অন্যান্যরা অধীনস্থ হল। (প্রকৃত পক্ষে famulus কথাটির অর্থ—

ঘরোয়া দাস এবং familia-র অর্থ একটি ব্যক্তির অধিকারভূক্ত সমস্ত ক্রীতদাস ; এর থেকেই এসেছে family কথাটি)।

একজন পুরুষের অধীনে এক বা একাধিক 'পত্নি' থাকল, নারীরা হয়ে উঠল পুরুষের সম্পত্তি। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলেছেন, "মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল, স্ত্রীলোক হল পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তানসৃষ্টিয় যন্ত্রমাত্র।" আর এই মানসিকতাই পৃথিবীর নানা প্রান্তে শত শত বছর ধরে লালিত হয়েছে, কোথাও ও কখনো তা রুঢ়ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, কখনো কখনো তার কিছু আপাতমধুর পরিবর্তন করা হয়েছে—কিন্তু মূল ব্যাপার একই রয়ে গেছে। বহু দিনের চিন্তাগত ও ব্যবহারিক অভ্যাসের ফলে মেয়েদের অবলা ভাবার মানসিকতাটা যেমন স্থায়ী হয়েছে, বাস্তবত বংশগতির কারণে (hereditory factors)—যা দেহকোষের 'জিন'-এর মাধ্যমে বংশানুক্রমিকভাবে পরিবাহিত হয়,—সাধারণভাবে মেয়েদের শারীরগত সবলতাও তেমনি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়েছে।

সাধারণভাবে বাড়ীতে মেয়েদের যে পরিমাণ পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয় তা ছেলেদের তুলনায় কমই,—ভাইরা বোনের তুলনায় একটু বেশী দুধ খাবে, বড় মাছ খাবে, বাইরে বেশী খেলাধূলা করবে, ঘরের কাজ কম করবে ইত্যাদি ধরনের ব্যবস্থা প্রায় সব তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্র বাড়ীতে চালু রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই এভাবে কম প্রোটিন ও পুষ্টি পাওয়ার ফলে মেয়েদের মস্তিষ্কের বিকাশও কিছুটা কমই হয়, কারণ স্নায়ুতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কম বাইরে বেরুন ও কম খেলাধূলা, ব্যায়াম ইত্যাদি করার ফলে মেয়েরা মানসিক সাহস ও আত্মনির্ভরতা যেমন হারায়, তেমনি তাদের শরীরের শক্তিও উপযুক্ত হয় না। আর এসব যুগ যুগ ধরে চলার ফলে দেহ কোষের জিন-গত (genetic) পরিবর্তনও ঘটে যায়, যার ফলে মেয়ে সন্তানের

বিশেষ জিন-গত গঠনের ফলে তার বিশেষ মানসিকতা গড়ে ওঠে, শারীরগত ও বুদ্ধিবৃত্তির গঠনও পুরুষদের তুলনায় কম হয়। মা ও বাড়ীর সবাইরা বাচ্চা মেয়েকে যে বিশেষ পদ্ধতিতে মানুষ (!) করেন তা-ও এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়। পুতুলকেনা, শিক্ষাদীক্ষা, বাইরে মেলামেশা সর্বস্তরেই একাজ করা হয়। ছেলেবেলা থেকেই মেয়েরা শুনতে থাকে, তাদের পরের বাড়ী চলে যেতে হবে, তার বিয়ের জন্য এত টাকা খরচ হবে, সে সংসারের বোঝা, সংসার সামলানো আর বাচ্চা মানুষ করাই তার প্রধান কাজ ইত্যাদি। আর এসবেরই ফলে সাধারণভাবে, অধিকাংশ মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় কম আত্মবিশ্বাসী, কম সাহসী ও কম শারীরিক-মানসিক দক্ষতার অধিকারিণী হয়ে ওঠে তথা হীনমন্যতার শিকার হয়। কিন্তু এটি যে চিরন্তন ও স্বাভাবিক নয়, বিশেষ চর্চার ফলে মেয়েরাও যে পুরুষদের ছাড়িয়ে যেতে পারে তার উদাহরণ অজস্র রয়েছে, যার কয়েকটি আগেই দেওয়া হয়েছে।

তাই নারীরা স্বভাবতঃই অবলা—এ ধারণাটি একটি মিথ্যে সংস্কার মাত্র। তবে এর অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, শারীরগত সমস্ত দিক থেকে নারী-পুরুষ একই। অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে কিন্তু এই পার্থক্যের জন্য কে ভাল, কে খারাপ, কে বুদ্ধিমান, কে বুদ্ধিমান নয়, কে বেশী শক্তিশালী ইত্যাকার বাছ-বিচার করা যায় না।

আমাদের দেহ কোষের প্রত্যেকটিতে ক্রোমোজোম নামে একটি জিনিষ থাকে। প্রধানতঃ ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লীক এ্যাসিড (DNA) দিয়ে তৈরী কয়েক সহস্র জিন (gene) নামক পদার্থ থাকে এই ক্রোমোজোমে। এটিই আমাদের বংশগতি (heredity)-র জন্য দায়ী,—এটিই নির্ধারণ করে শরীরের ছোট বড় অজস্র বৈশিষ্ট্য, লক্ষণ, ক্রিয়াকলাপ, এমনকি রাসায়নিক বিক্রিয়াকেও। এই ক্রোমোজোম মানুষের থাকে ২৩ জোড়া। এর ২২ জোড়া সাধারণ ক্রোমোজোম ; বাকী একজোড়া যৌন (sex) ক্রোমোজোম। এটিই নারী-পুরুষের বিশেষত্ব নির্ধারণ করে। নারীদের থাকে **XX** নামে

একই ধরনের ছুটি যৌন ক্রোমোজোম, পুরুষদের থাকে XY নামে দু'ধরনের একটি করে যৌন ক্রোমোজোম। মূলগতভাবে এই ক্রোমোজোম-গত পার্থক্যই নারীপুরুষের পার্থক্য নির্ধারণ করে। মেয়েদের শরীরে ইস্ট্রোজেন জাতীয় হরমোনের আধিক্য থাকে, পুরুষদের থাকে এ্যাণ্ড্রোজেন জাতীয় হরমোন। এরই প্রভাবে জটিল জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মেয়েদের মাসিক (menstruation) হয়, জরায়ুর বৃদ্ধি ঘটে, সন্তান ধারণ সম্ভব হয়, বিশেষ মানসিক ও আবেগগত দিকগুলির সৃষ্টি হয় ইত্যাদি ; একইভাবে পুরুষদের দাড়ি গোঁফগজায়, বীর্য (semen) ও পুং জননকোষ সৃষ্টি হয়, মাংসপেশী ও হাড় তুলনামূলক বেশী শক্তিশালী হয় ইত্যাদি।

চূড়ান্ত বিচারে এটি ঘটনা যে, গড় হিসেবে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের শারীরিক শক্তি সামান্য কিছু কম। কিন্তু এটি এমন নয় যে, নারীকে অবলা হিসেবে অভিহিত করা যাবে। উপযুক্ত শারীর চর্চার মাধ্যমে বহু নারীই বহু পুরুষকে শারীরিক শক্তি ও দক্ষতার দিক থেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একই ধরনের শরীরচর্চার দ্বারা পুরুষরা ঐ বিশেষ নারীদেরও ছাড়িয়ে যায়, তার মূল কারণ হরমোনের প্রভাব। যেমন ১০০ মিটার দৌড়ে পুরুষদের বিশ্বরেকর্ড হচ্ছে ৯.৮৩ সেকেণ্ড (কানাডার বেন জনসনের) ; অন্যদিকে মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি ১০.৫৪ সেকেণ্ড (আমেরিকার ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ-জয়নার-এর)। ১০০০০ মিটার দৌড়ে পুরুষদের বিশ্ব রেকর্ড যখন ২৭ মিনিট ১৩.৮১ সেকেণ্ড (পর্তুগালের ফার্নাণ্ডে মামেড-এর), মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি তখন ৩০ মিনিট ১৩.৭৪ সেকেণ্ড (নরওয়ের ইনগ্রিড ক্রিস্টিয়ানসেন-এর)। হাইজাম্পে পুরুষদের বিশ্বরেকর্ড যখন ৭ ফুট ১১.২৫ ইঞ্চি (সুইডেন-এর জন নিকলাস প্যাট্রিক জোয়েবার্গ-এর), মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি তখন ৬ ফুট ৯.৭৫ ইঞ্চি (বুলগেরিয়া-র স্টেফকা কষ্টাডিনোভা-র)। এধরনের পার্থক্য এমন কিছু বিরাট নয়। এবং এটি ঘটনা যে একই বয়সের শতকরা

৯৯ ভাগ পুরুষই নারীদের করা এই রেকর্ড-এর ধারে কাছেও যাবেন না, উল্টোভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি সত্যি।

মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুর পরিমাণ সাধারণভাবে উন্নততর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। শারীরিক ওজনের তুলনায় এই মস্তিষ্কের পরিমাণ পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বেশী—শারীরিক ওজনের শতকরা ১'৮৮ ভাগ (গড়) (হাতীর ০'০৭৪%)। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে পুরুষদের মস্তিষ্কের গড় ওজন ১৪২৪ গ্রাম ; অন্যদিকে মহিলাদের মস্তিষ্কের গড় ওজন কিছু কম—১২৬৫ গ্রাম। মস্তিষ্কের ওজন বুদ্ধিমত্তা, চিন্তার ক্ষমতা ইত্যাদির সাধারণ পরিচয় হলেও, শুধুমাত্র ওজনই কিন্তু চূড়ান্ত বিচার করে না (যেমন ১৯৭৫ সালে ফ্লোরিডাতে একজন ব্যক্তির মস্তিষ্কের ওজন পাওয়া গেছিল ২০৪৯ গ্রাম ; সে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিল—এটি কিন্তু বলা যায় না)। তবুও মহিলাদের মস্তিষ্কের তুলনামূলক কম ওজন থেকেই অনেকে তাদের হীনবুদ্ধি সম্পন্না বলে প্রচার করেন। এক্ষেত্রেও বলা যায় উপযুক্ত পুষ্টি ও মস্তিষ্ক চর্চার ফলে মস্তিষ্কের গড় ওজন বাড়তে পারে। যেমন, হিসেব করে দেখা গেছে ১৮৬০ সালে পুরুষদের মস্তিষ্কের গড় ওজন ছিল ১৩৭২ গ্রাম ও মহিলাদের ছিল ১২৪২ গ্রাম ; বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ১৪২৪ গ্রাম ও ১২৬৫ গ্রাম—এবং আরো দেখা গেছে মহিলাদের মস্তিষ্কের ওজন-বৃদ্ধির গড় হার বর্তমানে পুরুষের সমান হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আসলে বহু শত বছর ধরে পুষ্টিগত বৈষম্য এবং নারীদের পরাধীন ও গৃহকোণে বন্দী করে রাখার ফল স্বরূপ তাদের শারীরিক ও মানসিক তথা মস্তিষ্কগত বিকাশ পুরুষদের তুলনায় ঘটতে পারে নি। অন্যান্য শারীরিক তফাতের মত মস্তিষ্কের ওজনের তারতম্যের মাত্রার পেছনেও এই ব্যাপারটি কাজ করেছে।

হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলিম—প্রায় সমস্ত ধর্মের তথাকথিত পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলিতেই নারী জাতিকে পুরুষের অধীন, ভোগ্যপণ্য, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র, হীনবুদ্ধি, পরাধীন ইত্যাদি হিসেবে চিত্রিত ও

নির্দেশিত করা হয়েছে। যেমন, মহাভারতে (শান্তিপর্ব) বলা আছে "স্ত্রীলোক পুরুষদেরই একান্ত অধীন"। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, "শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে স্ত্রীজাতির জাতকর্মাদি মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হয় না, স্মৃতি ও বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে ইহাদের অধিকার নাই এবং কোন মন্ত্রেও ইহাদের অধিকার নাই—এজন্য ইহারা মিথ্যা অর্থাৎ অপদার্থ ইহাই শাস্ত্রস্থিতি" (নবম অধ্যায়, ১৩-১৭)। খ্রীষ্টানদের জিহোবা বলছেন, "বন্দীদের মধ্যে সুন্দরী মহিলা খোঁজ, তাকে কামনা কর ও নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ কর···স্বামী হিসেবে তার সাথে মিলিত হও এবং যখনই তুমি তার মধ্যে আর আনন্দ পাবে না তাকে ছেড়ে দাও, সে যেখানে খুশি যাক" (Deuteronomy ; XXI , II , 14)। কোরাণ শরিফেও নির্দেশ দেওয়া আছে, প্রয়োজনে মহিলাদের গৃহবন্দী করে রাখতে, এমনকি পশুর মত হত্যা করতে (পুরুষদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন নির্দেশ নেই)। এ সব কিছুই প্রমাণ করে কিভাবে বহুশত বছর আগে পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষ ও শাসকগোষ্ঠীর প্রয়োজনে নানাবিধ তথাকথিত এইসব ধর্মীয় অনুশাসন সৃষ্টি হয়েছে, তাকে অস্তিত্বহীন ঈশ্বরের নির্দেশ বলে গোঁজামিলও দেওয়া হয়েছে। আর বহুশত বছর ধরে এসব অনুসরণ করার ফলে ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেয়েদের সম্পর্কে ক্ষতিকর নানা ধারণা গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে অনেক মেয়েরাই হয়ে উঠেছে দুর্বল, কোমল চেহারার, মানসিক দিক থেকে আত্মবিশ্বাসহীন ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি যে চিরন্তন নয়, তা আদিবাসী মহিলাদের দেখলেই বোঝা যায়। অন্যদিকে তথাকথিত শিক্ষিত, সভ্য সম্প্রদায়েরা—যারা বহু শত বছর ধরে তথাকথিত ধর্মশাস্ত্র, ও চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক অনুশাসন ইত্যাদি সামাজিক শৃংখলার নামে গোবেচারার মত অনুসরণ করছে—তাদের মধ্যেই এই দুর্বলতাগুলি প্রকট। উপযুক্ত অনুশীলনের মাধ্যমে এই সাময়িক দুর্বলতাগুলি অবশ্যই কাটান যায়—যার উদাহরণ হিসেবে বহু মহিলাই বুদ্ধিমত্তা

ও শারীরিক দক্ষতার দিক থেকে বহু পুরুষকে ছাড়িয়ে যেতে পারছেন।

সন্তানের জন্ম দেওয়া ও সন্তান পালনের ব্যাপারে একটি বাঘ ও বাঘিনীর মধ্যে তফাৎ থাকলেও, শারীরিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে তাদের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য থাকে, তবে তা যেমন নগন্য, তেমনি, পুরুষ ও নারীর মধ্যেকার এ বিষয়ে পার্থক্যও মূলতঃ নগন্য। কিন্তু ব্যাঘ্রজাতির যদি মস্তিষ্ক সবচেয়ে উন্নত হত, তাদের মধ্যে যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হত, এবং বাঘেরা যদি কয়েক শত বছর ধরে বাঘিনীদের ব্যক্তিগত (নাকি, বাঘগত !) সম্পত্তিহিসাবে গণ্য করে গৃহকোণে আবদ্ধ করে রেখে নানা ধরনের অনুশাসন চাপাত তাহলেও হয়ত আজকের বাঘিনীরা তথাকথিত সভ্য, সাম্প্রতিক বেশীর ভাগ নারীদের মত আত্মবিশ্বাসহীন, পুরুষ-(বাঘ) নির্ভর, এবং শারীরিক-মানসিক দিক থেকে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ত।

[তথাকথিত সভ্যসমাজে পুরুষরা নারীদের যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে তার আরেকটি স্থূল বহিঃপ্রকাশ ঘটে, নারীদের সতীত্ব সম্পর্কে কিছু ধারণার মধ্যদিয়ে। পুরুষদের বহুগামিতা প্রায়শঃই নিন্দনীয় নয় বা ক্ষমার্হ, কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে এটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। বহু আদিবাসী গোষ্ঠী ও জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে এ ব্যাপারটি না থাকলেও, সভ্যতার নাম করে তথাকথিত সভ্য মানুষের মধ্যে এটি ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত। বহুগামিতাকে প্রশ্রয় না দিয়েই বলা যায় যে, এ ধরনের মানসিকতা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই একই ধরনের হওয়া উচিত। আর সতীত্বের এ ধারণা সৃষ্টি ও চাপিয়ে দেওয়ার পেছনেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি ও নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারী সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ইচ্ছাই কাজ করেছে। সতীত্ব প্রসঙ্গে প্রথম যৌন মিলনের সময় সতীচ্ছদ (hymen) পরীক্ষার প্রবণতার কথা বলা যায়। নারীদের যোনীমুখে এই পাৎলা আবরণীটি না থাকলে ও প্রথম যৌনমিলনে এটি ছিঁড়ে রক্তপাত না হলে ঐ নারীকে অসতী হিসেবে গণ্য করা হয়—এমনকি সভ্য

বিবাহিতা স্ত্রীকে এর জন্য পরিত্যাগ করার ঘটনাও ঘটে। কিন্তু এই সতীচ্ছদ অনেক নারীর ক্ষেত্রে জন্ম থেকে স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত থাকতে পারে। এছাড়া কোন দুর্ঘটনায়, মাসিকের সময়, খেলাধূলা বা সাইকেল চালানর সময় ইত্যাদি নানাভাবে এটি ছিঁড়ে যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা কুমারী মেয়েদের এই সতীচ্ছদেও স্বাভাবিকভাবেই এক বা একাধিক ছোট-বড় ছিদ্র থাকে যার ফলেই মাসিকের সময় রক্ত বিনাবাধায় বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। এই ছিদ্র স্বাভাবিকভাবেই বড় থাকলে প্রথম বা পরবর্তী যৌনমিলনে সতীচ্ছদটি আদৌ না ছিঁড়তে পারে। এছাড়া সতীচ্ছদে রক্ত সরবরাহ যথেষ্ট কম (relatively avascular)। তাই যৌনমিলনে এটি অল্প পরিমাণে ছিঁড়লে আদৌ রক্তপাত নাও ঘটতে পারে। একমাত্র শিশুর জন্মের সময়ই এটি সম্পূর্ণরূপে ছিঁড়ে যায়। স্পষ্টতঃই 'সতীচ্ছদ' এই কথাটিই সম্পূর্ণ ভুল—ছিন্ন হয়ে এর থেকে রক্তপাত হওয়া তথাকথিত সতীত্বের আদৌ কোন পরিচায়ক নয়। বড় জোর পঞ্চাশভাগ কুমারীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ঘটতে পারে। প্রাচীনকালে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ফলে, সতীত্ব পরীক্ষার সংকীর্ণ মানসিকতা এবং ভ্রান্ত ধারণা থেকেই 'সতীচ্ছদ' কথাটির সৃষ্টি। গ্রীক শব্দ hymen-এর অর্থ পাৎলা পর্দা (membrane)। বাংলায় এটিকে যোনি-পর্দা বলা যায় ; কিন্তু 'সতীচ্ছদ' আদৌ নয়।]

নিজেদের অবলা ও গৃহকোণে আবদ্ধ থাকার উপযুক্ত প্রাণী বলে মনে করে কিছু কিছু মহিলা, আত্মতৃপ্তিও অনুভব করেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শোষণজীবী সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ, অসুস্থ পুরুষ-আধিপত্যের ফলে নারীরা ও পুরো সমাজটা ক্ষতিগ্রস্তই হয় অনেক বেশী। নারী-পুরুষ উভয়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তিছাড়া এগুলিকে কাটান সম্ভব নয়। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পার্থক্যের ও বৈশিষ্ট্যের জন্য নারী পুরুষ উভয়েই কিছু পৃথক সামাজিক দায়িত্ব পালন করবেন,—তা সত্যি। কোন পুরুষের পক্ষে সন্তানধারণ করা বা সন্তানকে স্তন্য পান করান সম্ভব নয়। কিন্তু এই দু' চারটি

বিশেষ পার্থক্য ছাড়া শারীরিক শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদির দিক থেকে সংস্কারমুক্ত হয়ে ছোটবেলা থেকেই ছেলে-মেয়ে উভয়কে একইভাবে তাদের ক্ষমতাকে বিকশিত করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

অনেকের ধারণা, মেয়েদের পক্ষে ছোটবেলা থেকে ভারী পরিশ্রম, ব্যায়াম, খেলাধূলা ইত্যাদি করা ক্ষতিকর। ব্যাপারটি আদৌ তা নয়,—এসবের ফলে তাদের নারীত্বের কিছুই হানি ঘটে না, বরং এর ফলে তারা আত্মবিশ্বাসী ও দুর্বৃত্তদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। শিক্ষাদীক্ষা ও আর্থিক দিক থেকেও তাদের স্বনির্ভর করা উচিত—যার ফলে নানা সামাজিক উৎপীড়ন ও উদ্বেগ থেকে তারা তথা তাদের বাবা-মা-রা রক্ষা পাবেন। এবং সবচেয়ে প্রয়োজন মানসিক দিক থেকে স্বনির্ভর ও যুক্তিবাদী হিসেবে গড়ে তোলা—এটি অবশ্যই নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্যি। ব্যাপারটি অতি জটিলভাবে সমাজব্যবস্থা-সংস্কৃতি-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে জড়িত। নারী-পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন সচেতন হয়ে এদিকটিকে মোকাবিলা করা—যা অদূর ভবিষ্যতে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমস্ত ধরনের বন্ধনমুক্তির সহায়ক হবে, নারী-পুরুষ উভয়েই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজে নিজেদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে 'সবল শরীরের' পুরুষরাই কাজ করতে পারে, 'অবলা নারীরা' পারবে না—এ চিন্তাটিও সম্পূর্ণ ভুল।

অস্পৃশ্যতা

বিশেষ বিশেষ কিছু গোষ্ঠীর মানুষ অন্য গোষ্ঠীর মানুষের কাছে নাকি অস্পৃশ্য; তাদের ছুঁলে শরীর অপবিত্র হয়, এবং সংস্কারটি এমনই গভীর ভাবে অনেকের মধ্যে থাকে যে, তাদের দেওয়া খাবার খেতে নেই, তাদের ছায়া মাড়াতে নেই, তাদের উপস্থিতিতে মনটা ঘিন্‌ঘিন্ করে ওঠে। একজন মানুষের পুরো শরীরটাকে ঘিরেই এধরনের হীন কুসংস্কার এখনো ব্যাপকভাবে টিকে আছে।

সাদা-চামড়ার সাহেবরা কালোচামড়ার নিগার বা নিগ্রোদের অস্পৃশ্যভাবে, ব্রাহ্মণরা ভাবে শূদ্রদের, উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা ভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও অন্যান্য আদিবাসীদের, হিন্দুরা ভাবে মুসলমানদের ; মুসলমানরা হিন্দুদের আবার কাফের বলে নাক সিঁটকোয় ইত্যাদি। ভারতে এমন একসময় ছিল, যখন এই সব অস্পৃশ্য হরিজনদের গলায় ঘণ্টা বেঁধে যেতে হত যাতে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের অন্যান্যরা সতর্ক থাকতে পারত—ভুল করে অস্পৃশ্যদের ছায়া যাতে না মাড়াতে হয়। ব্যাপারটি এখন হয়তো ঐ পর্যায়ে নেই, তবু মূল মানসিকতাটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। হিন্দুরা মুসলমানের হাতে জল খায় না, বাড়ীতে ঘটনাচক্রে মুসলমান ধর্মাবলম্বী কেউ এলে সবাই সূক্ষ্মভাবে হলেও নানা ধরনের ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলে। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই ধরনের নানা সংস্কার চালু রয়েছে।

কিন্তু একজন মানুষের পুরো শরীরটাকে এভাবে স্পর্শ করার অযোগ্য বলে গণ্য করাটার মধ্যে সামান্যতম বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই—যা রয়েছে তা হল এক ধরনের আত্মম্ভরিতা, এবং যাদের অস্পৃশ্য ভাবা হচ্ছে তাদের মধ্যে হীনমন্যতা সৃষ্টি করে তাদের উপর শাসন, শোষণ, আধিপত্য ও প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখার হীন প্রচেষ্টা। অস্পৃশ্যতার ব্যাপারটি আদৌ চিরন্তন কিছু নয়, এটি এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী মানুষেরই তৈরী করা ও প্রচার করা ধ্যান-ধারণা-মতামতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে মেহনতী মানুষদের শ্রমশক্তি শোষণ করার উদ্দেশ্যে, তাদের মধ্যে হীনমন্যতার সৃষ্টি করে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা ও নিজেদের ভোগ-বিলাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য—এই সব মেহনতী মানুষদের অস্পৃশ্য, নীচুজাত, ছোটলোক ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছে সমাজের মুষ্টিমেয় অথচ ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা এবং তাকে ধর্মীয় বা শাস্ত্রীয় রূপ দিয়ে, কখনো বা অস্তিত্বহীন ঈশ্বরের অভিপ্রায় বা ঐশ্বরিক নির্দেশ, ভাগ্যফল বা পূর্বজন্মের কর্মফল বলে বর্ণনা করে চিরন্তন বা অপরিবর্তনীয় একটি ব্যাপার বলে চালানর চেষ্টা করেছে।

প্রাচীন ভারতে চার বর্ণের সৃষ্টি মূলতঃ এভাবেই হয়েছে। অবশ্য সঙ্গে তখনকার প্রাসঙ্গিক কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনও জড়িত ছিল। তবু ভিত্তিটা ছিল শোষণজীবী ও বৈষম্য মূলক। ব্রাহ্মণ ছিল পুরোহিতশ্রেণী, সবচেয়ে ধান্দাবাজ গোষ্ঠী যারা অস্তিত্বহীন অলৌকিক অতীন্দ্রিয়, শক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারত বলে প্রচার করত—নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও অন্যদের অজ্ঞতা এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এরা কায়িক পরিশ্রম প্রায় করতই না। ক্ষত্রিয় ছিল সরাসরি শাসন ক্ষমতায় ও সমরবিদ্যায় পারদর্শী এবং ব্রাহ্মণরা ছিল এদের শাসন ক্ষমতার সহায়ক। বৈশ্যরা ছিল ব্যবসায়ী এবং সর্বনিম্ন তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি ছিল শূদ্র যারা প্রকৃত-পক্ষে মেহনতী শ্রমজীবী মানুষ। আর ছিল ভারতের কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী। আর্যরা এই অনার্যভাষী উপজাতিদের ম্লেচ্ছ বলে অভিহিত করে; ঋক্‌বেদের আমলেই এই শব্দের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। সাদা চামড়ার সাহেবরাও নিগ্রো বা কালো চামড়ার লোকেদের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, তাদেরই শ্রমজাত দ্রব্যে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে—এবং তাদেরই উন্নাষিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেছে,—শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুনির্দিষ্ট বিভেদ স্থায়ী করার জন্য স্কুল, সিনেমা হল ইত্যাদি সহ নানা ধরনের সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা করেছে।

পৃথিবীতে প্রায় ৩×১০^{৩৩} সংখ্যক জীবন্ত বস্তুর সঙ্গে মানুষ বাস বরে। তাদের থেকে পৃথক সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে সমগ্র মানবজাতিই একই ধরনের প্রাণী। জীববিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী মানুষ নামক প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Homo sapien (প্রাণী জগতের মেটাজোয়া উপবিভাগের, কর্ডাটা পর্বের, ভার্টিব্রাটা বা ক্রেনিয়াটা উপপর্বের, ম্যামালিয়া শ্রেণীর, থেরিয়া উপ-শ্রেণীর, ইউথেরিয়া নিম্নশ্রেণীর, প্রাইমেট অর্ডারের, সিমিই বা অ্যানথ্রোপয়ডিয়া সাবঅর্ডার-এর, হোমিনয়ডিয়া উপরি-পরিবারের, হোমিনিডি পরিবারের, হোমিনিনি উপপরিবারের প্রাণী হচ্ছে মানুষ বা Homo sapien)। মূল বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর সব

মানুষের একই (যেমন মাংসপেশী, স্নায়ুতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র, অস্থি সংস্থান, যৌনজীবন, পুষ্টিসংগ্রহ ইত্যাদি) ; শরীরের রাসায়নিক বিশ্লেষণেও একই ধরনের মৌলিক পদার্থগুলিই পাওয়া যাবে। শুধুমাত্র বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য কারোর রঙ হয় কালো (যা ঘটে মেলানিন নামক পদার্থের জন্য), কারোর নাক হয় চ্যাপ্টা বা চোয়াল মোটা (যা হাড়ের আকারগত কিছু তফাতের জন্য ঘটে) ইত্যাদি। আবার মানুষেরই করা কৃত্রিম-শ্রমবিভাজনের ফলে বিশেষ কিছুজনকে বিশেষ বিশেষ কাজ বেছে নিতে হয়েছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষেরই সৃষ্টি করা দারিদ্র্য ও অভাবের কারণে কারোর শারীরিক বিকাশ উপযুক্তভাবে ঘটে নি। বিভিন্ন স্থানের মানুষের বিভিন্ন খাতে বওয়া কল্পনার কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠী নানাধরনের তথাকথিত ধর্মকে অবলম্বন করেছে। কিন্তু এসবের কোনটিই বিশেষ কারোর পুরো শরীরকে স্পর্শের অযোগ্য করে না এবং প্রকৃতপক্ষে সুস্থ কাউকে স্পর্শ করলে কোন ধরনের বাস্তব শারীরিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। শুধুমাত্র মনগড়া কিছু ধারণার উপর ভিত্তি করে কিছু মানসিকতা সৃষ্টি হয়, যা একজনের ছোঁয়াকে, তার ছোঁয়া জল বা খাবারকে, এমনকি তার ছায়া বা উপস্থিতিকেও ঘৃণা করতে শেখায়।

যদি কোন ব্যক্তি ভয়াবহ সংক্রামক (যেমন সারা গায়ে খোস পাঁচড়া, বসন্ত ইত্যাদি) কোন রোগে আক্রান্ত হন, কেবলমাত্র তাকেই খালি হাতে বা উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিয়ে স্পর্শ করা উচিত নয়, সে ব্রাহ্মণ বা শূদ্র, সাদাচামড়ার সাহেব বা নিগ্রো যেই হোক না কেন এবং এটি করা উচিত নিজেকে ও অন্যদের ঐ রোগের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে বা ঐ রোগটি সেরে গেলে অবশ্যই ঐ ব্যক্তিটি আর 'অস্পৃশ্য' থাকবেন না।

অস্পৃশ্যতার ধারণা সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে তথাকথিত উচ্চ বর্ণের বা জাতির মানুষদের ক্ষমতালিপ্সা ও শাসন-শোষণের মানসিকতা। এই শাসন-শোষণ, আধিপত্যবাদ ও সামাজিক বৈষম্য

আদৌ দূর না করে, তথা-কথিত অস্পৃশ্য বা হরিজনদের শুধু কিছু আপাত সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এই অসুস্থ অ-সামাজিক প্রবণতাকেই টিকে থাকতে সাহায্য করা হবে।

কপাল

মানুষের কপাল (fore head) হচ্ছে দুই চোখের উপরের অংশটি। এটি ফ্রন্টাল (frontal) হাড় দিয়ে তৈরী। কিন্তু সাধারণভাবে কপাল বলতে ভাগ্যকেও বোঝায়। 'সবই কপাল', 'কপালের লিখন', 'কপালে না থাকলে কি হবে!', 'কি কপাল করেই না এসেছে?', 'কপালে নেই' ইত্যাদি ধরনের হাজারো কথা এই ধারণা থেকে এসেছে।

বিধাতাপুরুষ নবজাতশিশুর এই কপালেই নাকি ভবিতব্য অর্থাৎ ভাগ্যকে লিপিবদ্ধ করে দেন আর ঐ অনুযায়ী তার সারা জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। যাই হোক, এই কপালেই নাকি এমন একটা কিছু ব্যাপার থাকে যা একজন মানুষের জীবনকে, তার সুখ-দারিদ্র, সম্পদ ও সন্তানলাভ, স্ত্রী (বা স্বামী)-লাভ ইত্যাকার সবকিছুকেই নির্ধারণ করে—এটিই সাধারণ ধারণা।

কিন্তু শরীরের এই কপাল নামক অংশটিতে আলাদা এমন কোন সাংঘাতিক ব্যাপার থাকে না, যা এই ধরনের অদ্ভুত ও উদ্ভট একটি গুণ অর্জন করতে পারে। গরু, ছাগল, কুকুর, বেড়াল, বাঁদর, গেরিলা, শিম্পাজি, ওরাং ওটাং ইত্যাদি প্রাণীর মত মানুষেরও চোখের উপরের এই অংশটিতে চামড়ায় ঢাকা ফ্রন্ট্যাল হাড় থাকে। এখানকার চামড়া শরীরের অন্যান্য অংশের চামড়ারই মত, এখানে যে রক্তবহা নালী, স্নায়ু ইত্যাদি থাকে তাও শরীরের অন্যান্য অংশের থেকে আলাদা কিছু নয়, এখানকার হাড় (frontal bone)-ও শরীরের অন্যান্য অংশের হাড়ের মত একই রাসায়নিক গঠনযুক্ত, একই ধরনের।

এই হাড়ের উপর শরীরের মধ্যরেখার দুদিকে দুটি উঁচু অংশ থাকে

(frontal tuberosity)। অনেকের ক্ষেত্রে এটি কিছুটা অস্বাভাবিক উঁচু থাকে ; এদের 'উটকপালী' বলে নিন্দাবাদ করা হয় এবং এদের 'ভাগ্য' বিড়ম্বিত হয়—এ ধরনের ধারণা করা হয়। বাচ্চা বয়সে ভিটামিন-ডি-এর অভাব হয়ে রিকেট রোগ হতে পারে। এতে হাড় যে জিনিষটি দিয়ে তৈরী সেই ক্যালসিয়াম ও ফসফেটের বিপাকক্রিয়া অস্বাভাবিক হয়ে এ ব্যাপারটি ঘটতে পারে। ভিটামিন ডি-এর অভাব বা রিকেটের এই লক্ষণকে উটকপালী বা ভাগ্যবিড়ম্বনায় লক্ষণ বলে বলাটাও স্পষ্টতঃ ভুল।

মস্তিষ্কের পেছনের বা পাশের হাড়গুলির নীচে মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্র থাকে—এগুলি শরীরের নানাবিধ বিশেষ বিশেষ কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে ; তেমনি কপালের এই ফ্রন্ট্যাল হাড়ের নীচেও মস্তিষ্কের বিশেষ অংশ থাকে যা শরীরের সুনির্দিষ্ট কিছু ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ করে। পূর্বোক্ত জন্তুদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারগুলি একইভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু তারা কোন বিধাতাপুরুষের কথা বা ভাগ্য ইত্যাদির কথা কল্পনা করে বলে জানা নেই, যদিও তাদের জীবনেও নানা বাধা-বিপত্তি-সুখ-দুঃখের ব্যাপার থাকে।

ফ্রন্ট্যাল হাড়ের নীচে থাকা মস্তিষ্কের অংশটি (prefrotal lobe) মূলতঃ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, মেধা, চিন্তা ও যুক্তির ক্ষমতা ইত্যাদিকে। মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সাথে এর জটিল স্নায়বিক যোগাযোগের মাধ্যমে স্নায়ুরই ক্রিয়ায় এটি সম্ভব হয়। আর এই অংশের পেছনের দিকে থাকে, শরীরের ঐচ্ছিক (motor) মাংসপেশীর ক্রিয়া কলাপকে নিয়ন্ত্রণ করার কেন্দ্র—ওপর থেকে নীচের দিকে পরপর সাজানো থাকে শরীরের নীচ থেকে (অর্থাৎ পায়ের দিক থেকে) ওপরের দিকের মাংসপেশীকে নিয়ন্ত্রণ করার কেন্দ্রগুলি। কপালের নীচে থাকা মস্তিষ্কের এই অংশটি নষ্ট হয়ে গেলে, মানুষ তার মাংস-পেশীর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, কোন কিছুতে মনোযোগ দিতে পারে না, ভিত্তিহীন উদ্ভট চিন্তাভাবনা মাথায় আসে, স্মৃতিভ্রংশ ঘটে—বিশেষতঃ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভুলে যায়,

কোন কাজে উৎসাহ থাকে না, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ও আচার-ব্যবহার সব ওলট পালট হয়ে যায়, আসন্ন বিপদ বা নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা হারিয়ে যায় এবং অহেতুক হাসি খুশী-ভাল লাগার (euphoria) ব্যাপার ঘটে।

এবং অংশটির এতকিছু কার্যকারিতার কথা জানা গেলেও, এমন কিছু জানা নেই যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অর্থলাভ, সম্পদলাভ লটারিজেতা, সুপুত্র-কন্যা লাভ, আদর্শ স্বামী (বা স্ত্রী) লাভ ইত্যাদি তথা তার তথাকথিত ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আর প্রকৃতপক্ষে ভাগ্য সম্পর্কে এই ধারণাটিই ভ্রান্ত। মানুষের সৃষ্টির পেছনে এক সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তথা বিধাতাপুরুষের ভূমিকা ও তাঁরই ইচ্ছায় মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়—এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণাবলী থেকেই 'ভাগ্য' তথা 'কপালের' ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি। প্রকৃতি ও সমাজের প্রতিকূল নানা শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষ নিজের জীবনে নেমে আসা অবাঞ্ছিত আকস্মিক দুর্ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা না পেয়ে, অস্তিত্বহীন ভাগ্যকে তথা এই ভাগ্যনিয়ন্ত্রক এক শক্তিকে এসবের জন্য দায়ী করে। এর ফলে একদিকে যেমন কপালের লিখনের উপর দোষ চাপিয়ে নিজের ত্রুটিগুলিকে চাপা দেওয়া যায়, তেমনি অন্যদিকে সমস্যার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে সমস্যাগুলিকে দূর করার উপায় খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রেও বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ হতে হয়—ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে আত্মনির্ভরতার চেয়ে ভাগ্য-নির্ভরতার ক্ষতিকারক প্রবণতা। সমাজের শাসকগোষ্ঠী এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক মানুষের উপর তাদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ শাসন-শোষণ-অত্যাচার টিকিয়ে রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করে। দারিদ্র্যের পেছনে শাসকশ্রেণীর ভূমিকা তথা অসুস্থ সমাজব্যবস্থার ভূমিকাকে আর বড় করে দেখা হয় না, বরং 'কপালে নেই, তাই এ দুর্দশা'—এ ধারণা করে মূল সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়, ফলে শাসকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করা বা সমাজব্যবস্থা পালটানর মত দীর্ঘস্থায়ী কাজকে এড়িয়ে

গিয়ে একটি নিশ্চেষ্ট আলস্য উপভোগ করা যায়। শাসকশ্রেণীও ব্যাপক মানুষের এই ভ্রান্ত চিন্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা, প্রচারযন্ত্র, নিজেদের আচার-ব্যবহার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দৈব-নির্ভরতা, জ্যোতিষবিদ্যা, অলৌকিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ তথা ভাগ্য বা কপালের ব্যাপারটিকে প্রশ্রয় দিয়ে যায়।

ব্যাপক মানুষ নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ফলে নিজের শরীর, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে এইভাবে যে হাজারো সংস্কার-কুসংস্কার-অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি করেছে, বা অনুসরণ করছে বা করতে বাধ্য হচ্ছে—তা তাদের জীবনকেই বিড়ম্বিত করে তোলে। কি নিজের শরীরের, কি নিজের জীবন ও পরিবেশের সমস্ত ঘটনা-বলীকে বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী অনুসন্ধিৎসা দিয়ে বিচার না করলে হাজারো শারীরিক অসুস্থতা সামাজিক অসুস্থতার পাশাপাশি টিকে থাকবে। তাই অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সংস্কারমুক্ত সত্যকেই আমাদের জানতে হবে।

কয়েকটি সাহায্যকারী সূত্র—

১। উৎস মানুষ (বি. ডি. ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪) পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা
২। ভূত-ভগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর ; ভবানীপ্রসাদ সাহু (৫ম সংস্করণ ; ১৯৮৭)
৩। লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ ; আবদুল হাফিজ (১৯৭৫)
৪। বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য ; আবদুল হাফিজ, ১৯৭৫
৫। বিচিত্র বিশ্বাস ; অমিতাকুমারী বসু (১৩৮৯)
৬। লোক বিশ্বাস ও লোক সংস্কার ; ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী (২য় সংস্করণ, ১৩৯০)
৭। পি. এম বাগচির ডাইরেকটরী পঞ্জিকা
৮। বিজ্ঞানের ইতিহাস ; সমরেন্দ্রনাথ সেন (১ম খণ্ড) (২য় সংস্করণ, ১৯৬২)
৯। সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব ; বদরুদ্দিন ওসমান (ঢাকা ; ১৯৭৭)
১০। মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন ; প্রগতি প্রকাশন
১১। The Culture & Civilisation of Ancient India in Historical Outline ; D. D. Kosambi ; (1981)
১২। নৃতত্ত্বের সহজপাঠ ; জে. এম. হোয়াইট (অনুবাদ—মাহমুদ ইসলাম) ঢাকা ; ১৯৮১
১৩। হিন্দু দেব-দেবীর ইতিহাস ; হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য
১৪। One two three...infinity ; George Gamow (Indian Edition, 1969)
১৫। বিজ্ঞান ও মার্কসীয় দর্শন ; জে. বি. এস হ্যালডেন (চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৬)
১৬। ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৭
১৭। ধর্ম ও কুসংস্কার, সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮২
১৮। মানব সত্তা, জর্জ টমসন (অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ১৯৮৪)
১৯। Harrisons Principle of Internal Medicine (10th Asian Edition)
২০। রোগটির নাম কুষ্ঠ, সরোজেন্দ্র মোহন ঘোষ, ১৯৭৯

২১। জলাতঙ্ক সংস্কার ও সমস্যা, রবীন্দ্রনাথ মিশ্র, ১৯৮৭

২২। Veterinary Pathology ; G A. Sastry ; 1975.

২৩। Guiness Book of Records ; 1988.

২৪। Science & Society in Ancient India ; Debi Prasad Chattopadhyay ; 1979

২৫। Text Brook of Preventive and Social Medicine, Park & Park, 1983

২৬। The Science of Folklore ; Alexander Kragge.

২৭। Human Physiology (C. C. Chatterjee)

২৮। Gray's Anatomy

২৯। The Principles & Practice of Medicine ; Davidson & Macleod

৩০। Price's Textbook of the Practice of Medicine

৩১। Principles of Gynaecology, Jeffcoate.

৩২। Manual of Obstetrics ; Holland & Brews

৩৩। Clinical Pharmacology ; Laurence

৩৪। Journal of Indian Medical Association-এর বিভিন্ন সংখ্যা, ইত্যাদি।

ভ্রম সংশোধন

৬৮ পৃষ্ঠার ২০ লাইনে হবে—"পরবর্তী তিন দিনের কোন এক সময়ে।"
(কারণ নারীর শরীরে শুক্রকোষ তিন দিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে।)